সূচীপত্র

শিক্ষা

—যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

—রবীন্দ্রনাথ

—পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

—Education is the natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of the human being.

—Pestalozzi

—Education is not so much the survival of the fittest, but the fitting of the greatest possible number to survive.

—T. H. Haxley

—A complete and generous education is that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously, all the offices, both public and private, of peace and war.

—Milton

—Mere knowledge is not Education.

—Edward Thring

শিক্ষার স্বরূপ

(Concept of Education)

শিক্ষা কেন ?

কত বিচিত্র জীব এই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করছে তারপর তাদের সহজাত সংস্কার বশে বিচিত্র জীবলীলা অনুবর্তন করতে করতে মৃত্যুর পথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জীবন-পথ পরিক্রমায় তাদের একমাত্র সম্বল হল অল্প কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)। মানুষও একদিন অন্যান্য জীবকুলের মতই এই সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), ভাব (Feeling), প্রেরণা (Impulse), স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system), বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) প্রভৃতি কয়েকটি বংশানুক্রমিক সহজাত সম্পদ সম্বল করে জীবনের পথে চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু মানুষের পথ জটিল। বিধি-নির্দিষ্ট গতানুগতিকতার বাঁধা পথ ছেড়ে মানুষ চলতে চেয়েছে অজানা বন্ধুর নূতন পথে। নানা উত্থানপতন ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে সেই পথ চলে এসেছে আজকের এই বিদ্যুতালোকিত সভ্যতার স্বর্ণদ্বারে। মানুষের এই জয়যাত্রার পাথেয় কেবলমাত্র তার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে মেলে নি—মিলেছে অতীত অভিজ্ঞতার সার্থক সঞ্চয়নে, অনুশীলনে ও রূপায়ণে। সংক্ষেপে একেই আমরা বলে থাকি 'শিক্ষা'।

শিক্ষার স্বরূপ—পরিবর্তনশীলতা

ইতর প্রাণীর কাজের মধ্যেও হয়ত দেখা যাবে সূক্ষ্মতার অভাব নেই, শিল্পবোধের অভাব নেই, কিন্তু সেগুলি বুদ্ধি-নির্ভর নয় যান্ত্রিক প্রবৃত্তি-নির্ভর, তাই তার কোন পরিবর্তন নেই। হাজার হাজার বছর ধরে মৌমাছি একই ধরনের ছ'কোণা ঘর তৈরী করে চলেছে ; বাবুই বাসা বুনেছে, উই তৈরী করেছে মাটির বল্মীক ঢিবি। —কোন পরিবর্তন নেই, বৈচিত্র্য নেই। থাকলেও তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে সমস্ত জীবলীলার ছকটা একেবারে যেন একটা অপরিবর্তনীয় ছন্দে বাঁধা বলে ধরে নিতে পারা যায়। —অথচ মানুষের বেলায় তার ব্যবহার রীতি নীতির পরিবর্তন চলেছে অহরহ। অতীত দিনের মানুষের

সঙ্গে আজকের মানুষের কত পরিবর্তন, আবার আগামী দিনের সঙ্গেও যে পরিবর্তন আসছে সেটাও কম নয়! মানুষের এই নিরন্তর পরিবর্তনশীলতাই তাকে অন্যান্য জীবলোক থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। সুতরাং এই পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে শিক্ষার মূলকথা (Education is change)। কারণ শিক্ষার গুণে মানুষ ইতর প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে। মনুষ্যেতর জীবমাত্রই তাদের পিতৃপিতামহের চলার পথ নিখুঁতভাবে অনুবর্তন করে চলে—অথচ মানুষের পথ সদা-পরিবর্তনশীল।

একক মানুষ চলার পথে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে গড়েছে সমাজ। আবার সমাজের অভিজ্ঞতায় মানুষ পায় নূতন পথের দিশা……এমনি করে হয় সভ্যতার অগ্রগতি; পরিবর্তন ঘটে রাষ্ট্রিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে। পুরাতন জীবনের পলির উপর গড়ে ওঠে নূতন জীবন। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানব জীবনের এই সদাপরিবর্তিত রূপই হল শিক্ষার স্বরূপ।

মানব সভ্যতার রূপায়ণে এই যে নিরন্তর পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় তাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন এবং মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন। কখনও মানুষ প্রকৃতিকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নিতে চেষ্টা করেছে, কখনও বা নিজেকেই প্রকৃতির অনুকূলে অভিযোজিত করে নিয়েছে। এইভাবে যুগপৎ সংগ্রাম ও আপসের মধ্য দিয়ে মানুষ বহির্লোক ও অন্তর্লোকের পরিবর্তন ঘটাতে ঘটাতে এগিয়ে চলেছে। এই হল সভ্যতার মূলকথা এবং এইখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য।

পরিবর্তনশীলতার প্রেরণা—অভাববোধ

—কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেরণা কোথায় পায় মানুষ? উত্তরে বলা যায়—মানুষের অভাববোধ; মানুষ কখনই কোন অবস্থাতেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তৃপ্ত থাকেনি। সব সময়েই তার মন বলেছে "হেথা নয় হেথা নয় আর কোনখানে।" আরো চাই আরো চাই, জানতে চাই, করতে চাই, পেতে চাই—এই হলো মানুষ-জীবের চির কামনা। এই চির অভাববোধ থেকেই পরিবর্তিত পরিপার্শ্বের সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্তিত পরিপার্শ্ব থেকেই আবার জাগ্রত হয় নূতন নূতন অভাববোধ। সুতরাং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির মূল কথাটা হল অভাববোধ। তাই কারো কারো মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত—তার সর্ববিধ অভাবপূরণের প্রচেষ্টা।

(The ultimate aim of education is to achieve the fullest satisfaction of the wants of the mankind—Thorndike and Gates.)

কিন্তু কেবলমাত্র অভাববোধজনিত পরিবর্তনশীলতাই শিক্ষার মূল স্বরূপ, বললে বোধহয় সবখানি বলা হল না।

পরিবর্তন অর্থে এক থেকে অন্য আর একটি হওয়া। কিন্তু সেইখানেই ত শিক্ষার শেষ কথা নয়। শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; জৈব জীবনের উর্দ্ধে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং শিক্ষা শুধু গতিমূলক নয়, অগ্রগতিমূলক। তাই কেবলমাত্র পরিবর্তন বললে সবখানি বলা হল না। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষায় যে পরিবর্তন আসবে তা' অর্থহীন নয়, তা বিকাশমূলক, বৃদ্ধিমূলক।

শিক্ষার স্বরূপ—ক্রমবর্ধমানতা—

বীজ পরিবর্তিত হয় অঙ্কুরে, অঙ্কুর চারাগাছে, চারাগাছ মহীরুহে……এমনি করে বীজের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা অর্থহীন পরিবর্তন মাত্র নয়, তা অগ্রগতিমূলক সার্থক পরিবর্তন। মাটির রস, আকাশের তেজ, বাতাসের স্পর্শ—এই সব পরিপার্শ্ব থেকে বিচিত্র প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে তবেই বীজ মহীরুহে পরিণত হয়। মানবশিশুও তার পরিপার্শ্বের বিচিত্র প্রভাব আত্মস্থ করে নিয়ে বড় হতে থাকে। মানবশিশু আদিম মানুষের মতই সংস্কারবর্জিত নিঃসহায় একক……ক্রমশ সে তার পরিজনের গোষ্ঠীর সমাজের রাষ্ট্রের প্রভাব গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সামাজিক মানুষ আবার পরিবর্তনশীল প্রয়োজনানুরূপ সমাজ গড়ে নেয়। এমনি করেই মানুষ এবং তার সমাজ এগিয়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে।

(Education is growth. The young of to-day will be the society of tomorrow. As it fashions the young to-day, so the society is fashioning itself tomorrow. Society fashions the young by determining, directing, their activities. This is their growth and this is their education. Growth, then, is cumulative movement of directed activities towards a later result).

—Horne

সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এগিয়ে চলা অর্থাৎ বৃদ্ধিই হল শিক্ষার স্বরূপ। (Education is growth)

ক্রমবর্ধমানতার প্রেরণা—অপূর্ণতা—

—কিন্তু কোথায় এই বৃদ্ধির প্রেরণা ?

অপূর্ণতা থেকেই ত' বৃদ্ধির প্রেরণা আসে। তত্ত্ব হিসাবে মানবেতিহাসের এই নিরন্তর বিবর্ধন-প্রবণতা স্বীকার করতে গেলে মানব সভ্যতার অপূর্ণতা মেনে নিতে হয়। অঙ্কুর যেমন ক্রমশ বৃক্ষের দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে, মানব সভ্যতাও তেমনি নিরন্তর এগিয়ে চলেছে কোনও একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে। পরিণতি হল সমাপ্তি। যতদিন সে অপূর্ণ ততদিনই তার পূর্ণতার দিকে অগ্রগতি। জানিনা, কোন অনির্দেশ্যে ভাবী পূর্ণতার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে মানব সভ্যতার বিরামহীন যাত্রা চলেছে। যে দিন সে পৌছুবে তার লক্ষ্যে, সেইদিনই তার গতি হবে স্তব্ধ। অনন্ত সমুদ্রের বুকে নদী হবে আত্মহারা। দ্বৈততত্ত্বের লীলাবিলাস অদ্বৈততত্ত্বে বিলীন হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—"জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট……।"

এই অপূর্ণতা নেতিবাচক বা অভাবাত্মক নয়। অপূর্ণতার মধ্যে দিয়েই আমরা পূর্ণতার আনন্দলোকের সন্ধান পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ।…সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে…।"

—সুতরাং বিবর্ধনপ্রবণতাই (growth) হল শিক্ষার স্বরূপ।

—কিন্তু এই সংজ্ঞাটিকেও পুরাপুরি শিক্ষার স্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা আছে।

বৃদ্ধি যে সবসময়ে কল্যাণের পথে উন্নতির পথে চলবে, এমন কি কথা আছে ? অসৎপথে অসামাজিক প্রবৃত্তিরও বৃদ্ধি ঘটে—সুতরাং বৃদ্ধিমাত্রকেই (growth) শিক্ষার স্বরূপ বলে স্বীকার করে নিতে পারি কি ? যে-শিক্ষার প্রভাবে মানুষ একদিন গুহাবাসী অরণ্যবাসী অবস্থা থেকে বর্তমানে সুসভ্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই শিক্ষা সব সময়েই কোন একটা আদর্শ সম্মুখে রেখে চলবার চেষ্টা করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুতরাং সুপরিকল্পিত পরিণতিপ্রত্যাশী আদর্শাভিমুখী বৃদ্ধিকেই শিক্ষার স্বরূপ বললে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়।

("It is not enough to say 'Education is growth.' We must add, education is growth in the right way. And criteria of right growth must be set up.—"—Horne)

শিক্ষার স্বরূপ—উন্নয়ন—

এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকে আমরা বলতে পারি উন্নয়ন (development).

বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন এই শব্দদুটি অনেকটা একার্থবাচক হলেও এদের মধ্যে যে ভাবগত পার্থক্য আছে সেটি নগণ্য নয়। বৃদ্ধির কাজটা দৃষ্টিগোচর হয় বাহির থেকে, কিন্তু উন্নয়ন ঘটে ভিতরের দিক থেকে। চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হয় বৃদ্ধির ফলে, বাইরের আলোবাতাস, মাটি জল তার এই বৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু অঙ্কুরের যে উদ্ভব ঘটে, সেটি তার আভ্যন্তরীণ পরিণতি।

ছোট শিশু মানুষে পরিণত হয় বৃদ্ধিতে, কিন্তু অমার্জিত অসামাজিক মানুষ মার্জিত ও সামাজিক হয়ে ওঠে উন্নয়নের ফলে।

("A very significant point is this, that growth is less dependent on internal factors than is development. By and large, growth is from without, development is from within growth is dependent on external stimulation, development upon internal changes.··· Thus development is rather a matter of nature and growth a matter of nurture. —Horne)

অতএব দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধিতে বহিরঙ্গ শক্তির লীলা আর উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ শক্তির।

শিক্ষার স্বরূপ—আত্মবিকাশ—

এই দিক দিয়ে বিচার করে প্রাচীনকালের অনেক মনীষী শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে বৃদ্ধির পরিবর্তে উন্নয়নকেই স্বীকার করেছেন। এই উন্নয়নকে আরো সঙ্কীর্ণ করে বলা যায় আত্মবিকাশ (unfoldment)। কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে মানুষের সমগ্র আভ্যন্তরীণ সুপ্তশক্তিকে বিকশিত করে তোলাই হল আত্মবিকাশ। (unfolding of the latent powers of the individual towards a definite goal.)

শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণে এতক্ষণ যে সংজ্ঞাগুলির উল্লেখ করা গেল তার মধ্যে এই শেষোক্ত আত্মবিকাশ তত্ত্বই (unfoldment) বহুকাল ধরে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁদের মতে, শিক্ষা কোন বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস নয়, শিক্ষার্থীর অন্তরের সম্যক বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা।

ইংরাজী এডুকেশন (education) শব্দটি বিশ্লেষণ করেও তাঁরা এই তত্ত্বে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন।

এডুকেশন (education) শব্দটি ল্যাটিন "educere" শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই শব্দটির অর্থ হল আকর্ষণ করা, প্রকাশ করা। সুতরাং এডুকেশন শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে এই নূতন সংজ্ঞার ইঙ্গিত।

সক্রেটিশ প্লেটো প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতেও শিক্ষা হল আন্তরিক সম্পদের উদ্ঘাটন। সক্রেটিশ ত শিক্ষককে মনের প্রসবকারী ধাত্রী (man-midwife of the mind) বলেই অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষক কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর মনের গুপ্ত সম্পদগুলি বাইরে প্রকাশ করে আনতে সাহায্য করেন। শিক্ষকের কাজ তার চেয়ে বেশী নয়।

প্লেটো বলেছেন, শিক্ষা কোন নূতন তথ্য শিক্ষার্থীর মনে ঢুকিয়ে দিতে পারেনা—পূর্ব থেকেই যা আছে তাই বাইরে প্রকাশ করতে পারে মাত্র। (education does not generate or infuse a new principle, it only guides and directs a principle already in existence. —Plato)

আমাদের দেশেরও অনেক অধ্যাত্মবাদী মনীষী যথা স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষায় আত্মবিকাশমূলক অভিব্যক্তিবাদই স্বীকার করেছেন।

[Education is the menifestation of the perfection already in man. Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside, it is all inside. —Swami Vivekananda

The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task master, he is a helper and guide. —Sree Aurobinda

By education I mean an all-round drawing out of the best

in child and man—body, mind and soul. Real education consists in drawing the best out of yourself. —Mahatma Gandhi]

—এঁদের মতে কাউকে নূতন কিছু শেখান যায় না। সবই রয়েছে মানুষের মনে, তবে সেগুলি কারো বা অবিন্যস্ত। শিক্ষকের কাজ হল সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলা, সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করা।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে ফ্রয়েবল আত্মার সর্বজ্ঞতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে অনন্ত শক্তির বিকাশ। প্রত্যেকটি মানুষ সেই অনন্ত শক্তির অংশ। আত্মবিকাশের দ্বারা মানুষ ক্রমশ এগিয়ে চলবে সেই আদর্শের দিকে, চরম পরিণতির দিকে। শিক্ষকের কাজ হল মানুষের এই স্বাভাবিক বিকাশের পথের অন্তরায়গুলিকে অপসারণ করা। এই দিক দিয়ে রুশোর স্বভাব-বাদের (naturalism) সঙ্গে অনেকটা মিল দেখতে পাওয়া যাবে।

শিক্ষার স্বরূপ—প্রয়োগবাদ—

কিন্তু অধ্যাত্মবাদীদের এই সংজ্ঞাগুলি বিচার করলেই বোঝা যাবে মূলতঃ এগুলি হল জড়ধর্মী (Static)। কোন গতি নেই, চাঞ্চল্য নেই, পরিবর্তন নেই। তা ছাড়া এ হল একান্তই বাস্তব-বর্জিত তত্ত্বমাত্র। সুতরাং এরই প্রতিক্রিয়ায় নূতন যে দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠল তাকে বলা যায় প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই এই মতের উদ্ভাবক ও প্রচারক। —এঁদের মতে, জগতে সব কিছুই গতিশীল পরিবর্তনশীল, প্রতিনিয়ত এখানে পরিবর্তন চলেছে বস্তু জগতে ও ভাবজগতে। সুতরাং শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে গতিশীলতার কথাই মুখ্য।

শিক্ষা বলতে মনের মধ্যে কোন একটা পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানোদ্ঘাটন, কিংবা নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ অথবা ভবিষ্যতের কোন স্থির লক্ষ্যে পৌছুবার প্রস্তুতি-করণ—এর কোনটাই সত্য হতে পারে না। চলিষ্ণু জগতে শিক্ষার স্বরূপ চলিষ্ণু হতে হবে, নইলে তা হবে বাস্তববিরোধী। সুতরাং শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা জীবনের প্রস্তুতিকরণ নয়, জীবনযাপন। (Education is not a preparation for life rather it is living—J. Dewey.)

জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিশু ক্রমশ এগিয়ে চলে পরিণত মানুষের দিকে। নিরন্তর সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে—এই হল তার শিক্ষা। ভবিষ্যতে ভালভাবে বাঁচবার সুবিধার জন্য আজকের শিশুর মনে

যদি কোন আপাত অপ্রয়োজনীয় শুষ্ক জ্ঞান ভর্তি করে রাখবার চেষ্টা করি, সেটাকে আর যাই বলি, শিক্ষা বলা চলবে না। শিশু যেমন ক্রমশ বড় হতে হতে চলেছে—তার শিক্ষার ধারাও তেমনি তৎকালিক প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে চলেছে সমান্তরাল ভাবেই।

ডিউই সাহেবের এই প্রয়োগবাদ তত্ত্বের উপর জোর দিয়ে শিক্ষাবিদ রেমণ্ট উন্নয়নবাদের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার ফলে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ তার কায়িক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সার্থক অভি-যোজন করে চলতে পারে। [Education means that process of development in which consists the passage of a human being from infancy to maturity, the process wherby he gradually adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment. —Raymont]

উন্নয়নের কথা স্বীকার করলেই প্রশ্ন হয়—কিসের উন্নয়ন? শূন্যের ত উন্নয়ন হয় না। বীজ থেকে বৃক্ষের উন্নয়ন, ভ্রূণ থেকে শাবকের উন্নয়ন—তেমনি ব্যক্তিমানসের উন্নয়ন স্বীকার করতে হলে মানুষের মনের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব মানতে হয়। শিক্ষকের কাজ হল, শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তিগুলিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সুমার্জিত ও সুসামাজিক করে ফুটিয়ে তোলা।

কিন্তু এই দুরূহ কার্যটি কি ভাবে করা যায়? জীবনের উপরে জীবনেরই প্রভাব পড়ে, পুঁথির প্রভাব পড়ে না।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে, আবার শিক্ষার্থীর প্রভাবেও শিক্ষকের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষার স্বরূপ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—

শিক্ষাবিদ অ্যাডাম শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process) বলেছেন।

(Education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other —Sir John Adam)

জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার শিশু মনে সুপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষকের কাজ

কেবলমাত্র সেই সুপ্ত জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলা—এই পুরাতন মতবাদ অ্যাডাম সাহেব স্বীকার করেন না। শিক্ষকেরও কিছু বলবার আছে, শেখাবার আছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মিলনে তবেই শিক্ষার উদ্ভব। এডুকেশন শব্দটির ল্যাটিন মূল বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, শব্দটির উৎপত্তি educere থেকে না ধরে educare থেকেও ধরা যায়, যার অর্থ হচ্ছে শিক্ষিত করা (to educate), পালন করা (to rear), বর্ধিত করা (to raise)। সুতরাং শিক্ষার স্বরূপ কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ নয়, শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

ফ্রয়েবল্ শিক্ষার স্বরূপ বলতে গিয় চারাগাছ ও মালীর উপমা দিয়েছেন। মালীর মতই যত্ন নিয়ে আগ্রহ নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক মানব সমাজের ছোট ছোট চারাগুলিকে সুন্দর সুস্পষ্ট করে তুলবেন। প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে; শিক্ষক সস্নেহে তাদের সেই সব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবেন। প্রত্যেকটি ছেলেকে গড়ে পিটে গোপাল করে তুলবার চেষ্টা করবেন না—রাখাল এবং গোপাল উভয়কেই সুসম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করবেন—

(But while each plant must develop according to the law of its own nature, while it is impossible for example, for a cabbage to develop into a rose. there is yet room for a gardener. The good gardener by his act sees to it that both his cabbage and his roses achieve the finest form possible... ...Froeble.)

যদি কোন আপাত অপ্রয়োজনীয় শুষ্ক জ্ঞান ভর্তি করে রাখবার চেষ্টা করি, সেটাকে আর যাই বলি, শিক্ষা বলা চলবে না। শিশু যেমন ক্রমশ বড় হতে হতে চলেছে—তার শিক্ষার ধারাও তেমনি তৎকালিক প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে চলেছে সমান্তরাল ভাবেই।

ডিউই সাহেবের এই প্রয়োগবাদ তত্ত্বের উপর জোর দিয়ে শিক্ষাবিদ রেমণ্ট উন্নয়নবাদের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার ফলে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ তার কায়িক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সার্থক অভি-যোজন করে চলতে পারে। [Education means that process of development in which consists the passage of a human being from infancy to maturity, the process wherby he gradually adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment. —Raymont]

উন্নয়নের কথা স্বীকার করলেই প্রশ্ন হয়—কিসের উন্নয়ন? শূন্যের ত উন্নয়ন হয় না। বীজ থেকে বৃক্ষের উন্নয়ন, ভ্রূণ থেকে শাবকের উন্নয়ন—তেমনি ব্যক্তিমানসের উন্নয়ন স্বীকার করতে হলে মানুষের মনের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব মানতে হয়। শিক্ষকের কাজ হল, শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক মানসিক প্রবৃত্তিগুলিকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সুমার্জিত ও সুসামাজিক করে ফুটিয়ে তোলা।

কিন্তু এই দুরূহ কার্যটি কি ভাবে করা যায়? জীবনের উপরে জীবনেরই প্রভাব পড়ে, পুঁথির প্রভাব পড়ে না।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে, আবার শিক্ষার্থীর প্রভাবেও শিক্ষকের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষার স্বরূপ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—

শিক্ষাবিদ অ্যাডাম শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process) বলেছেন।

(Education is a bipolar process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other —Sir John Adam)

জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার শিশু মনে সুপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষকের কাজ

কেবলমাত্র সেই সুপ্ত জ্ঞানকে জাগিয়ে তোলা—এই পুরাতন মতবাদ অ্যাডাম সাহেব স্বীকার করেন না। শিক্ষকেরও কিছু বলবার আছে, শেখাবার আছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মিলনে তবেই শিক্ষার উদ্ভব। এডুকেশন শব্দটির ল্যাটিন মূল বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, শব্দটির উৎপত্তি educere থেকে না ধরে educare থেকেও ধরা যায়, যার অর্থ হচ্ছে শিক্ষিত করা (to educate), পালন করা (to rear), বর্ধিত করা (to raise)। সুতরাং শিক্ষার স্বরূপ কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ নয়, শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

ফ্রয়েবল্ শিক্ষার স্বরূপ বলতে গিয় চারাগাছ ও মালীর উপমা দিয়েছেন। মালীর মতই যত্ন নিয়ে আগ্রহ নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক মানব সমাজের ছোট ছোট চারাগুলিকে সুন্দর সুস্পষ্ট করে তুলবেন। প্রত্যেকটি শিশুর নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে; শিক্ষক সস্নেহে তাদের সেই সব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবেন। প্রত্যেকটি ছেলেকে গড়ে পিটে গোপাল করে তুলবার চেষ্টা করবেন না—রাখাল এবং গোপাল উভয়কেই সুসম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করবেন—

(But while each plant must develop according to the law of its own nature, while it is impossible for example, for a cabbage to develop into a rose. there is yet room for a gardener. The good gardener by his act sees to it that both his cabbage and his roses achieve the finest form possible......Froeble.)

শিক্ষার প্রণালী

(The process of educatin)

জীবসৃষ্টির অন্ধকারময় আদিযুগ থেকে বর্তমানের এই সভ্যতালোকিত যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ক্রমোন্নতির ধারা যেমন চমকপ্রদ তেমনি জটিল। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে করতে এগিয়ে চলেছে জীব। আগেই বলেছি এই অভিযোজন কার্যটির নামই হল শিক্ষা। কিন্তু এই অভিযোজনের কৌশলটি বড় অদ্ভুত। অভিযোজন অর্থে জীবনের পথে এগিয়ে চলার শিক্ষা। এগিয়ে চলার অর্থই হল পুরাতনের বনিয়াদের উপর নূতনের সৌধ নির্মাণ।

জীবনপ্রয়াসের আদিম প্রেরণায় জীব মাত্রেই ছুটে চলেছে নিজ নিজ পথে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার নুড়ি কুড়াতে কুড়াতে।

এদের মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা জীবনপ্রয়াসের অনুকূল, যেগুলি অভিযোজন প্রচেষ্টায় সার্থক, অথবা তার জীবনধারা অব্যাহত রাখার সহায়ক, সেইগুলিই সে দিয়ে যায় পরবর্তী বংশধরের হাতে, সহজাত সংস্কার (instinct) হিসাবে, সেগুলি জীবের মধ্যে জেগে থাকে। জীবমাত্রই ত নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, এদের মধ্যে যেগুলি তার জীবনপ্রয়াসের অনুকূল সেই গুলিই মাত্র সে সঞ্চয় করে চলে মনের গহনে, এ কথা ত আগেই বলেছি। একদিকে সে নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে, অপর দিকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কিছু কিছু রেখে যাচ্ছে উত্তর পুরুষের জন্য। —এইভাবে যুগপৎ চলেছে উপার্জন ও সঞ্চয়।

শুধু বস্তু জগতে নয়, ভাব জগতে ও চিন্তা জগতেও এই লীলা সমানে চলেছে—উপার্জন ও সঞ্চয়। সমস্ত জীবজগতের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের কথা আলোচনা করতে গেলে সেখানেও এই দুইটি বিপরীত শক্তির যুগপৎ লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

মানুষের সমগ্র কাজ কর্ম চিন্তাভাবনা সবই মোটমুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায় (ক) সৃষ্টিমূলক ও (খ) সঞ্চয়মূলক। প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এই দুটি ভাব। সব রকম কাজ যে সবসময় করে যাচ্ছে সেই মনকে বিশ্লেষণ করলে দেখব, তার মধ্যে এই দুটি বৃত্তিই কাজ করছে। একটা

দিয়ে সে একদিকে যেমন তার যাবতীয় পুরাতন অভিজ্ঞতা আঁকড়ে রাখছে, পুরাতন পথেরই পুনরাবৃত্তি করছে, তেমনি আর একটা বৃত্তি দিয়ে নূতন অভিজ্ঞতাকে সে অনবরত সঞ্চয় করে যাচ্ছে। যুগপৎ চলছে মনের ভাণ্ডারের এই উপার্জন ও সঞ্চয়ের লীলা। বিপরীতধর্মী মনের প্রকাশ তার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে, প্রত্যেকটি চিন্তার মধ্যে। আমরা বড় হচ্ছি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারছি, সেগুলো সঞ্চয় করছি এবং সে সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করেই আবার নূতন ভাব অর্জন করছি, রচনা করছি নূতনের সৌধ।

[Every act of self-assertion is both hormic and mnemic ! hormic in so far as it in an instance of the conservative or creative activity which is the essence of life, mnemic in so far as its form is at least partly shaped by the organism's individual or racial history—P. Nunn]

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতি নিয়ত আমাদের মনের মধ্যে ঘা দিচ্ছে। অভিজ্ঞতার ছাপ সঞ্চিত থাকছে মনের গহনে, পুরাতনের ছাপ অনবরত জড়িয়ে যাচ্ছে নূতনের সঙ্গে ; তৈরী হচ্ছে বিচিত্র ছাপজট (apperceptive mass) বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট তাঁর শিক্ষা দর্শনে ছাপজটের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। শিশু নূতন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার সময় পুরাতন অভিজ্ঞতার পটভূমিকাতেই তা গ্রহণ করে থাকে, জানা থেকে অজানায় যেতে চায়। পুরাতন অভিজ্ঞতার ছাপজটের উপর ভিত্তি করেই নূতন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় শিশু-মনে। পার্শি নান্ সাহেব মনের এই দুইটি বৃত্তির নাম দিয়েছেন হোর্মি (Horme) অর্থাৎ উপার্জনীবৃত্তি ও নিমি (Mneme) অর্থাৎ সঞ্চয়ীবৃত্তি। বলাই বাহুল্য, এ দুটি কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়, মানসিক কর্ম পদ্ধতির দুটি দিক মাত্র ; বিপরীত ধর্ম নয় পরস্পরের পরিপূরক। আমরা যাকে স্মৃতি বলি সে হচ্ছে মনের এই সঞ্চয়ীবৃত্তির (Mneme) সজ্ঞান স্তর। তাছাড়া নির্জ্ঞান স্তরেও এই সঞ্চয়ীবৃত্তির কাজ চলেছে অব্যাহত ধারায়। মনের গহনে কত কি যে জমা হয়ে চলেছে তার সব খবর আমাদের জানাও নেই। আমাদের জ্ঞানরাজ্যে স্মৃতিরূপে যেটুকু ফুটে আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ডুবে আছে নির্জ্ঞান মনের গভীরতায়।

শুধু মানুষের বেলায় নয়, সমগ্র জীবজগতেই এই ব্যাপারটা ঘটে থাকে। মানুষের বেলায় তার স্মৃতিকে সচেতন মনের ক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়, কিন্তু

ইতরপ্রাণীর মধ্যে স্মৃতির খেলা দেখা যায় সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) রূপে। কোন কোন পাখি ডিম পাড়বার সময় হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সমুদ্র-পর্বত পার হয়ে চলে যায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে, একটুও পথ ভুল হয় না। তাছাড়া নানাজাতীয় কীট-পতঙ্গ পাখি চিরকাল ধরে একই বিশিষ্ট ধরনের বাসা তৈরী করে যায়, একটুও তার পরিবর্তন নেই। এতে বেশ বোঝা যায় ইতর প্রাণীর মধ্যে স্মৃতি-সংরক্ষণী বৃত্তিটি সমভাবে কার্যকরী।

যাই হোক এই স্মৃতি-সংরক্ষণী বৃত্তির কার্যটি মানুষের বেলায় কিভাবে প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধেও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে।

কোন কিছু যখন আমরা ভাল করে পড়ি, তখন বেশ মনে থাকে, অথচ কিছুদিন বাদেই তা ভুলে যাই। কিন্তু আবার যদি পড়তে বসি তাহলে দেখা যাবে অনেক সহজেই তা মনে থাকছে। কেন এমন হয়? উত্তরে আমরা বলতে পারি না কি—প্রথমবারের পড়াটা মনের সজ্ঞান স্তরে অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে সব সময়ে না থাকলেও মনের গহনে থেকে গিয়েছে। দ্বিতীয় বারের চর্চায় তা ভেসে উঠল মনের উপর তলায়।

অনেক প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কিছু মুখস্থ করতে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই তার ফলটি পুরোপুরি পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্যালার্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন একটানা দীর্ঘ কাল ধরে মুখস্থের চেষ্টা না করে মধ্যে কিছু কাল অবসর দিয়ে আবার পড়লে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। তার কারণ হিসাবে বলা যায়, মনের সজ্ঞান স্তরের কাজটা অবসর কালে মনের নির্জ্ঞান স্তরে সমভাবেই চলতে থাকে। নির্জ্ঞান মনের এই সংযোজন (consolidation) ক্রিয়াটি যে মানসিক সংরক্ষণী বৃত্তির (Mneme) কাজ একথা ত বলাই বাহুল্য।

প্রায়ই দেখা যাবে কাজের ফলটা কাজের অব্যবহিত পরেই দেখা না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে তা দেখা দেয়। এই সময়টা নির্জ্ঞান মনের সংযোজন ক্রিয়া চলতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা কথা কিছুতেই মনে আসছে না। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করেও তার কোন হদিস মিলছে না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বিষয়ান্তরে মন দিলে, কখনও বা একটা ঘুমের পরে আপনা থেকেই তা মনে পড়ে যায়। বলাই বাহুল্য এটাও হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের সংযোজন ক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম জোন্স রহস্য করে বলেছেন, "আমরা শীতকালে শিখি সাঁতার আর গ্রীষ্মকালে স্কেটিং (We learn to swim in winter and to skate in summer)"—একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে আমরা সাধারণতঃ শীতেই স্কেটিং খেলি এবং গ্রীষ্মে খেলি সাঁতার। তারপর আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুশীলন ছেড়ে দেই। কিন্তু শিক্ষার কাজটা অবসর সময়েও চলতে থাকে মনের নির্জ্ঞান স্তরে। তার ফলে যেটা শীতকালে সুরু করে ছেড়ে দিয়েছিলাম তার ফলটা পেলাম গ্রীষ্মকালে অথবা গ্রীষ্মকালীন শিক্ষার ফলটা শীতকালে।

সুতরাং পাকাপাকি রকমে কিছু শিখতে হলে নির্জ্ঞান মনের সংযোজনের জন্যে কিছু সময় ছেড়ে দেওয়া দরকার।

শিক্ষা গ্রহণের এই প্রণালীটি বড়ই অদ্ভুত। মনের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তর জুড়ে এর ক্রিয়া, অল্প অংশই ঘটে আমাদের জ্ঞাতসারে আর অধিকাংশ অজ্ঞাতসারে।

থর্নডাইক একটি ক্ষুধিত বিড়ালকে খাঁচায় পুরে শিক্ষার ক্ষেত্রে চেষ্টা ভ্রান্তির (Trial and Error) যে তত্ত্বটি পরীক্ষা করেছিলেন তাতেও মনের ওই সংরক্ষণী বৃত্তি ও সঞ্চয়ী বৃত্তির খেলা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

বদ্ধ খাঁচা থেকে বোরোবার জন্য বিড়ালটি যতগুলি প্রচেষ্টা করেছিল তার মধ্যে কতকগুলি ব্যর্থ, কতকগুলি সার্থক। এই ব্যর্থতার ও সার্থকতার সম্বন্ধে তার স্মৃতির মধ্যে একটি ছাপ পড়ে মনের সংরক্ষণী বৃত্তির দ্বারা এবং তারই দ্বারা পরিচালিত হয়ে সার্থক প্রচেষ্টার অনুশীলন করে উপার্জনী বৃত্তির দ্বারা। বিড়ালের এইসব দৈহিক ক্রিয়ার পিছনে যে মানসিক ক্রিয়া চলেছে সেটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মনের সংযোজনী বৃত্তির দ্বারা। এইভাবে আমাদের শিক্ষার কাজ চলেছে মনের অর্জন ও সংরক্ষণ বৃত্তির যুগপৎ প্রচেষ্টায়।

নূতন সৃষ্টি সম্ভবই হয় না পুরাতনের সঞ্চয় না পেলে। সুতরাং সৃষ্টি ও সঞ্চয় কেউ স্বতন্ত্র নয়—পরস্পর নির্ভরশীল। সৃষ্টির সাহায্যেই সঞ্চয়ের সম্পদ বাড়ে আর সঞ্চয়ের সম্পদ জাগায় নূতন সৃষ্টির প্রেরণা।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

শিশুকালে আমরা ভাষাশিক্ষা করেছিলাম, কত কষ্টে কতদিন ধরে একটি একটি শব্দ আর তার অর্থ আয়ত্ত করতে হয়েছে—আজ কথা বলার সময়ে এই জাতীয় মানসিক প্রচেষ্টা আর করতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই আমরা

কথা বলে যাই। কথা বলার কৌশল ও শব্দার্থ মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে সংরক্ষণী (Mneme) বৃত্তি রূপে। সেই শক্তিটুকুর উপর নির্ভর করে আমরা প্রতি নিয়ত কত নূতন কথা বলে যাচ্ছি কত নূতন ছন্দে নূতন শব্দে কাব্য রচনা করছি, বক্তৃতা দিতে গিয়ে কত নূতন শব্দ যোজনা করে চলেছি। এমনিভাবে সঞ্চিত সম্পদকে সম্প্রসারিত করে চলেছি মনের উপার্জনী (Horme) বৃত্তির সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সঞ্চয় ছাড়া নূতন উপার্জন হয় না। অতীতের অভিজ্ঞতাই আমাদের নূতনের পথনির্দেশ করে—নূতন পথে পরিচালিত করে।

[This mnemic mass is the matrix in which horme stirs and out of which it emerges, taking definite shape and content as it proceeds—P. Nunn.]

শিক্ষার লক্ষ্য

(Aims of Education)

শিক্ষার সংজ্ঞা :—

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে হলে পূর্ব হতেই তার একটা লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয়। বাস্তুকার যখন গৃহ নির্মাণ সুরু করে, কুম্ভকার যখন ঘট কলসাদি তৈরী করে, কিংবা স্বর্ণকার যখন কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কার গঠন করতে বসে তখন তারা নির্ণীয়মান বস্তুর একটা বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে নেয়। মানুষের সমাজও যখন মানুষকে তার সুযোগ্য সামাজিক সদস্য হিসাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চায় সে তখন শিক্ষার একটা স্থিরলক্ষ্য ধরেই অগ্রসর হয়।—কী সেই লক্ষ্য ?

শিক্ষার লক্ষ্য কি ?

বলাই বাহুল্য এই লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিক বিভিন্ন দিক থেকে এই লক্ষ্যটি স্থির করবার চেষ্টা করেছেন।

আপাত লক্ষ্য ও চরম লক্ষ্য :—

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—শিক্ষার লক্ষ্য যে একটাই হবে তারই বা ঠিক কি? মালি যখন একটা আমগাছ যত্ন করে ঘিরে সার-জল দিয়ে সযত্নে প্রতিপালন করে তখন তার আপাত লক্ষ্য হচ্ছে গাছটি বাঁচিয়ে রেখে বড় করে তোলা, যদিও তার মূল লক্ষ্য গাছ থেকে ফল প্রাপ্তি। শিক্ষার লক্ষ্যকেও তেমনি মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—**আপাত লক্ষ্য** (Proximate aim) এবং **চরম লক্ষ্য** (Ultimate aim)। চরম লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে মতভেদ হয়েছে বিস্তর, কিন্তু শিক্ষার আপাত লক্ষ্য যে কিছু অর্থ অর্জন করা, চিন্তায় ও কর্মে কিছু নৈপুণ্য অর্জন করা, নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস অনুশীলন করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির চর্চা করা, নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করা, এককথায় সমাজের একটি প্রয়োজনীয় সদস্য হিসাবে নিজেকে সর্বরকমে প্রস্তুত করে তোলা, এ বিষয়ে কারো মতভেদ সম্ভবত নেই। শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে আমরা ত কেবল আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন

বা বিচিত্র তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তি মাত্র বুঝি না, সংস্কৃতিবান ও রুচিপরায়ণ ব্যক্তিও বুঝি। এবং এই বোধটির মধ্যেই পাওয়া যাবে শিক্ষার আপাত লক্ষ্যের পরিচয়।

শিক্ষার আপাত লক্ষ্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে আজ বড় হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে অর্থোপার্জন বা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বর্তমান শিক্ষাবিদেরা একে ভাত-কাপড়ের লক্ষ্য (Bread and Butter aim) বলে শ্লেষাত্মক নামকরণ করেছেন। কিন্তু জৈব সংগ্রামে জয়ী হবার উপযুক্ত আয়ুধ সংগ্রহ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটা লক্ষ্য হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এইটাই ত শিক্ষার একমাত্র চরম লক্ষ্য হতে পারে না। দৈহিক ক্ষুন্নিবৃত্তিটা অপরিহার্য কাম্য বটে, তবে একমাত্র কাম্য নয়। মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তিরও প্রয়োজন আছে। সভ্যতার পথে মানুষ যত এগিয়ে চলেছে ততই তার মনের পরিধি দেহকে ছাড়িয়ে চলেছে—(Man cannot live by bread alone.) সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে যদি ক্রমবর্ধমান মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থাপনা না থাকে তবে তা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

সুতরাং সমস্যা হয়েছে চরম লক্ষ্য নিয়ে, যার ফলে মানুষের মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে।

কিন্তু বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন বিভিন্ন প্রকারের। সামাজিক ক্ষুধাও বিচিত্র ধরনের তাই, তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থাও যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকারের।—সুতরাং শিক্ষার চরম লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শিক্ষার এই চরম লক্ষ্য এবং তার গতি প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ শিক্ষার তত্ত্বটিকে যে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন তাকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখতে পারি।

বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ :—

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে যতরকম মতভেদই থাক, একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জীবনের লক্ষ্যকেই অনুসরণ করে চলে শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন স্থায়ী সংজ্ঞা রচনা করা ত সম্ভব নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন পরিবেশে তা অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন দার্শনিকেরা, এবং সেই সম্বন্ধটিরই ব্যাপক রূপায়ণ ঘটে শিক্ষার মধ্যে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য অলোচনার প্রাক্কালে জগতের স্থূল কয়েকটি দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

এই দার্শনিক চিন্তাধারা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—**অধ্যাত্মবাদী** ও **জড়বাদী**।

অধ্যাত্মবাদী দর্শন :—

অধ্যাত্মবাদীরা জগৎ ও জীবনের ইহলৌকিক সম্বন্ধটির চরম সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁরা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী আত্মার সত্তায় বিশ্বাসী। জগতের অধিকাংশ ধর্মই এই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।—বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় যাবতীয় দর্শনের এই হল মূল কথা। স্থূল জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন বলে ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধিকে একান্তই সাময়িক বলে উপেক্ষা করেছেন। তাই ভারতীয় শিক্ষার চরম লক্ষ্য ইহজীবনের নশ্বর সুখ-বিধানের দিকে নয়, পারলৌকিক অবিনশ্বর সুখবিধানের দিকে। **যে বিদ্যায় মানুষ এই জরামরণ জর্জরিত প্রপঞ্চময় জগতের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে অবিনশ্বর অধ্যাত্ম জীবনে মুক্তি লাভ করতে পারে, নির্বাণ লাভ করতে পারে, সেই হল প্রকৃত বিদ্যা।**

প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তায় ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ উভয়েরই স্থান ছিল, কিন্তু কোন দর্শনেই (সম্ভবতঃ চার্বাক দর্শন ব্যতীত) ইহজগতকে চরম বলে গ্রহণ করেনি। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহজীবনকে পরবর্তী অধ্যাত্ম জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল— 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। তাই মুক্তিপ্রদানকারী বিদ্যার অনুশীলন করতে গিয়ে ভারতবর্ষ মানবগোষ্ঠীকে চতুরাশ্রম প্রণালীর মাধ্যমে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিল। বৌদ্ধধর্মও সংঘজীবনের কৃচ্ছ্রসাধনায় নির্বাণ লাভের পথ সুগম করতে চেয়েছিল।

জড়বাদী দর্শন :—

পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রগুলি আবিষ্কার করে বিশ্বপ্রকৃতির উপরে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সুরু করল তখন থেকেই তার দৃষ্টি ক্রমশ জড়জগতের সত্যতার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল।

সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ভগবানের অনির্বচনীয় অমোঘ শক্তির উপর মানুষের আস্থা ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। সুরু হল জড়বাদী দর্শনের। যা কিছু দেখা যায়, বোঝা যায়, জানা যায়, মাপা যায় তাই নিয়েই সুরু নূতন দর্শনের কারবার। এমন কি মানুষের মন চৈতন্য আত্মা সব কিছুরই একটা জড়বাদী দৃষ্টিবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা সুরু হল। ইহজগতের সুখ দুঃখকে এঁরা মিথ্যা নশ্বর বলে অস্বীকার করতে পারলেন না, অস্বীকার করলেন পারলৌকিক জীবনের কাল্পনিক অস্তিত্ব। সুতরাং **শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণের সময়ে তাঁরা ইহলৌকিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছেন।**

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দর্শনের মূল কথাই হল জগৎ সত্য। সুতরাং সত্য জগতের সত্যতা উপলব্ধির প্রচেষ্টাই জড়বাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য।

ভাববাদী দর্শন :—

অধ্যাত্মবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে অন্য আর একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক জড়-বাদের প্রচলন আছে—ভাববাদ (Idealism)। ভাববাদ ইহজগতকে বাতিল করে একমাত্র অধ্যাত্মজগৎকেই সত্য বলে স্বীকার করে না। জড়জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করলেও প্রকৃতিবাদের (Naturalism) যান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলায় এঁরা বিশ্বাসী নয়। বিশ্বজগতের সুশৃঙ্খল কার্যকারণ সূত্রের অতিরিক্ত এক অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলে এঁরা **জীবন-দর্শনে সত্যশিব সুন্দরের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে চান।**

প্রকৃতিবাদী দর্শন :—

আবার জড়বাদী দর্শনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে **প্রকৃতিবাদী দর্শন** (Naturalistic philosophy) এবং **প্রয়োগবাদী দর্শনের** (Pragmatic philosophy) উদ্ভব।

জড়প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মাবলীর অমোঘত্বে অতিমাত্রায় আস্থাশীল হল প্রকৃতিবাদী দর্শন। তাঁদের মতে জাগতিক সমস্ত বিষয়, এমন কি, মানুষের চৈতন্যসত্ত্বা পর্যন্ত প্রাকৃতিক যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদে শিক্ষা চলবে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে।

প্রকৃতিকে দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে। এক, বহিঃস্থপ্রকৃতি এবং অপর, অন্তস্থ প্রকৃতি। প্রথমতঃ বহিঃস্থপ্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ মানুষের তৈরী সামাজিক আচার নিয়ম শৃঙ্খলার

কৃত্রিমতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রেখে শিক্ষাকে অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষার্থীর আন্তরপ্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য অনুসারে, তার অন্তরের স্বাভাবিক চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এককথায়, **শিক্ষার্থীর আন্তরপ্রকৃতি অনুসারে বহিঃপ্রকৃতির পরিবেশে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হবে শিক্ষার ধারা, তাতে থাকবে না কোন কৃত্রিমতা কলুষতা যান্ত্রিকতা।** এই জাতীয় প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রকৃতিবাদীরা এমন একটা আদর্শ স্তরে গিয়ে উপনীত হন যে প্রকৃতিবাদীরা প্রায়ই ভাববাদীর সঙ্গে মিশে যান। তাই প্রকৃতিবাদের সব চেয়ে বড় সমর্থক রুশো অনেকের মতে প্রচ্ছন্ন ভাববাদী মাত্র।

প্রয়োগবাদী দর্শন :— Pragmatism—Philosophy.

প্রয়োগবাদ আধুনিক জগতের সর্বশেষ অবদান। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই অভিনব মতটিকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছেন। এই মতে কোন কিছুরই স্থায়ী মূল্য নেই। চলিষ্ণু জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। তাই সব কিছুই এখানে আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)।

বিজ্ঞানের আপেক্ষিক মতবাদের দ্বারা এই মত যে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত তা বলাই বাহুল্য। যে তত্ত্ব জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যাবে না এঁদের মতে তার কোন দার্শনিক মূল্যই নেই।

প্রত্যেকটি তত্ত্ব বা তথ্য দার্শনিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্বে এঁরা যাচাই করে নিতে চান তার সার্থকতা কি, মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতা কি ? এই মতে গতি আছে কিন্তু বিরতি নেই, কোন স্থির লক্ষ্য থাকতে পারে না এই মতে, কোন স্থায়ী আদর্শের স্বীকৃতি নেই, আছে জীবনের বিচিত্র কর্মে প্রয়োগসার্থক গতি, আছে এগিয়ে চলার বাণী—চরৈবেতি, চরৈবেতি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগবাদীরা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শিক্ষার শেষকথা আরো শিক্ষা, তারপরে আরো শিক্ষা…এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এককথায় **শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল পথগামী।** নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন, সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত হয় অভিজ্ঞতা, এগিয়ে চলে শিক্ষা। সুতরাং জীবন ও শিক্ষা সমার্থবাচক।

মোটামুটিভাবে এই কয়টি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে যুগে যুগে দেশে দেশে কি ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত হয়েছে সংক্ষেপে এইবার তার আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার লক্ষ্য—বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে :—

(১) সুপ্রাচীনকলে **ভারতবর্ষে** অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্ভব ঘটেছিল ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেছি। বিদ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করে দেখা হত—**পরাবিদ্যা** এবং **অপরাবিদ্যা**।

শিক্ষার লক্ষ্য—প্রাচীন ভারতে :—

মুক্তিজ্ঞান প্রদায়িনী আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বলা হত পরাজ্ঞান, কিন্তু সকল মানুষই যে আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী হতে পারে না—এই সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাই জড়জগতের ব্যবহারিক বিদ্যাকেও তাঁরা অস্বীকার করেন নি—তার নাম দিয়েছিলেন অপরাবিদ্যা। অবশ্য অপরাবিদ্যা থেকে যে পরাবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হত তা বলাই বাহুল্য। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দিক লক্ষ্য রেখেই ছাত্রদের শেখান হত অপরাবিদ্যা। শিক্ষার প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্যভাবে তা শেখান হত না।

শিক্ষার লক্ষ্য—প্রাচীন গ্রাসে :—

(২) প্রাচীনত্ব হিসাবে ভারতের পরেই **প্রাচীন গ্রীসের** কথা উল্লেখ করতে হয়। গ্রীসের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্রীসের শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র ইউয়োরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির উপর এককালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির উপর যে ইয়োরোপীয় প্রভাব ভুরিপরিমাণ, সে কথা না বললেও চলে।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যাবে স্পার্টা ও এথেন্সের দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী। শিক্ষাপদ্ধতির বেলাতেও তার অন্যথা হয়নি। **স্পার্টার** জীবনদর্শনে স্টেটের সর্বময়তা প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেকটি স্পার্টান জন্মগ্রহণ করে ও জীবনধারণ করে ষ্টেটের জন্য। ষ্টেটের সে একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাছাড়া তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—দুর্বলের স্থান নাই এই পৃথিবীতে—এই হল স্পার্টানদের স্থির বিশ্বাস। প্রত্যেকটি স্পার্টানকে তাই বাধ্যতামূলকভাবে সৈনিক হতে হবে। যারা দুর্বল বা বিকৃতাঙ্গ হয়ে জন্মাত তাদের রাষ্ট্রের বোঝাস্বরূপ মনে করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হত। শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বরূপের কোন মূল্যই ছিল না, একমাত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই

তাদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। তাই স্পার্টার শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল **সবল দেহ ও শক্ত মন** (Hardy mind in a hardy **body**)।

বিপরীতক্রমে **এথেন্সের** শান্তিময় জীবন পরিবেশে গড়ে উঠেছিল সত্যশিবসুন্দরের আদর্শবাদ। সক্রেটিশ প্লেটো এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের প্রভাবে এথেন্সবাসীর জীবনদর্শনে আনন্দ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না, নাগরিকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে দর্শন সাহিত্য ললিতকলার চর্চা করতে পারত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তিগত রুচি শক্তি সামর্থ্যের সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব হয়েছিল। তবে ব্যক্তিসত্তার উপর বেশী জোর দেওয়ায় সামাজ-সংহতি তেমন জোরাল হতে পারেনি। এথেন্সীয় শিক্ষার মূল কথা ছিল **সুন্দর দেহে সুন্দর মন** (Beautiful mind in a beautiful body)।

সোফিষ্ট :—

এথেন্সীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ আরো চরমে উঠেছিল **সোফিষ্ট** নামে একদল গ্রীক শিক্ষকদের হাতে। এঁরা সমাজকে একেবারে উপেক্ষা করে ব্যক্তি-সত্তাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং শিক্ষার সার্বজনীনরূপ তাঁরা স্বীকার করতে পারেন নি। তাঁদের মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত **ব্যক্তি সত্তার পূর্ণবিকাশ**—এছাড়া আর কিছুই নয়।

মধ্যযুগে ইয়োরোপে :—

মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এথেন্সীয় আদর্শবাদের কিছু প্রভাব পড়েছিল বটে কিন্তু তাদের জীবন-দর্শন ছিল পৃথক। খৃষ্টীয় শাসিত নীতি-বোধ মানুষকে মূলতঃ পাপাশ্রয়ী বলে ধরে নিয়েছিল। অনুতাপ, আত্মশাসন পাপস্বীকার প্রভৃতি ধর্মানুশাসন সম্মত আচার ব্যবহার অনুসরণ করে চলাই ছিল মধ্যযুগের আদর্শপন্থা। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল তখন **ধার্মিক মানুষ তৈরী করা।**

রেনেসাঁস—মানসিক বৃত্তির অনুশীলন :—

মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগোদয় (Renaissance) ঘটল ইয়োরোপে। এবং এই নবযুগের অরুণালোকে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রতিটি বিভাগ আলোকোদ্ভাষিত হয়ে গেল। চার্চশাসিত ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ-জীবনে ধ্বনিত হল মানুষের জয়গান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির চাহিদার উপর জোর দেওয়া হল। এথেন্সীয় শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত অতীন্দ্রিয়

জীবনকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও তা প্রাপ্তির পথ হিসাবে তাঁরা **মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনকেই** শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিলেন। বুদ্ধি স্মৃতি কল্পনা যুক্তিস্থাপনা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের জন্য তাঁরা বিচিত্র পাঠক্রম নির্দেশ করেছিলেন।

রুশোর প্রকৃতিবাদ :—

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় রুশোর শিক্ষায় **প্রকৃতিবাদ** (Naturalism in education) মানব সমাজের সর্বনাশা কৃত্রিম পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশে স্থাপনপূর্বক তার অন্তর্নিহিত ভাবগুলির বিকাশ-সাধনই তাঁর মতে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর মানসপুত্র এমিলের শিক্ষাধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এই প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষার কথা প্রচার করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসাবে রুশোর দান 'শিশুকেন্দ্রিকতা'র মূল্য সর্বজনগ্রাহ্য হলেও শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে প্রকৃতিবাদ-নির্ভর মত ত্রুটি শূন্য নয়।

হার্বার্টস্পেন্সার—সুসম্পূর্ণ জীবনযাপন :—

পরবর্তীকালে মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষার লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করেছিলেন **সুসম্পূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য প্রস্তুতকরণ** (Preparation for complete living) এই প্রস্তুতির প্রথম সোপান হল জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী অটুট স্বাস্থ্য লাভ। জীবনধারণ, জীবিকা অর্জন, সন্তানপালন এবং সর্ববিধ নাগরিক কর্তব্য সম্প্রাদন, এমন কি সুষ্ঠুভাবে অবসর বিনোদনের জন্যও চাই অটুট স্বাস্থ্য। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার শিশুশিক্ষায় শারীরিক শক্তি অর্জনের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন অথচ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের দিকের কথা আদৌ বিবেচনা করেন নি। সেই হিসাবে এই মতটা পরবর্তীকালে বিশেষ সমর্থন পায় নি।

ভাবী জীবনের প্রস্তুতি :—

কোন কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার লক্ষ্যকে আরো ব্যাপক আরো স্থিতিস্থাপক করবার জন্যে বলেন **ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুতিই হল শিক্ষার মূলকথা** (Preparation for future living)। কথাটা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট। ভাবীজীবন বলতে কি বুঝি, ভাবীজীবনের কি লক্ষ্য এই সব প্রশ্নের মীমাংসা পূর্বাহ্নেই করে নেবার দরকার। জীবনের লক্ষ্য স্থির হলে তবেই ত তার প্রস্তুতির লক্ষ্য স্থির হবে। যাই হোক, এই মতবাদীদের কাছে অর্থাৎ

যাঁরা শিক্ষাকে প্রস্তুতিকরণের কৌশল হিসাবে দেখেছেন তাঁরা ছাত্রের বর্তমান জীবনের কোন আত্যন্তিক মূল্য স্বীকার করেন নি। কাদার তালকে টিপেটুপে যেমন ধীরে ধীরে পুতুল গড়া হয়, তেমনি মানবশিশুকেও শিক্ষার টিপুনি দিয়ে ভবিষ্যতের জ্ঞানী মানুষ গড়বার চেষ্টা।

চরিত্র গঠন :—

আধুনিক কালের বহু শিক্ষাবিদের মতে **চরিত্র গঠনই** (Character building) হল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষাবিদ রেমণ্ট বলেছেন— শিক্ষকের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্মল চরিত্র গঠন—শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাংসপেশী গঠনও নয়, মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানার্জন বা অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনও নয়।

[The teacher's ultimate concern is to cultivate nor wealth of muscles, nor fulness of knowledge nor refinement of feealings, but strength and purity of Character—Raymount.]

অবশ্য চরিত্র বলতে এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে কতকগুলি নিষেধাত্মক নৈতিক অনুশাসন মেনে চলা মাত্র বুঝায় না—জীবনের সর্বাঙ্গীন আচার ব্যবহার রীতি-নীতির সুষম বিকাশই বুঝায়—(Character is sum total of Conduct).

মুদালিয়র কমিশনও শিক্ষার চরমলক্ষ্য হিসাবে এই প্রকার চরিত্র গঠনের কথাই বলেছেন—যে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে ভবিষ্যত সমাজের পরিপূর্ণ মঙ্গলবিধান করতে সমর্থ হয় সেই চরিত্র গঠনই হল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। [...The supreme end of the educative process should be the training of the character and personality of students in such a way that they will be able to realize their full potentialities and contribute to the well-being of the community—Mudaliar Commision].

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্দের মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। দেশ কাল ভেদে এদের মধ্যে কোনও কোনটি অগ্রাধিকার পেয়েছে, কখনও বা সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে এদের কিছু ইতরবিশেষ করে নূতন লক্ষ্য নির্ণয় করবার চেষ্টাও হয়েছে।

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ঃ—

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ আলোচনা করবার পূর্বে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠি ধীরে ধীরে যখন দলবদ্ধ হতে শিখল তখন থেকেই উদ্ভব হল দলপতির, রাজার অর্থাৎ একনায়কত্বের। দলের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছিল দলপতির, তেমনি আবার দলপতির প্রয়োজনে নিযুক্ত হতে লাগল দল, ব্যষ্টির স্বার্থে সমষ্টি। এমনি করে কাটল সুদীর্ঘকাল এবং এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বেদনাময়। বেদনার মাত্রা যখন কোথাও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে তখনই সেখানে অকস্মাৎ সুরু হয়েছে জনগণের অগ্নিগর্ভ হিমশীতল আগ্নেয়-গিরির প্রচণ্ড লাভা উদ্গীরণ। সেই লাভা প্রবাহে সমাধিস্থ হয়েছে কত রাজবংশ কত রাজসিংহাসন। বড় ভয়াবহ সে ইতিহাস। রক্তের অক্ষরে সে ইতিহাস লেখা হয়েছে যুগে যুগে—ক্রমশ মানুষ তার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝতে পেরেছে একনায়কত্বের সর্বনাশা পরিণতি।—অর্জন করেছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, বুঝতে পেরেছে ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টির শাসনের প্রয়োজনীয়তা—সে শাসন হয়ত কখন কুশাসন হতে পারে কিন্তু দুঃশাসন হবে না, কারণ তার অপসারণের চাবি কাঠিটা রয়েছে সমষ্টির হাতেই। তাই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যক্তি বিশেষের শাসনের পরিবর্তে জনগণের শাসনকে অভ্যর্থনা জানান হচ্ছে।

এই জাতীয় শাসনের বল্গা যাদের হাতে থাকবে, তারা কোন বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে জন্মাবে না। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তাকে মেনে নেবে নায়ক হিসাবে সাময়িকভাবে। এই মেনে নেওয়ার উপরেই তার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার। এই হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবার গুরু দায়িত্বটা পরোক্ষভাবে এখন পড়ছে প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপরে। কারণ গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সিংহাসন জনগণের শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধি বিবেচনার উপরে স্থাপিত।

সুতরাং আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করতে হলে জন-গণের শিক্ষাদীক্ষাও যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে চালাতে হবে। এর অন্যথা হলে ভেঙ্গে পড়বে গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো, গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে—ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা আবার উল্টো দিকে ঘুরতে সুরু করবে।

একক‌থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল উপাদানই হল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক। প্রত্যেকটি নাগরিকের শিক্ষার উপরই নির্ভর করছে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যত উচ্চ আদর্শই আমরা প্রচার করি না কেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শের দিনে শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শের স্থান বোধ হয় সর্বাগ্রে। কারণ নাগরিকতা শিক্ষার সাফল্যের উপরই রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নিভর করবে। প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তাধারা আজ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনহিতকর আদর্শ ব্যহত হতে বাধ্য। এই গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাগরিকতার শিক্ষার দায় ও দায়িত্বের কথা সুস্পষ্টভাবেই বলেছিল জন ডিউই [Education has a responsibility for training individuals to share in this social control instead of merely equipping them with ability to make their private way in isolation and competition.]

স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে তাদের সকল শিক্ষার মূল কথাই হবে সুনাগরিকতা শিক্ষা—একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘ কাল ধরে এক সাম্রাজ্যবাদী জাতির অধীনে থাকার ফলে রাজ্য পরিচালনার কোন দায়িত্বই তাদের কোনদিন নিতে হয় নি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে এবং এই দায়িত্ব বহনের মত ক্ষমতা তারা যেন লাভ করতে পারে সেইভাবে তাদের গড়ে তুলতে হবে। এই কথা মুদালিয়র কামিশনও বার বার উল্লেখ করেছেন—[Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsiblity for which every citizen has to be carefully trained.]

দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল পর-শাসনের আওতায় থাকার ফলে ভারতের আর্থিক বনিয়াদ একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে, ভারতীয় জীবন ধারণের মান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় একেবারে নীচের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই অভাব নেই অমিত সম্পদের সম্ভাবনার। আজ ভারতবাসীকে মানুষের মত বাঁচতে হলে প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ হতে হবে সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে বুদ্ধির দ্বারা, শ্রমের দ্বারা অধ্যবসায়ের দ্বারা।

তৃতীয়তঃ ভারতের বুকে আজ অজ্ঞানতার, অশিক্ষার বিরাট পাষানভার! সেই পাষাণভার অপসারিত করে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে আজ শিক্ষায় সংস্কৃতিতে নবজীবন দান করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের এই দায় ও দায়িত্বের কথা সবসময়ে স্মরণ রেখেই আজ তার শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করার দরকার।

গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকটি নরনারীকে আজ যে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হচ্ছে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই হয়ত অবহিত নন। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যের সমস্ত কিছু পরিচালনার ভার কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শে সমস্ত কিছু পরিচালনার ভার জনগণের হাতে। তাই জনগণকে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রবার্ট লো একদিন ঘোষণা করেছিলেন—"আমাদের প্রভুদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে সর্বাগ্রে [We must educate our masters.]

গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য—

সুতরাং এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে **গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষার লক্ষ্য** হওয়া উচিত—

প্রথমতঃ নিরঙ্কুশ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা এবং নূতন ভাবধারা গ্রহণের উপযোগী **মনের সাবলীলতা** (the capacity for clear thinking and a receptivity to new ideas) যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা।

মনের এই স্বচ্ছতা সাবলীলতা না থাকলে চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়, উপরন্তু বিভিন্ন সাময়িক হুজুগে প্রভাবিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকবে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, সব কিছুই **সংস্কারহীন খোলা মন** নিয়ে বিচার করার ক্ষমতা থাকা উচিত। [open mind receptive to new ideas] অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতি মোহ মানুষের দৃষ্টিকে যখন নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখবার ক্ষমতা সংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখে তখন কখনই সত্য দর্শন ঘটে না। মত্ত মনের উদারতা থাকে না। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীর মনে আগে থেকে যেন কোন সংস্কারের ঠুলি পরিয়ে দেওয়া না হয়।

তৃতীয়তঃ **লিখন ও বাচনের স্পষ্টতা** (clearness in speech in

writing) চিন্তার স্বচ্ছতা না থাকলে লিখন ও বাচনের মধ্যে অস্পষ্টতা এসে যায়। নিজের মত নিজের ইচ্ছা নিজের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে জানান যায় না। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

চতুর্থতঃ **পরার্থপরতা** গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হল "সকলের তরে আমরা সকলে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এইভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ সহকারে বসবাস করা, প্রত্যেকের সুখে দুঃখে সংবেদনশীল হওয়া, প্রত্যেকের জীবনকেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেতুলতে যথাসাধ্য সাহায্য করা। এর জন্য চাই **নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, সামাজিক সংবেদনশীলতা ও সহনশীলতা** গুণের বিকাশ সাধন। এইগুলির প্রত্যেকটি সামাজিকতা-বোধের ভিত্তিভূমি এবং তার উপর দাঁড়িয়ে আছে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ। সামাজিকতা-বোধের গোড়ার কথাই হল 'সবে মিলে করি কাজ' এবং সবে মিলে কাজ করবার মূলকথা হল নিয়মানুবর্তিতা।

শিশুকাল থেকেই এই গণতান্ত্রিক গুণগুলির অনুশীলন আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ই তার প্রকৃষ্টতম স্থান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্ব প্রকার শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু, পাঠক্রম, সহপাঠক্রম, পঠন পদ্ধতি এবং বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে এগুলি গেঁথে দিতে হয় এইটেই হল আধুনিক যুগের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। মোটকথা, বিদ্যালয়ের সমাজজীবনে যদি ছাত্রেরা সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে চলতে শেখে তবেই পরবর্তী নাগরিক জীবনেও তারা গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারবে।

এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত শিশুমনে গণতান্ত্রিক গুণের বিকাশসাধন। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মধ্য দিয়েই হোক বা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে দিয়েই হোক এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলবে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ।

বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ (International understanding)

শিক্ষার এই সব গণতান্ত্রিক গুণাবলীর চর্চা করার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র সুনাগরিক তৈরী করাই নয় বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ (international understanding) বা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি জাগ্রত করা। কথাটা স্পষ্ট করে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে

দেশকালের বাধা ক্রমশই ঘুচে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কি ঘটছে মুহূর্ত মধ্যে তা আমাদের গোচরীভূত হয়ে পড়ছে, দুস্তর সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত পার হয়ে মুহূর্ত মধ্যে মানুষ আজ দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে চলেছে। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে আজ মানুষের গতি অবাধ। একদিন ছিল 'ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ'; আর আজ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এতটুকু ছোট হয়ে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। রেডিও টেলিভিসন, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকজনদের মধ্যে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিশ্বময় আজ মানুষের বন্ধু, মানুষের আত্মীয় ছড়িয়ে আছে। এর ফলে মানুষে মানুষে হৃদ্যতা বাড়ছে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে। একদেশের খাদ্যাভাব ঘটলে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী উদ্বৃত্ত ফসলের দেশ থেকে খাদ্য চলে আসছে। কোথাও কোন নৈসর্গিক বিপদপাত ঘটলে সারাবিশ্বের দরদী মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেবার হস্ত প্রসারিত করে দিচ্ছে।

এককথায় বলতে গেলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দেশকালের বাধা দূর হয়ে গিয়ে সমস্ত বিশ্ব যেন একটি ছোট মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

মানুষে মানুষে এই ঘনিষ্ঠতা এক দিক দিয়ে যেমন কল্যাণকর হয়েছে অন্যদিক দিয়ে তেমনি জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত বাধবার সম্ভাবনা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-হিংসা-লোভ মিলনের পথকে কণ্টকিত করে তুলছে। কবির ভাষায় বলতে পারি—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব

এই হিংসা দ্বন্দ্ব কলহ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠতে উঠতে সময় সময় এমন মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হয় যে সমগ্র মানব-সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা ঘটে। ক্ষমতার দম্ভ এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যার ফলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র আজ সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আশঙ্কায় কম্পিত। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দু দুটো মহাসমর পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে চলে গেল, মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে গেল কতশত বৎসরের সভ্যতার উপাদান, পুড়ে গেল কোটি কোটি মানুষের সুখের নীড়।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষত ভাল করে না শুকাতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের করাল দংষ্ট্রার আভাস দেখা যাচ্ছে। মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় সমগ্র বিশ্ব যেন মেতে উঠেছে। বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে নিত্য নূতন মারণাস্ত্র

জন্মলাভ করছে—এ্যাটোম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। ভয়ার্ত পৃথিবী আজ সর্বনাশা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

যুদ্ধের এই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীগণ বার বার চেষ্টা করেছেন পৃথিবী থেকে চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে—কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গড়ে উঠেছিল "জাতিসঙ্ঘ" বা "লিগ অব নেশনস্" (League of Nations)। আপোষ আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সংঘ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কোন জাতিই জাতিসঙ্ঘের নির্দেশ মেনে চলছে না—কারণ কোন জাতির মন থেকেই তখনও যুদ্ধের লালসা তিরোহিত হয়নি। তাই উপরে উপরে যুদ্ধ বিরতির ভান করে তলায় তলায় চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি।—এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তৃতীয় মহাযুদ্ধ—আরো ভয়াবহ, আরো সর্বনাশা। তারপর যুদ্ধক্লান্ত দেশের মনে আবার জাগল শ্মশান বৈরাগ্য। গড়ে উঠল সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ (United Nation Organisation)। কিন্তু তারো ভাগ্য প্রায় লিগ অব নেসনস্'এর মতই দেখা যাচ্ছে। বার বার যুদ্ধ নিবৃত্তির সঙ্ঘ গড়ে, প্রচার পরিকল্পনা চলে, কিন্তু যুদ্ধের নিবৃত্তি আর ঘটে না।

কেন এমন হয়? পৃথিবীর স্থির বুদ্ধি মানবপ্রেমিক মনীষীবৃন্দ ভেবে দেখলেন বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ না করে শুধু বর্ধিত বৃক্ষের শাখা পল্লব ছেদন করে তার বিষক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। মানুষের মনের মধ্যে থেকে যুদ্ধের ইচ্ছাকেই দূর করতে হবে সর্বাগ্রে। তা যদি পারা যায় তবেই পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারবে, নচেৎ নয়। হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে ভালবাসা প্রীতি সহনশীলতা প্রভৃতি গুণের অনুশীলন যদি শিশুকাল থেকেই করা যায় তবেই যদি কোনদিন পৃথিবী থেকে যুদ্ধভীতি দূর হয়। মানুষের মনের মধ্যে যে পশু প্রবৃত্তি আছে তাকে শৃঙ্খলিত নির্যাতিত করে তার পরিবর্তে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এই কার্যটি একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই করা সম্ভব, এবং বিদ্যালয় থেকেই এর সূচনা হবে। সুতরাং বর্তমান যুগের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে **সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভাব অনুশীলন করা।—**

এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে প্রথমেই শিক্ষার্থীর জীবন-দর্শন ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের দেশ কোন দিনই পার্থিব ভোগসুখকে

বড় করে দেখেনি, ত্যাগের মধ্যে ভোগের আনন্দ অনুভব করে বলেছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জিথ"। ভারতের সেই সনাতন বাণীর সার্থক অনুশীলনের মধ্যেই আজ জগতের মুক্তি।

দ্বিতীয়তঃ, পরমত সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। সমাজের মধ্যে চলতে গেলেই অনেক সময় মতান্তর ও মনান্তর ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ধীর-ভাবে সহ্য করে গেলে বা শান্তভাবে যুক্তি পরিচালিত হয়ে চললে হয়ত সহজেই সংঘর্ষ এড়ানো যায়। এর জন্য চাই স্বার্থশূন্য স্বচ্ছ সহানুভূতিশীল দৃষ্টি।

বিদ্যালয়ের কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি ভালভাবে চালানো যায় তাহলে শিক্ষার্থীর মনে এইসব সামাজিক বৃত্তিগুলি সহজেই বিকাশ লাভ করতে পারে।

তাছাড়া শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে হলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করে চলা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রাতি বোধ জাগ্রত করবার উপায়—

প্রথমতঃ, অন্যদেশ, রাষ্ট্র ধর্ম বা অধিবাসী সম্বন্ধে কোন প্রকার তুচ্ছতার ভাব যেন মনে না আসে, এবং এইসব সম্বন্ধে নিন্দাসূচক বা গ্লানিকর কোন কিছু রচনা যেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে না থাকে। প্রত্যেকটি দেশের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে ছেলেদের মনে। এমন কি, কোন ঐতিহাসিক সত্যও যদি এই সম্প্রাতি রক্ষার পরিপন্থী হয় তবে তাও আলোচনা করা চলবে না। Unesco তত্ত্বাবধানে তাই এই জাতীয় অনেক বই আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে। তার ফলে আমাদের শিশুরা বিভিন্ন দেশের সম্প্রীতিমূলক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশের সাহিত্য শিল্প ললিত-কলার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় থাকা দরকার। কারণ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেশে দেশে মানুষ যেমন বিদ্বেষের ক্ষুদ্রতায় বিচ্ছিন্ন, জ্ঞানের ও সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্রে তেমনি তারা মনুষ্যত্বের আত্মীয়তায় আবদ্ধ। তাই বিভিন্ন দেশের শিল্প ও ললিতকলার প্রদর্শনী ঘন ঘন হওয়া দরকার। এবং সেই সব প্রদর্শনীতে ছাত্রেরা যাতে যেতে পারে দেখতে পারে, শিখতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

তৃতীয়তঃ, সংবাদপত্রগুলিতে জাতি বিদ্বেষের হলাহল ছড়ানোর পরিবর্তে যেন সম্প্রীতির অমিয় বাণী প্রচার করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ছাত্রদের এই জাতীয় সংবাদপত্র পাঠে উৎসাহিত করতে হবে।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি মিশন, সাংস্কৃতিক মিশন বিনিময় করা ভাল। তার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখময় জীবনা কাহিনীর নাট্যরূপ ও চলচ্চিত্র দেখান ভাল। পৃথিবীর সকল মেহনতী মানুষই যে একই দুঃখ বেদনাময় স্তরে আছে সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মানুষ যেন অবহিত থাকে।

ষষ্ঠতঃ, জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম মৃত্যু তারিখ, পৃথিবীর কোন কোন উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় তারিখ অথবা Unesco কর্তৃক নির্দিষ্ট মিলন প্রচেষ্টাসূচক কোন কোন উৎসবের তারিখ বিদ্যালয়ে ভালভাবে উদ্‌যাপিত হলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ভাবটা অনেকখানি দূর হয়ে যাবে।

সপ্তমতঃ, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথাসাধ্য অন্যান্য দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পঠন পাঠন ও আলোচনা করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে প্রত্যেকটি দেশে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হতে পারে।

অষ্টমতঃ, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিনিময় করলে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বন্ধন নিবিড় হয়।

মোটকথা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত বেশী ভাবের আদান প্রদান ঘটবে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ ঘটবে ততই আমরা অনুভব করব বিরোধের মধ্যে মিলনের মাহাত্ম্য শত্রুতার মধ্যে বন্ধুত্বের প্রীতি। শিশুকাল থেকে শিক্ষার মাধ্যমে এই গুণাবলীর অনুশীলন ভালভাবে করতে পারলে তবেই ভাবী নাগরিকবৃন্দের মন থেকে উৎপাটিত হবে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ। উদ্ভূত হবে আন্তর্জাতিকতার উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাদ—

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্নযুগে এবং বিভিন্ন দেশে যত প্রকার মতের উদ্ভব ঘটেছে সংক্ষেপে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হল। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে কিন্তু দেখা যাবে শিক্ষাকে মোটামুটিভাবে দুটো বিপরীত দিক থেকে দেখা হয়েছে।

এক, **শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে** এবং অপর, **সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে।**

এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে আছে দুই বিপরীতমুখী দর্শনের দ্বন্দ্ব —মানুষের জন্য সমাজ, না সমাজের জন্য মানুষ। এবং এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি হল, শিক্ষাকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে হবে, না সমাজতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে—এই জাতীয় বিপরীতধর্মী মতের দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বটি পরে ভালভাবে আলোচনা করে দেখা যাবে। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত প্রাচীনতম। সমাজবোধ জাগ্রত হবার আগে থেকেই ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়েছে তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী অগ্রগণ্য। **ভারতবর্ষে** আশ্রমিক-শিক্ষা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রচিত।

শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ—

শিক্ষার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের মূলকথা হল, জাতিগত হিসাবে মানুষে মানুষে যত মিলই থাক, ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষ অনন্যসাধারণ। প্রত্যেকেরই রুচি রীতি বুদ্ধি সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাবিদেরা এর নাম দিয়েছেন সুষমবিকাশ (Harmonious development)। রাষ্ট্রের বা সমাজের কাজ হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করে তোলা। এঁদের মতে রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রধান কর্তব্য। একান্ত বহিরঙ্গ দিকটাতেই মাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, তা নইলে প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, এবং জনারণ্যে সে একক। কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে প্রত্যেকটি মানুষ, সেই গুণগুলিকে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of individual potentialities).

তাছাড়া শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ আদর্শবাদী জীবনদর্শন থেকে উদ্ভূত মনে করা যেতে পারে। এই দর্শনে মনে করা হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষ একটি আদর্শ নিয়ে, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই আদর্শকে লাভ করা এবং উদ্দেশ্যকে সফল করাই হল সেই জীবনের চরম সার্থকতা। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই মানুষের সেই নির্ধারিত জীবনপথ

থেকে সরিয়ে এনে অন্যপথে পরিচালিত করার। কারণ তাঁদের মতে শিক্ষা হচ্ছে আত্মোপলব্ধিরই (Self realisation) নামান্তর।

আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ জনলক্ বা রুশো উভয়েই বলেছেন মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র গঠন করেছে নিজের সুবিধার জন্য, আত্মবিকাশের সুযোগ লাভের জন্য। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের চাহিদা মিটানর জন্যই সব সময়ে প্রস্তুত থাকবে, সমাজের চাহিদার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব যেন কখনই সঙ্কুচিত না হয়ে পড়ে।

শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদ :—

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন এর বিপরীত কথা। তাঁদের মতে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ফল হল সমাজ। একক অসহায় মানুষ যখন শিখল দল গড়তে সমাজ গড়তে, তখন থেকেই হল সভ্যতার অগ্রগতি—সুতরাং সমাজের দাবী হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির দাবী। সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক মানুষ বহুদিন পূর্বেই সমাজের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সমাজের মধ্যেই মানুষকে আজ বেঁচে থাকতে হবে। তাই সমাজের দাবী হল মানুষের বাঁচার দাবী—একে অস্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই আজ অস্বীকার করতে হয়।

সুতরাং আজকের সামাজিক মানুষের শিক্ষা আজ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ বাঁচে, সমাজের চাহিদা পুরণ হয়। আমরা আমাদের অনেকখানি চিন্তার কর্মের এবং আচার আচরণের স্বাধীনতা খর্ব করে তবেই সমাজ গড়তে পেরেছি। প্রত্যেকেই যদি যথেচ্ছ আচার ব্যবহার করে চলেন তাহলে সমাজ বন্ধন টেকে না, সভ্যতার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষকে ফিরে যেতে হয় আবার সেই একক বন্য অবস্থায়। সুতরাং শিক্ষা-প্রণালী যদি সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচি ও আচার আচরণের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় তাহলে হবে মানব-সভ্যতার ঘোরতর দুর্দিন। তাছাড়া ব্যষ্টিকে নিয়েই ত সমষ্টি, মানুষকে নিয়েই ত সমাজ। সমাজের কল্যাণ হলেই অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ হবে। দুই এক জনের যদি ক্ষতি হয় বৃহত্তর মানবের কল্যাণের জন্য তা স্বীকার করে নিতেই হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুতরাং লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—সমাজের রাষ্ট্রের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্যই নেই।

কোন কোন দার্শনিক আবার আরো এগিয়ে গিয়ে বলেন সমাজ শুধু ব্যষ্টির সমষ্টিই নয়, তার স্বতন্ত্র প্রাণ আছে, অস্তিত্ব আছে, চাহিদা আছে। বিশাল সমাজদেহে প্রত্যেকটি মানুষ তার একএকটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র, তার বেশী নয়। দেহের উপকার হলে দেহাংশগুলিরও যে উপকার হবে তা বলাই বাহুল্য।

কেউ কেউ বলেন যে পরিবেশে অর্থাৎ যে সমাজে যে রাষ্ট্রে সে আবির্ভূত হয়েছে সেই বিশাল সমাজ-সৌধ বা রাষ্ট্র-সৌধ গঠনে সে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক মাত্র। মিস্ত্রীরা যেমন বাড়ী গড়তে গিয়ে বাড়ীর পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন ইটকে বিভিন্নভাবে ভেঙ্গেচুরে বসায় তেমনি রাষ্ট্র বা সমাজের স্বার্থের খাতিরে স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলীন করে দিতে হবে।

এই মত বড় কম প্রাচীন নয়। স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ যেদিন থেকে নিজের স্বার্থে একত্রিত হতে শিখেছে সেই দিন থেকেই সে এই একত্রিভূত সংস্থার মাহাত্ম্য অনুভব করতে শিখেছে, ব্যষ্টির স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থে উৎসর্গ করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছি পুরাতন স্পার্টানদের। দুর্বল শিশুর সেখানে বাঁচবারই অধিকার ছিল না, কারণ কৌম সংঘর্ষের দিনে সে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারত না। তাই সেদিনকার স্পার্টান শিক্ষার লক্ষ্য ছিল কঠিন দেহে কঠিন মন গড়ে তোলা (Hardy mind in hardy body)। এথেন্সবাসীদের মধ্যে এই কৌম সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকায় তারা বলতে পেরেছিল সুন্দর দেহে সুন্দর মন—(Beautiful mind in a beautiful body) এর বিপরীতক্রমে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত।

সুতরাং এখন সমস্যা দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাচনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায়? কিন্তু সত্যই মানুষ কি তার গঠিত সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়? মানুষ কি কখন নিজেকে ভাবতে পারে আর সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে? পার্শি নান্ সাহেবের ভাষায় বলা যেতে পারে মানব শিশু যখন পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করে তখন সমাজ যেমন তার দেহে বস্ত্র পরিয়ে দেয় তেমনি অন্তরও ভরে দেয় ভাবসম্পদে। শিশু পৃথিবীতে এসেই পৃথিবীকে যেভাবে পায় সে ত তার একক পৃথিবী নয়। সমগ্র মানবসমাজ যেমন কত যুগ ধরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে তার জন্যে শত সহস্র সভ্যতার উপকরণ সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। সুতরাং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে ত ভাবাই যায় না।

—তাহলে এখন প্রশ্ন, মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে? সমাজের দাবী এবং সমাজের প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত পথ অনুবর্তন করে সে সমাজের ঋণ শোধ করবে, না—নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিশিষ্ট পথটাই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য?

এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক নান্ সাহেব ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখিয়েছেন যুগে যুগে এর উত্তর মিলেছে কত বিচিত্র ধরনে। হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রের জয়গান যেমন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে তেমন আর কারো নয়। রাষ্ট্র সেখানে একটা জনসংঘ মাত্র নয়, তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তারি স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্যষ্টির জীবন (Every man exists for the State)। এই ধরনের ষ্টেটের জয়গান স্বৈরশাসিত রাষ্ট্রে আমরা আজও শুনতে পাই। নাৎসি জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে গড়ে উঠেছে ষ্টেটের সর্বময়তা। প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তা সেখানে একমুখী করে তোলা হয়েছে—My Country, right or wrong, 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' এই উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র মদিরা পরিবেশন করেছে সেখানকার শিক্ষাকেন্দ্রগুলি।

এই বিপরীত মতের প্রতিধ্বনি মিলবে কাণ্টের দর্শনে, এবং রুশোর চিন্তায়। ব্যক্তিকল্যাণে রুশো তীব্র ভাষায় সমাজকে বর্জন করবার নির্দেশ দিয়েছেন—[Whatever comes from the hand of the author of Nature is good, and everything gets defiled in contact with man.]

এই জাতীয় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐতিহাসিক কারণও আবিষ্কার করেছেন পার্শি নান্ সাহেব। ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের চাপে যখনই সমষ্টির জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে তখনই রাষ্ট্রের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব ইয়োরোপে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হল হেগেলীয় দর্শনের সমষ্টির জয়গান। আবার সমষ্টির উচ্ছৃঙ্খলতা যখন ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখনই কাণ্টের superman বা অতিমানবের আবাহনসঙ্গীত শোনা গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে মানুষ তার আত্মবিকাশের সঞ্জীবন মন্ত্র অনুসন্ধান করেছে কখন ব্যষ্টির মধ্যে, কখন সমষ্টির মধ্যে। পার্শি নান্ সাহেব দুটি দিকই ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মত দুটি

আদৌ বিপরীতধর্মী নয়, বরং একটা অপরের পরিপূরক বলে ধরা যেতে পারে।

উভয়মতের সমন্বয় ঃ—

সমাজের প্রভাব যেমন মানুষের উপর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, আবার মানুষের দ্বারাও ত সমাজ প্রভাবান্বিত, সমাজ আছে বলেই ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য—[Man is never individual when alone—Chesterton] এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর করে বলেছেন—

"একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক ; কেননা একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে, সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড় সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি—" অর্থাৎ বহুযুগের বহুমানবের অসংখ্য রেখার স্পর্শে মানুষের ব্যক্তিরূপের ছবিখানি ফুটে ওঠে সমাজের পট-ভূমির উপরে। সহজ করে বলতে পারা যায়—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করে তোলার সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে দেয় সমাজ তার নিজেরই কল্যাণে এবং সমাজের সমগ্র সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বড় হয়ে উঠবে ব্যক্তি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মহত্ত্বের মধ্যে দিয়েই সমাজ হবে মহত্তর। যে সমাজে মহিয়ান মানুষের সংখ্যা অধিক, যে সমাজের মানুষ তার নিজস্ব মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিচ্ছে, তার গরিমা কি সে সমাজ পাবে না? সে সমাজ কি সভ্যতার পথে আরো এগিয়ে গেল না? পৃথিবীর যাঁরা নমস্য—সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রদীপগুলির তেল সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছেন এবং তার পরিবর্তে বহুগুণিত করে তাঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন সে ঋণ, তার দীপ্তি দিয়ে ঔজ্জ্বল্য দিয়ে।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষার লক্ষ্য কোন একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিহিত নেই। ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দিয়ে সমাজের দাবী পূরণই শিক্ষার লক্ষ্য নয়, আবার সমাজকে অস্বীকার করে পলায়নী মনোবৃত্তির সাধনাও শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে সমাজের এবং সমাজের কল্যাণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ যাতে সুন্দরভাবে হয়, সার্থকভাবে হয় তাই হল বর্তমান যুগের শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার লক্ষ্য—পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন

বর্তমান শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আরো একটা নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছেন—সে হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন। (adjustment to the environment)।

জীবন মানেই হল পরিপার্শ্বের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন। একদিকে জীবনীশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের প্রচেষ্টা, অপর দিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির অন্ধ-লীলাবৈচিত্র্য, এই দ্বন্দ্ব চলেছে সৃষ্টির আদি যুগে থেকে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত বিশালকায় জীবের কঙ্কাল দিয়ে লেখা রয়েছে এই দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর কাহিনী। প্রকৃতির সঙ্গে যারা নিজেদের অভিযোজন করে নিতে পারেনি প্রকৃতি তাদের ক্ষমা করেনি, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে। যারা পেরেছে তারাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ টিকে আছে।—শুধু টিকে আছে তাই নয় সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে প্রকৃতির ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে।

সুতরাং জীবনের মূলধর্মই হল স্থিতিস্থাপকতা এবং বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে মিলিয়ে নেবার, অর্থাৎ অভিযোজন করবার ক্ষমতা। নানা বিরুদ্ধ শক্তির মধ্য দিয়ে কঠিন জড়প্রকৃতির পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে জীবলীলা। এবং এই জীবলীলা তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে নিরন্তর অভিযোজন করে চলেছে তার সর্ববিধ পরিপার্শ্বের সঙ্গে।

মানুষকে কেন্দ্র করে যে পরিপার্শ্ব গড়ে ওঠে তাকে আমরা মোটামুটি তিনটে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি—

প্রথম, নৈসর্গিক পরিবেশ, দ্বিতীয়, সামাজিক পরিবেশ এবং তৃতীয়, আন্তর পরিবেশ।

নৈসর্গিক পরিবেশ

নৈসর্গিক পরিবেশ তার জড় প্রকৃতি নিয়ে চিরচঞ্চল প্রাণশক্তিকে আবৃত করে রেখেছে। প্রাণশক্তিও প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর নিজেকে অভিযোজিত করে চলেছে—শুধু অভিযোজিত করেই সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, অন্ধ প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টাও করেছে। এই উদ্ঘাটনের কাজে যেখানে যেটুকু সে সফল হয়েছে সেইখানেই সে প্রকৃতির শক্তিকে সঙ্কুচিত করে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এইখানেই মানুষের সঙ্গে অপর প্রাণীর পার্থক্য। মানুষ ও প্রকৃতির এই শক্তির দ্বন্দ্বে মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রকৃতির নিষেধ অমান্য করে, প্রকৃতিকে জয় করে।

সামাজিক পরিবেশ

এমনিভাবে অভিযোজন চলেছে সামাজিক ক্ষেত্রেও। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের প্রভাব তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সঙ্কুচিত করে দিতে চায়, আর মানুষ তার প্রভাব দিয়ে সমাজশক্তিকে নিজের মত করে ভেঙ্গে গড়ে নিতে চায়—সকলেই পারে না, যারা পারে তারা অপরের জন্য পথ তৈরী করে দিয়ে যায়। আজকের দিনের সমাজ-ব্যবস্থা জটিল—রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক অর্থনৈতিক নানা সমস্যা আজ মানুষকে টানছে বিভিন্ন দিকে। স্বার্থের সংঘাত আদর্শের সংঘাত আজ মানুষের অগ্রগতির পথকে পদে পদে ব্যাহত করছে। ভাবজগতেও বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, মানুষকে করে দিচ্ছে দিশাহারা। গতানুগতিকতার বাঁধা পথে চলতে গেলে আজকের দিনের সামাজিক পরিবেশের সার্থকভাবে অভিযোজন করা সম্ভব হবে না। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সঙ্কুচিত করে মানুষের অধিকার যেমন বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে মানুষের কর্মক্ষেত্র, মানুষের চিন্তাক্ষেত্র।

প্রাকৃতিক জগৎ ছোট হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভাবজগৎ আজ বৃহত্তর হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করে চলেছে। এই বৃহত্তর ভাবজগতের সাথেও আজ আমাদের মিলিয়ে নেবার সাধনা। আজকের দিনের শিক্ষার আদর্শে যদি এই বহুবিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ইঙ্গিত না থাকে তবে তা কোন কাজেই আসবে না মানুষের। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাহাত্ম্যে দেশ ও কালের গণ্ডী পড়ছে ভেঙ্গে। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবী আজ যে দাবী নিয়ে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে উপনীত, তার উত্তর চাই আজকের দিনের শিক্ষার মধ্যে।

শিশু বড় হয়, নানা ভাব-সংঘাত, নানা জীবনাদর্শের সংঘাত তাকে বিচলিত করে দেয়। আজকের দিনের শিক্ষায় যদি তার এই দৈনন্দিন দ্বন্দ্বের কোন সমাধান না থাকে তবে সে শিক্ষা হবে তার কাছে অর্থহীন এবং জীবন থেকে বিচ্যুত।

আন্তর পরিবেশ

আর একদিকের অভিযোজন আন্তরজগতে অর্থাৎ মানুষের নিজের মনের সকল বিরোধের সার্থক সমন্বয়। কথাটা শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু সকল অভিযোজনের বড় কথাই হল নিজের অন্তরের মধ্যে ভাবজগতের অভিযোজন এবং এই হল সকল শিক্ষার গোড়ার কথা—

প্রত্যেকের মনে রয়েছে কত বিরোধ, কত বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত। এই বিরোধ মানুষের প্রচেষ্টাকে একমুখী হতে দেয় না। দ্বিধা সংকোচের ভাব তাকে কোন কিছুই ভাল করে গ্রহণ করতে দেয় না। যুগসঞ্চিত সংস্কারের শৃঙ্খল পায়ে বেঁধে মানুষ যখন সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চায় তখন দোটানায় পড়ে গতানুগতিকতার বৃত্তপথ অনুবর্তন করেই তাকে ঘুরতে বাধ্য হতে হয়।

এই দুর্ঘটনা থেকে তাকে বাঁচাতে হলে তার আভ্যন্তরীন বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া শিক্ষার আর কোন আদর্শই তাকে আত্মবিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এমনিভাবে জড় প্রকৃতির সাথে, সমাজ চেতনার এবং সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্বের সাথে সার্থকভাবে অভিযোজন করে চলতে চলতে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সভ্যতার জটিল পথ অনুসরণ করে। এই অভিযোজনের কাজ দ্বিমুখী। একদিকে পরিপার্শ্ব অনুযায়ী মানুষ তার ব্যবহারকে, চিন্তাকে এবং ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আবার অন্যদিকে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী পরিপার্শ্বকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সংস্কৃতি। শিক্ষার এই অভিযোজনমূলক লক্ষ্যই দেবে এই ভাবে এগিয়ে যাবার শক্তি।

———

শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারা

(Modern Trends in Education)

শিক্ষার প্রাচীন ভাবধারা—

আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—

"...ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে বুঝি একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।—"

—এটা শুধু আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির কথাই নয়। পৃথিবীর সব দেশেই এককালে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা হত। শিক্ষা দেওয়া মানেই হল, শিশুর মনে কতকগুলো জ্ঞানের কথা পুরে দেওয়া। সুতরাং শিক্ষার কাজে একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হল শিক্ষকের পাণ্ডিত্য। শিক্ষক যতবেশী পাণ্ডিত্যের আধার হবেন, ততই তিনি যোগ্য শিক্ষক বলে পরিগণিত হবেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যার সাগর শিক্ষক বিদ্যা বিতরণ করে চলবেন আর অসহায় ছোট শিশুরা তাদের সাধ্যমত সেই সাগর থেকে এক-আধ গণ্ডুষ বিদ্যার অঞ্জলি পুরে ঘরে নিয়ে যাবে।

শিক্ষাবিতরণের এই পদ্ধতিটিকে কোন কোন শিক্ষাবিদ সমালোচক 'ছোট-পাত্র-বড়পাত্র তত্ত্ব' (Jug-mug theory) বলে রহস্য করেছেন। শিক্ষা দেওয়া মানে হল, পূর্ণ বড়পাত্র থেকে যেন শূন্যগর্ভ ছোট ছোট পাত্রে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া। পাত্র যদি কারো ছিদ্রযুক্ত হয় বা নিতান্ত ছোট হয় তাহলে ত তার ভাগ্যে এক ফোঁটা জলও ধরবে না। তা না ধরুক, বিদ্যা কি সকলের হয়? কেউ বা একে বলেন 'পাইপ লাইন তত্ত্ব' (Pipe-line theory)। বড় জলাধার থেকে নল লাগিয়ে যেমন ছোট পাত্রে জল ঢেলে দেওয়া, তেমনি শিক্ষকের পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ছেলেদের শূন্য মনে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া। কেউ বলেন—

'কুম্ভকার-মৃত্তিকা তত্ত্ব' (Clay-potter theory)। কুম্ভকার যেমন নরম কাদার তাল টিপেটুপে ইচ্ছামত নানারকম পুতুল তৈরী করে, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ইচ্ছামত ও ক্ষমতামত শিক্ষার টিপুনি দিয়ে মানুষ তৈরী করেন। এতে নির্জীব কাদার তালের কিই বা বলবার আছে?

শিক্ষায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী—

কিন্তু শিক্ষা মানে ত কতকগুলি জ্ঞানের কথা মুখস্থ করে রাখা নয়—শিক্ষার অর্থ আরো ব্যাপক, আরো গভীর। শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হিসাবে দেখলে কেবল মাত্র পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের ব্যর্থতা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বস্তু—শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থী অচ্ছেদ্য-ভাবেই সংযুক্ত।

এই তিনটির মধ্যে শিক্ষক আর শিক্ষণীয় বিষয় এই দুইটিই এককালে ছিল প্রধান লক্ষণীয়, শিক্ষার্থীর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল না। সে ছিল একেবারে—'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে'—অবহেলিত উপেক্ষিত। কে শেখাবেন এবং কি শেখাবেন—এই হল বড় কথা ; কে শিখবে সে কথা ত বাহুল্য।

শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা—

শিশুর কোন স্বাধীন সত্তাই কারো চোখে পড়েনি। তাই তাদের শিক্ষার পদ্ধতিটাও ছিল একেবারে বয়স্কদের শিক্ষারই অনুরূপ। ছোটদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবেচনা ছিল না, তাদের দেখা হত বড়দেরি ছোট সংস্করণ হিসাবে। তাই মন্‌রো বলেছেন "টেলিস্কোপের উল্টো দিক দিয়ে দেখলে বড়দের যেমন দেখায় সেকালে আমরা তেমনি দৃষ্টি দিয়েই দেখতাম শিশুদের।"

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদান—

এই গতানুগতিক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল ১৮ শতকের বিখ্যাত চিন্তানায়ক জিন জ্যাকুইস রুশোর কণ্ঠে।

অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্য যে রুশোই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তা নয়। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশ, প্লেটো থেকে সুরু করে কমেনিয়াস, লক প্রমুখ শিক্ষাবিদেরাও নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু রুশোই প্রথমে সার্থকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর প্রাধান্য ঘোষণা করলেন। তাঁর বিখ্যাত 'এমিল' গ্রন্থে শিশু-

শিক্ষার মূল তত্ত্ব প্রচার করলেন—শিক্ষার জন্য শিশু নয়, শিশুর জন্যই শিক্ষা। রুশোর এই তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিল। যে শিক্ষা এতকাল বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল সেই শিক্ষার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হল শিশু স্বয়ং, তাই এই শিক্ষার নূতন নামকরণ হল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Peido centric)। এই হল শিক্ষা-জগতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মূলকথা। রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদের উৎস থেকে শিক্ষার এই আধুনিক ভাবধারা উৎসারিত হল। তাই রুশো আধুনিক শিক্ষার জনক।

ফ্রেডেরিকা ম্যাকডোনাল্ড রুশোর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"রুশোর সবল অপ্রতিহত কণ্ঠ সমগ্র ইয়োরোপে মানুষের অধিকারের দাবী জানিয়েছিল, কিন্তু তার চেয়েও জোরে যা ধ্বনিত হয়েছিল, তা হল শিশুর অধিকারের কথা * * * পেস্তালজি ও ফ্রেবলেরও পূর্বে তিনি এক নূতন শিক্ষানীতি প্রচার করলেন এবং আধুনিক সভ্যজগত থেকে শিক্ষার নামে শিশু উৎপীড়নের অবসান ঘটালেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে শিশুর আনন্দময় প্রভাতকে এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছিল—"

শিশু-শিক্ষায় এই শিশু-কেন্দ্রিক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনে রুশোর নাম শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগেই বলেছি, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূলকথা হল, শিক্ষার কার্যে শিশুর কথাই মনে রাখতে হবে সর্বাগ্রে। শিশুর মন, শিশুর রুচি, শিশুর চিন্তা, বুদ্ধি সামর্থ্য এই সকল বিচার করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে।

রুশো বললেন—শিশুর প্রকৃতি অনুসারেই নির্ধারিত হবে শিক্ষার প্রণালী ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা—

রুশোর এই তত্ত্বটিকেই আরো স্পষ্টভাবে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করলেন রুশোর ভাবশিষ্য পেস্তালজি। শিশুর প্রকৃতি জানা মানেই হল শিশুর মনস্তত্ত্বকে জানা। তাই পেস্তালজি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটি শিশু-মনস্তত্ত্বর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—(I wish to psychologise education—Pestalozzi)।

শিক্ষার এই নূতন ভাবধারাটিকে সার জন য়্যাডাম ল্যাটিন ব্যাকরণের একটি সূত্রের উপমা দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"Verbs of teaching govern two accusatives. one of the person another of the thing : as Magister Latinam Johannem docuit—the master taught John Latin—"

"শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিখিয়েছেন—"

এই ল্যাটিন বাক্যটির কর্তা শিক্ষক, কিন্তু কর্ম জন ও ল্যাটিন। পুরানো পদ্ধতির শিক্ষার প্রাধান্য ছিল ল্যাটিন কর্মের, কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে প্রাধান্য জনের। (The old teachers laid most of the stress on Latin, the new lay it on John—John Adam). সুতরাং প্রাচীন কালের ল্যাটিন-জানা শিক্ষকের বর্তমানে কোন মুল্যই থাকবে না যদি তিনি জনকে ভাল করে না জানেন। আগেই বলেছি, জনকে জানা মানেই হল জনের মনস্তত্ব জানা। সুতরাং আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথাই হল মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা।

শিশুমন কি চায়, কোন দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কিসে তার আনন্দ বিষাদ, তার অনুরাগ বিরাগ, কতটুকু তার বুদ্ধি বিবেচনা সামর্থ্য—এ সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ দার্শনিকেরা যে সব সত্য উদ্ঘাটন করেছেন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রসঙ্গে সেগুল সব সময়েই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

শিশুকে কি শেখাতে হবে এবং কি করে শেখাতে হবে, এই দুটো সমস্যারই সমাধান করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক সত্য অনুসন্ধান করে।

রুশো শিক্ষার যে নূতন পথের দিশা দেখালেন, যে তত্ত্বের ইঙ্গিত দিলেন পরবর্তীকালে পেস্তালজি, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরি প্রমুখ শিক্ষাবিদবৃন্দ তাকে শ্রেণী-কক্ষের পাঠদান-প্রক্রিয়ার মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত করে তুললেন। হার্বার্ট পরে এইসব মনস্তত্ত্বমূলক শিক্ষা প্রক্রিয়াকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুললেন।

শিক্ষা বনাম পাণ্ডিত্য—

শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ভাবধারার আর একটি বড় কথা হল পাণ্ডিত্য (instruction) ও শিক্ষা (Education) এই দুটো শব্দের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করা। সেকালে শিক্ষা বলতে পাণ্ডিত্য অর্জন বা জ্ঞান সঞ্চয়নের পরিমাণ বোঝান হত। বহু-তথ্য-সমৃদ্ধ পণ্ডিত তৈরী করাই ছিল শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু সমস্ত জগতকে একমাত্র ছাপা-বই এর মধ্যে দিয়ে দেখা কখনই সত্য

দেখা নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে পুরোপুরি মানুষ করে তোলা, মানুষের চরিত্র গঠন করা এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে গড়ে তোলা। অর্থাৎ দৈহিক (physical) মানসিক (mental) ও আত্মিক (spiritual) এই তিন দিকেরই সুষম বিকাশসাধন করা—এই হল বর্তমান যুগের শিক্ষার সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া আমাদের স্বভাবের বিধান ছিল।" শিক্ষার আধুনিক ভাবধারায় এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে।

সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা—

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে সমাজ-কেন্দ্রিকতায়। আগেকার মতে শিক্ষালাভের অধিকার কেবল অভিজাত শ্রেণীর ভাগ্যবানদেরই ছিল। শিক্ষাকে প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকার করা হয়নি। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দি, ইয়োরোপেও রুশোর আমলে শিক্ষার যে সঙ্কীর্ণ পরিসর ছিল তা শুনলে অবাক হতে হয়।

—সে কালে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, চাল-চলন কথাবার্তা শেখা, নাচ-গানের মাষ্টারের কাছে নাচ-গান শেখা—যাতে তারা বড় হয়ে 'বনেদী ঘরের' চাল রক্ষা করে চলতে শেখে—(Ancient Regime.—Taine).

আধুনিক শিক্ষায় এইসব সঙ্কীর্ণতা ঘুচাবার চেষ্টা চলেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও আবেগের মূল্য---

আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (Instinct) আর আবেগের (Emotion) কোন মর্যাদাই ছিল না। বাইরের থেকে জ্ঞানের বোঝা শিশুর চিত্তের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে, তার ভাললাগা মন্দলাগা, পছন্দ অপছন্দের কোন কথাই নেই।

অথচ বর্তমানের শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক আবেগ ও প্রবৃত্তি-মর্যাদা সমধিক, এই প্রবৃত্তি আর আবেগকে ত বাইরে থেকে জোর করে চাপা দেওয়া যায় না; সে তার প্রকাশের পথ আবিষ্কার করে নেবেই। স্বাভাবিক পথ যদি না পায় তবে অস্বাভাবিক সমাজবিরোধী পথেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে সৃষ্টি করবে

সমস্যামূলক দুর্মেধা বালক।—তাই আধুনিক শিক্ষার মূল কথাই হল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের সুষ্ঠু উদ্গতি।

বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি—

বুদ্ধিবৃত্তির (Intellect) চর্চাই ছিল এককালে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন সেইখানে হৃদয়-বৃত্তির (Emotion) চর্চারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু অনুশীলনের ফলেই মানুষ সার্থক সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। সুতরাং আজকের দিনে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন অনুষ্ঠানাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীর সামাজিক বৃত্তির সহায়ক হৃদয়াবেগের অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি—

শিক্ষাদান-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আধুনিক ভাবধারা একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে।

পদ্ধতি বলতে আগে আমরা জানতাম পাঠ্যপুস্তকের শুষ্ক পত্রগুলি বেত্র সাহায্যে ভীত সন্ত্রস্ত শিশুকণ্ঠে জোর করে পুরে দেওয়া—কটূক্তির মসলা ছাড়া তাতে আর কিছু বড় একটা থাকত না।

কিন্তু বর্তমান শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি শিশুর রুচি সামর্থ্য বুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রবণতা বিচার করে শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হয় বলে নানা প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর (individualistic) পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডালটন পরিকল্পনা, উইনেটকা পরিকল্পনা, ডেক্রলি পদ্ধতি বাটাভিয়া পদ্ধতি, ইত্যাদি সর্বপ্রকার পদ্ধতির মূল কথাই হল শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের মর্যাদা স্বীকার।

শিশু ভালবাসে খেলা করতে, তাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া-প্রীতিই শিক্ষা-দানের কাজে লাগান হয়েছে মন্তেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে।

শিশুরা শ্রেণীকক্ষে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকতে চায় না, অপরের হুকুমে চলাফেরা করেও তাদের তৃপ্তি নেই, তারা নিজেদের হাতে সব কিছু করতে চায়। অসীম কৌতূহল শিশুদের। তারা সব কিছু নেড়ে চেড়ে দেখতে চায় বুঝতে চায়---তাই শিক্ষায় নূতন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method) ওয়ার্দ্ধা পদ্ধতি।

এইভাবে শিক্ষা হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর নির্ভরশীল, অথচ শিক্ষার্থীর

সামাজিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। নান্ সাহেবের ভাষায় বলা যায়—শিক্ষাকে ব্যক্তিতা ও শিক্ষার্থীকে সামাজিকতার উপর স্থাপন করতে হয়। (to individualise education but socialise the pupil—Nunn).

আধুনিক শিক্ষালয়—

আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষালয়েরও বহু পরিবর্তন ঘটেচে। পুরানো দিনের শিক্ষালয়কে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন—'কলে-ছাঁটা বিদ্যা উৎপাদনের কারখানা', বেত্ররাজ-অধিরাজিত পুস্তকভার-জর্জরিত নিষ্করুণ কারাগৃহ।'. কিন্তু বর্তমান দৃষ্টিতে শিক্ষালয়ের নূতন নামকরণ হল শিশুর বাগান (Kindergarten) অথবা শিশুভবন (Cosa-de-Bambini)।

গৃহ আর বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান গিয়েছে ঘুচে। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম আবহাওয়ায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে একান্ত পুঁথিগত অবাস্তব বিমূর্ত শিক্ষাধারার পরিবর্তে বর্তমানে আনন্দময় পরিবেশে শিশুমনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতিতে জীবনধর্মী বাস্তব শিক্ষার প্রবর্তন করার চেষ্টা চলেছে সব দেশে।

আমাদের দেশেও আজ এই নূতন শিক্ষার অরুণোদয় লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানাদিক দিয়া আঘাত করিতেছে—জ্ঞান সামগ্রীর সীমা, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল এমন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে, সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে, এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতি

(Project Method)

প্রজেক্ট পদ্ধতির অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকে এর নাম দিয়েছেন "কার্য-সমস্যা পদ্ধতি"। অবশ্য কার্য-সমস্যা পদ্ধতি—এই নামটির মধ্যেই এই পদ্ধতির কার্যপ্রণালীর ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি ছেলেরা স্বাভাবিক-ভাবেই সব জিনিস হাতে নাড়াচাড়া করে দেখেশুনে শিখতে চায়। কোনকিছু যদি সমস্যার আকারে তাদের সামনে আসে তবে তা সমাধান করতে গিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি জেগে উঠে, আগ্রহ উদ্দীপনা বর্ধিত হয়। তাই কোন শিক্ষার বস্তুকে সোজাসুজি গ্রন্থনিবদ্ধ অবস্থায় শিশুমনের দরজায় হাজির না করে সমস্যামূলক কাজের আকারে আনলে তা অধিকতর কার্যকরী হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরই কার্য-সমস্যা পদ্ধতি গঠিত হয়েছে।

যাই হোক ডাঃ ষ্টিভেনসন এই পদ্ধতির একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—'কোন একটি সমস্যামূলক কার্যকে তার স্বাভাবিক পটভূমিতে রেখে যদি সার্থকভাবে সমাধান করা যায়, তবেই তাকে কার্যসমস্যা পদ্ধতি বলতে পারি (problematic act carried to completion in its natural setting—Dr. Stevenson.)

এই পদ্ধতিটি পূর্বে শুধুমাত্র কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যই ব্যবহৃত হত। পদ্ধতিটির মূলকথা হচ্ছে—কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা, তবে সেই কাজটি হবে ছাত্রদের স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক ও সার্থক। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কোন একটি সমস্যামূলক কার্য ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং ছাত্রদের স্বচেষ্টায় তার সমাধান করতে হয়।

এই পদ্ধতির মধ্যে তিনটি সর্তের উল্লেখ দেখা যায়—প্রথমতঃ কার্যটি সমস্যামূলক হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, সেটি স্কুল ঘরে বসে খেলার ছলে করলে হবে না, তার জন্যে স্বাভাবিক পটভূমি চাই এবং তৃতীয়তঃ, কার্যটি শেষ পর্যন্ত সুসম্পন্ন হওয়া চাই।

১৯১৮ সালে সর্বাত্মক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন জন ডিউইর শিষ্য ডাঃ কিলপ্যাট্রিক। তিনি ষ্টিভেনসনের সংজ্ঞাটি পুরোপুরি

মানেন নি। তাঁর মতে সামাজিক পটভূমিতে কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ সর্বান্তঃকরণে করতে নামলে তবেই তাকে প্রজেক্ট পদ্ধতি বলা চলবে। (Whole hearted purposeful activity executed in a social environment)

প্রজেক্ট পদ্ধতির এই সংজ্ঞাটি পরে তিনি সংশোধন করে আরো সুস্পষ্ট করেন। তিনি বলেন প্রজেক্ট পদ্ধতি হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা অভিজ্ঞতা এবং সেই স্বতঃপ্রণোদিত উদ্দেশ্যই স্থির করবে কাজের লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রিত করবে কাজের পদ্ধতি এবং তার পিছনে থাকবে একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি।

ষ্টিভেনসনের সংজ্ঞার মধ্যে এই পদ্ধতির একটা বাস্তব পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু কিলপ্যাট্রিক এসে একে শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতির পর্যায়ে না রেখে একেবারে দার্শনিক তত্ত্বে তুলে দিয়েছেন এবং জোর দিয়েছেন উদ্দেশ্যের উপরে, পদ্ধতির উপরে নয়। তাই মনরো একে বলেছেন শিক্ষার দর্শনতত্ত্ব (Philosophy of education)। এই হিসাবে কিলপ্যাট্রিকের সংজ্ঞা ষ্টিভেনসনের সংজ্ঞা থেকে আরও ব্যাপক।

তবে কিলপ্যাট্রিক হচ্ছেন প্রয়োগবাদী জন ডিউইর শিষ্য। সেই দিক দিয়ে এই পদ্ধতি যদি শিক্ষাদানের কাজে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা না যায় তবে ত তার কোন মূল্যই নেই। তাই তিনি বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনার জন্য এই পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে গিয়ে একে চার ভাগে বিভক্ত করলেন।

(i) উৎপাদক পদ্ধতি (Producer's project)—কোন কিছু উৎপাদন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য এই উৎপাদন বলতে কেবল বস্তুই বোঝাবে না, চিন্তাও বোঝাবে।

(ii) ভোগ্য পদ্ধতি (Consumer's project)—কোন কিছু আনন্দের স্বাদগ্রহণ করাই যেখানে উদ্দেশ্য—যথা গান শোনা, বাজী পোড়ানো দেখা ইত্যাদি।

(iii) সমস্যা পদ্ধতি (Problem projcet)—কোন কিছু সমস্যামূলক কাজ নিজের ইচ্ছায় নিয়ে সমাধান করাই যেখানে উদ্দেশ্য।

(iv) বিশেষ দক্ষতা অর্জন পদ্ধতি (Skill project)—কোন বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই যেখানে উদ্দেশ্য।

কিলপ্যাট্রিক এই সকল পদ্ধতিকে আবার মোট দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন।

যথা—(ক] ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা (খ) সমবেত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ কতকগুলি কাজ সমবেত ভাবে কয়েকজন ছাত্র মিলেমিশে করতে পারে অথবা কতকগুলি কাজ কোন ছাত্র এককভাবেও করতে পারে। শুধু পদ্ধতিতে নয়, কার্য নির্ধারণেও প্রজেক্ট দু'জাতের হতে পারে। যথা—

(১) বুদ্ধিমূলক (২) কার্যমূলক

(১) বুদ্ধিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে হাতে-কলমে কোন কাজ করতে হয় না, শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে সেই কাজের বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। যেমন মনে করা যাক, নবম শ্রেণীর ছাত্রেরা আগ্রার তাজমহল দেখতে যাবার ইচ্ছা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে খরচপত্রের হিসাব, মানচিত্র নিয়ে যাবার পথ এবং পথে আর কি কি দ্রষ্টব্য আছে তার খোঁজখবর নেওয়া, রেলের টাইম টেবল দেখে রেলের সময় ঠিক করা, পথে কি জিনিস নিতে হবে, কোথায় ওঠা হবে তার ব্যবস্থা করা, হোটেলওয়ালা বা রেল কোম্পানীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা, তাজমহলের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজ করতে লেগে গেল, এবং তার ফলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নানাপ্রকারের জ্ঞান অর্জন করল।

অবশ্য ডঃ ষ্টিভেনসনের মতে এটাকে খাঁটি প্রজেক্ট বলা চলবে না। কারণ প্রজেক্টের মূল কথা স্বাভাবিক পরিবেশ (Natural setting) এবং কাজের সুসম্পাদন (Carried to completion) কোনটাই হল না এখানে।

(২) কার্যমূলক সমস্যা সমাধানে ছাত্রকে প্রকৃত কার্যটিই হাতে-কলমে করতে হয়। যেমন বাগান করা কার্য মনস্থ করলে কোথায় কোন গাছ লাগাতে হবে তার পরিকল্পনা তৈরী করা থেকে সুরু করে চারা বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করা, জমি তৈরী করা, সার সংগ্রহ, জল দেওয়া প্রভৃতি সব কাজই ছেলেদের করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী নানাপ্রকারের ছোট বড় কাজ নিয়ে বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে বসেই করা যায় এমন অনেক কাজ আছে। যথা, কাগজের কাঠির বা মাটির কোন কিছু তৈরী করা, কাগজ তৈরী করা, ভূ-গোলক তৈরী করা। তবে বিদ্যালয়ের সীমার মধ্যেই যে সব করা যাবে তার কোন মানে নেই। প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের সীমানা ছেড়ে বাইরেও ছাত্রদের নিয়ে যেতে হবে।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে—কাজটা যেন ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তারা নিজের ইচ্ছাতেই যে কাজ করতে চাইবে সেই হল আপন প্রচেষ্টার কাজ।

কিলপ্যাট্রিকের নির্দেশমত প্রজেক্টের সমস্ত কাজ আগাগোড়া ছেলেদেরই করতে হবে, এমন কি পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যন্ত। শিক্ষকের স্থান এখানে পরিচালকের, হিতৈষী বন্ধুর। উপকরণ হিসাবে একেবারে আসল জিনিসটাই (concrete) চাই, এবং পরিবেশও স্বাভাবিক ও সামাজিক হওয়া চাই। কোন রকম অনুকল্প চলবে না।

প্রজেক্টের যে কোন কাজকে চার অংশে বিভক্ত করা যায় যথা—(১) উদ্দেশ্য নির্ণয় (purposing), (২) পরিকল্পনা প্রণয়ন (planning), (৩) কার্য সম্পাদন (executing), এবং পরিশেষে কার্যের সমালোচনা (judging)। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই চারিটি স্তরের মধ্যে দিয়ে কাজ এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে কি কি জাতীয় কাজ করান যেতে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কিলপ্যাট্রিকের এক শিষ্য তাঁর এই প্রজেক্ট পদ্ধতিকে পাঁচটি শাখায় ভাগ করেছেন যথা—(১) আবিষ্কার (exploration), (২) নির্মাণ (construction), (৩) যোগাযোগ সাধন (communication), (৪) ক্রীড়া (play), এবং (৫) কলাশিল্প (skill)। বিভাগগুলির নামের মধ্যেই রয়েছে তার কার্যপদ্ধতি সুতরাং বেশী বলার দরকার নেই। ঐ সকল কার্যপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা বাইরেকার বিরাট বিশ্বের সম্বন্ধে কৌতূহলাক্রান্ত হলে তবেই এ পদ্ধতি সার্থকতা লাভ করবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে এজাতীয় প্রজেক্ট পরিচালনার যে বিশেষ অসুবিধা ঘটে এ ত বলাই বাহুল্য। বাস্তব পরিবেশ (environment) এবং বাস্তব পদার্থ (concrete things) বিদ্যালয়ে সব সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য এম. ই. ওয়েলস্ এর একটা সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে আসল বস্তুর পরিবর্তে নকল বস্তু দিয়ে ক্রীড়াচ্ছলেও (make-believe play) প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

যাই হোক, বহু শিক্ষাবিদ এই প্রজেক্ট পদ্ধতি নিয়ে বহুরকম আলোচনা করেছেন এবং এর বহু পরিবর্তনও করেছেন, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে (১) শিশুরাই কাজের ইউনিট স্থির করবে (২) শিশুরাই

তার পরিকল্পনা করবে (৩) শিশুরাই কাজ পুরাপুরি সম্পাদন করবে এবং (৪) শিশুরাই সেই কাজের সমালোচনা করে ভুলত্রুটি নির্ণয় করবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের অনেকগুলি **সুবিধা** আছে যথা—

(১) নানা কাজের মধ্যে দিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা হয় বলে শেখাটা ছাত্রের মনে বাস্তব রূপ নিয়ে সার্থক হয়।

(২) কার্যকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বিভিন্ন বিষয়জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়।

(৩) ছাত্রেরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার শেখে।

(৪) ছাত্রের সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৫) শ্রেণী-পাঠনার একঘেয়েমি ভাব নষ্ট হয়।

(৬) সমস্যার আকারে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সামনে উপস্থিত হয় বলে শিক্ষার জন্য ছাত্রেরা বিশেষ আগ্রহশীল হয়।

(৭) ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রজেক্ট পদ্ধতি বিদ্যালয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারেনি, কারণ এর অনেকগুলি **অসুবিধাও** আছে। তার মধ্যে প্রধান কথা এই পদ্ধতিতে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা যায় না। শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানের মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায় এবং শ্রেণী-কক্ষের বাঁধাধরা রুটিনের কাজ সব গোলমাল হয়ে যায়।

এই সব দিক বিবেচনা করে বর্তমানে প্রজেক্ট পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিয়মের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সকল ছাত্রকে নিয়ে একটা বৃহৎ প্রজেক্ট অবলম্বন করে সবরকমের শিক্ষা দেবার চেষ্টা না করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ছোট ছোট প্রজেক্ট পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এমন কি দৈনিক পঠনের মধ্যেও প্রজেক্ট পদ্ধতির তত্ত্বটি ব্যবহার করা যেতে পারে, ছাত্রদের কোন সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজে থেকে তার সমাধান করতে বলে।

পাঞ্জাব প্রদেশের মোগা নামক স্থানে মিশনারীগণ প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার এক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। সেখানে সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শ্রেণী-পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। সবরকম শিক্ষাই সেখানে নানা প্রকার কার্য সমস্যার আকারে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেক শিক্ষাবিদ মোগার এই কার্যপদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন।

ডাল্টন পরিকল্পনা

(Dalton Plan)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে ডাল্টন পরিকল্পনায়। মিস্ হেলেন পার্কহার্ষ্ট হচ্ছেন এই অভিনব পরিকল্পনার প্রবর্তক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাল্টন নামক স্থানে মিস পার্কহার্ষ্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এই নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তাই স্থানের নামানুসারে এই পরিকল্পনার নাম হয়েছে ডাল্টন পরিকল্পনা। বিকল্পে একে পার্কহার্ষ্ট পরিকল্পনা (Purkhurst Plan) বা প্রয়োগশালা পরিকল্পনাও (Laboratory Plan) বলা হয়।

ইস্কুল বলতে চিরাচরিত যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ডাল্টন প্ল্যানে তা একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এতদিন আমরা দেখে এসেছি পাঠগ্রহণেচ্ছু ছাত্রেরা নিজ নিজ শ্রেণী-কক্ষে সমবেত হয়ে বসে থাকে। ঘণ্টা বাজে আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক মহাশয়রা রুটিন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে পাঠদান করে বেড়ান। অর্থাৎ ছাত্রেরা বসে থাকে আর শিক্ষকেরা রুটিন অনুসারে ঘুরে বেড়ান। ডাল্টন প্ল্যানে এটা একেবারে উল্টে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শ্রেণী-কক্ষ নেই, রুটিন নেই, ঘণ্টাও নেই।

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। কক্ষগুলিও সাধারণ শ্রেণী-কক্ষের মত বিশেষত্বহীন নয়। বিভিন্ন বিষয়ের কক্ষগুলি বিষয় অনুযায়ী ছবি, চার্ট, ম্যাপ, মডেল, গ্রন্থ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ায় প্রত্যেকটি কক্ষে পঠনোপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়েছে।

ছাত্রেরা তাদের নিজ নিজ রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে কোন বিষয়ের পাঠ যে কোন সময়ে এবং যতক্ষণ ইচ্ছে নিতে পারে। এর ফলে প্রত্যেকটি ছাত্র তাদের আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুসারে বিষয়ের অনুশীলন করতে পারে। যতই আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual differences) কথা প্রচার করি শ্রেণী-কক্ষের পাঠদানের পুরাতন পদ্ধতিতে তার বিশেষ কোন মর্যাদাই রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু ডাল্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের

মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে একটি অসুবিধা হতে পারে। এইভাবে পঠন-পাঠনা সম্পূর্ণ ছাত্রের দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেওয়ায় ফাঁকিবাজ ছাত্রদের ফাঁকি দেবার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। সুতরাং শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়ত সকলের সম্ভব হবে না। যার যেটা অরুচিকর বা কঠিন লাগবে সে সেটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চাইবে, ফলে শিক্ষাটা সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না।

এই অসুবিধার প্রতিকারকল্পে ছাত্রদের প্রতি মাসে একসঙ্গে একমাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

যে যখনই যা পড়ুক মাসের শেষে তার নির্দিষ্ট কাজটুকু (assignment) শেষ করতেই হবে। এবং বিভিন্ন বিষয় পাঠ করে তার সারমর্ম লিখতে হবে। পরে শিক্ষক মহাশয় সেই সব রচনা দেখে প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যেক বিষয়ের পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (graph) প্রস্তুত করবেন। এই রেখাচিত্র দেখলেই ছাত্রদের নানা বিষয়ের উন্নতি অবনতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

ডাল্টন প্ল্যানে পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। উন্নতির রেখাচিত্র দেখেই তাদের উন্নতি অবনতি নির্ণীত হয়। কোন ছাত্র তার পূর্বনির্দিষ্ট কাজ সুসম্পূর্ণভাবে যতক্ষণ না করতে পারছে ততক্ষণ তাকে আর নূতন কাজ দেওয়া হয় না। আবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি কারো কাজ শেষ হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে আরো নূতন কাজ পায়। সহপাঠীদের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না।

এই পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষাদানের এমন কতকগুলি **সুবিধা** আছে যা অন্য কোন পদ্ধতিতে নাই। যথা—

(১) ডাল্টন প্ল্যানে ছাত্রগণ তাদের নিজ নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে। মেধাবী ছাত্র বা অল্পমেধা ছাত্র প্রত্যেকেই নিজস্ব সামর্থ্য অনুসারে এগিয়ে চলে। একজনের জন্য অপরজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

(২) বিদ্যার্জনে ছাত্রেরা যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হতে শেখে। আত্মচেষ্টায় উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে এই পরিকল্পনায়।

(৩) এই পরিকল্পনায় ছাত্রদের ইচ্ছামত পড়াশুনা করবার সুযোগ থাকায় তারা নিজেদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিষয়ে সময় দিতে পারে, তার ফলে

যে বিষয়ে তারা কাঁচা সে বিষয় বেশী সময় দিয়ে ত্রুটি সংশোধন করে নেবার সুযোগ পায়।

(৪) ছাত্রগণের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আত্মনির্ভর হতে শেখে।

(৫) শ্রেণী-কক্ষের পরিবর্তে বিষয়কক্ষের ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। বিষয়কক্ষগুলি যেন শিক্ষালাভের প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটরি। এই জন্য এই পরিকল্পনাকে ল্যাবরেটরি পদ্ধতিও (Laboratory method) বলা হয়।

(৬) নিজ নিজ রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে পড়াশুনা করতে পারে বলে ছাত্রেরা অধিকতর উপকৃত হয়, উৎসাহিত হয়।

(৭) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র দেখে ছাত্রেরা প্রতিদিনই তাদের উন্নতি অবনতির স্বরূপ জানতে পারে, এবং আপেক্ষিকভাবে পাঠোন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে পারে।

(৮) প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে পড়তে পাওয়ায় পাঠ সুষ্ঠু হয়।

(৯) প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিতে পারেন।

(১০) পড়াশুনা পরীক্ষা-শাসিত নয় বলে বাছাই করে পড়া, না বুঝে মুখস্থ করা প্রভৃতি বর্তমান শিক্ষার অনিবার্য কুফল থেকে অব্যাহতি ঘটে।

কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ডাল্টন পরিকল্পনা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নি বা সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয় নি। কারণ এর কতকগুলি গুরুতর **অসুবিধাও** আছে। যথা—

(১) অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কারণ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং বহু সুসজ্জিত বিষয়-কক্ষ ল্যাবরেটারী না থাকলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না।

(২) ছাত্রদের উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকায় অপরিণতবুদ্ধি শিশুশ্রেণীর পক্ষে এ পন্থা একেবারেই অনুপযোগী। কারণ শিক্ষকের সহযোগিতা ব্যতীত নিজের নিজের দায়িত্বে তারা পড়াশুনায় অগ্রসর হতে পারবে না।

(৩) শ্রেণী-পাঠনায় যে গণমনের বিকাশ ঘটে এখানে সে সম্ভাবনা নাই। শুধু গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞানই নয়, গণচেতনা বা সামাজিকতাবোধও আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। ডাল্টন পরিকল্পনায় সে ব্যবস্থা নাই।

(৪) সকল বিষয় শিক্ষার উপযোগিতা সমান নয়।

(৫) শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের পরিবর্তে পাঠ্যগ্রন্থের উপরই ছাত্রদের নির্ভর করতে হয়।

(৬) কেবলমাত্র ছাত্রের লেখা সারমর্ম অনুসারে পাঠোন্নতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সুতরাং উন্নতির রেখাচিত্রটি সত্যসত্যই উন্নতির চিত্র কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। এবং এরই উপর নির্ভর করে পঠন-পাঠনার অগ্রগতি সব সময়ে আশানুরূপ ফল নাও দিতে পারে।

(৭) রুটিন বা ঘণ্টা না থাকলে বিদ্যালয়ের কোন নিয়মশৃঙ্খলাই থাকে না।

(৮) এই পরিকল্পনায় শিক্ষককে একেবারেই নিষ্ক্রিয় দর্শকের শ্রেণীতে নামিয়ে আনা হয়েছে। একই ঘরে একই বিষয় প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা শিক্ষকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

(৯) ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিক্ষক হয়ত বিষয়-কক্ষে প্রস্তুত হয়ে একাই বসে থাকবেন আবার কখনও বা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্র একসঙ্গে এসে হাজির হবে। কারণ, কে কখন কি বিষয় পড়বে সেটা সম্পূর্ণ ই ছাত্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা—

ডাল্টন প্ল্যানের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে দেখা গেল এর অনেকগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অনেক শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার কিছু কিছু অদল বদল করে শ্রেণীপাঠনার অনুপুরক ভাবে সংশোধন করে নিয়েছেন। এর ফলে অসুবিধাগুলি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়ে ডাল্টন প্ল্যান সহজসাধ্য হয়েছে এবং শ্রেণীপাঠনাও উন্নততর হয়েছে। এ সংশোধিত পরিকল্পনায়—

(১) স্কুলের সময়টাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগে রুটিন অনুযায়ী শ্রেণী-পাঠনা এবং শেষভাগে ডাল্টন প্ল্যান অনুযায়ী বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রথমভাগে শিক্ষক যে পাঠ দিলেন দ্বিতীয়ভাগে ছাত্র তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে স্বচেষ্টায় তার অনুশীলন করতে পারে।

(২) ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের জন্য সুসজ্জিত বিষয়-কক্ষ রেখে বাকিগুলি শ্রেণী-কক্ষেই পঠন-পাঠনা চলতে পারে।

(৩) ঘণ্টা এবং রুটিনকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। প্রথমাংশ ত যথারীতি রুটিন অনুসারেই চলবে, দ্বিতীয় অংশেও ঘণ্টা বাজবে তবে

ছাত্রেরা ইচ্ছা করলে কোন বিষয় একঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা ধরে পড়তে পারবে।

(৪) কেবলমাত্র সারমর্ম লেখার উপরই উন্নতি-রেখা রচিত হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র মৌখিক বা লেখার পরীক্ষাও নেওয়া হবে এবং উভয়ের সম্মিলিত ফল দেখেই উন্নতি-রেখা রচিত হবে।

কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশে কয়েকটি সরকারী স্কুলে এই সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা অনুসারে, পঠন-পাঠনার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু নানা প্রকার অসুবিধার জন্য পরে তা পরিত্যক্ত হয়।

———

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি

(Kindergarten Method)

বিখ্যাত জার্মাণ শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল শিশুশিক্ষার যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তার তিনি নাম দিয়েছেন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি। 'কিণ্ডার-গার্টেন' শব্দটির অর্থ হল শিশুর বাগান। নামটি থেকেই ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুরা বিশ্বউদ্যানের চারা গাছ আর শিক্ষক হচ্ছেন বাগানের মালী। মালীর মতই যত্ন করে সার জল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে গরুছাগলের মুখ থেকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করে শিক্ষক শিশুচারাগাছগুলি বড় করে তুলবেন। চারা-গাছের মতই শিশুরা প্রকৃতির কোলে মাটির রস পেয়ে আকাশের আলো-বাতাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে। এই হল তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্য।

শিশু মাত্রেই খেলা করতে চায়, নাচগান হৈ-হল্লা করতে ভালবাসে, সবকিছু ভাঙ্গতে চায় গড়তে চায়। বিচিত্র জগতে তারা নূতন অতিথি, তাই তাদের বিস্ময়ভরা চোখ, আনন্দভরা মন।

সুন্দর ফুলের মতই তারা ফুটে উঠে পৃথিবীর বুকে। ফ্রয়েবেল শিশুদের এই আনন্দস্বরূপটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষার নামে যে শিশুপালবধ চলছে তার প্রতিবিধান করতে গিয়ে সৃষ্টি করলেন এই নূতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 'বিদ্যালয়' এই শব্দটাও তিনি ব্যবহার করলেন না। তার পরিবর্তে কিণ্ডারগার্টেন বা শিশুর বাগান নাম দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যটি পরিস্ফুট করতে চাইলেন।

কিণ্ডারগার্টেনের মূলকথাই হল 'খেলার ছলে শিক্ষা', আর শিক্ষার মূলকথা হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনা। নবাগত শিশু জগতের সমস্ত জ্ঞানকে ত ইন্দ্রিয় মাধ্যমেই গ্রহণ করবে তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিমার্জনাই (Sense Training) হল শিশুশিক্ষার গোড়ার কথা। এরজন্য ফ্রয়েবেল বিচিত্র রঙ্গের নানারকম খেলনা আবিষ্কার করেছেন। এইগুলির তিনি নাম দিয়েছেন উপহার (Gifts)। একটা বাক্সে থাকে নানারঙ্গের পশমের বল, অন্য

কতকগুলিতে থাকে ছোট ছোট কাঠের ঘনক, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, কাঠি, নানারঙ্গের তুলো স্থতো ফিতে—এই সব বিচিত্র রঙ্গের ও ঢঙ্গের জিনিস। এইগুলির সাহায্যে ছোট ছোট শিশুদের বর্ণ আর আকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

আগেই বলেছি, এই পদ্ধতির গোড়ার কথাই হল আনন্দের মধ্যে দিয়ে খেলাধূলার ছলে শিশুদের শিক্ষাদান। তাই খেলাধূলা করবার প্রচুর ব্যবস্থা থাকে এই পদ্ধতিতে। আর প্রকৃতি-পরিচয় হল শিক্ষার প্রধান বিষয়। হাতে-কলমে কাজ করা, নানাবিধ হাতের কাজ শিক্ষা করা, ছবি আঁকা, নাচ গান গল্প অভিনয় করা, এই সব হল শিক্ষায় পদ্ধতি। কর্মসঙ্গীত (Action Song) এই পদ্ধতির একটা বিশেষ অঙ্গ। গানের তালে তালে নানারকম কাজ করতে দেওয়া হয় শিশুদের—ছন্দের আনন্দের সঙ্গে কাজের আনন্দ মিশে শিশুদিগকে আনন্দময় করে তোলে। এই সব আনন্দময় কাজেরও নানাপ্রকার শ্রেণীকরণ করেছেন ফ্রয়েবেল। কাজগুলির নাম দিয়েছেন তিনি বৃত্তি (Occupation)। নানারকমের কাগজ মোড়া, কাগজের ভাঁজে নানারকম খেলনা তৈরী করা, মাত্বর বোনা, ঝুড়ি বোনা, কাগজের ফুল তৈরী করা, সেলাই করা প্রভৃতি নানা ধরণের বৃত্তি নির্দেশ করেছেন ফ্রয়েবেল। উপহার ও বৃত্তি (Gifts & Occupations) এই দুটিই হল ফ্রয়েবেলের শিশুশিক্ষার প্রধান উপকরণ।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের বাস্তব জগতের পরিবেশে রাখা হয় বলে তারা জাগতিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিকতার শিক্ষাও ধীরে ধীরে অর্জন করে। তাঁর স্কুল হবে এমন একটা জায়গায় যেখানে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস, সত্যের মূলতত্ত্ব, ন্যায়পরতা, সাধুতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রেরণা প্রভৃতি শিখতে পারে। বই পড়ে নয়, নিজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা।

ফ্রয়েবেলের দার্শনিক চিন্তার মূল কথাই হল যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক এবং অখণ্ড আনন্দময় সত্বা থেকে উদ্ভূত। সেই বিশ্বসত্বার অনুভূতি প্রত্যেকের মনে জাগ্রত করে দেওয়াই হল শিক্ষার কাজ। তাঁর মতে জীবজগৎ, প্রকৃতি-জগৎ আর ভগবান এই তিন একই সূত্রে বিধৃত। এক ভগবৎসত্বাই বিভিন্ন-রূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। বিশ্বোদ্যানের শিশুচারাগুলি তাই বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র থেকে রস গ্রহণ করে আপনার আনন্দে আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে একান্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে

চলেছে এক পরমশক্তির লীলা। এই শক্তির লীলা ত চলেছে শিশুর মধ্যেও। কিন্তু সেই লীলা আমরা অনুভব করতে পারিনে। নানা বাধায় এই বিশ্বব্যাপী শক্তির সম্পূর্ণ স্ফূরণ হতে পারে না আমাদের মধ্যে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে সেই বাধাকে অপসারিত করে ভগবৎশক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব করা, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সকল প্রকার শক্তির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

—যে গুরুর অন্তরে ছেলে মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়। আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।

—রবীন্দ্রনাথ

—তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক।

—রবীন্দ্রনাথ

—Education, to those who give their lives to it, is a joyous adventure, just because the teacher is ever a learner.

—J. J. Findlay

—The work of a teacher is two-fold, producing thought and training it.

—Edward Thring

—The educator should be called, not a teacher, but a gardener.

—Froeble

—The school master must always have the future of the boy before him.

—John Locke

—The teacher should be an example in person and conduct of what he requires of his pupil.

—Comenius

—A child is a book which the teacher is to learn from page to page.

—Rousseau

বংশগতি ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়, তারপর পরিবেশের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নবজাত শিশু ক্রমশ পূর্ণতর মানুষরূপে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পিতামাতার মিলনে শিশুর সৃষ্টি, পরিপার্শ্বের স্পর্শনে শিশুর পুষ্টি। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে আজ আমরা যে ভাবে পাচ্ছি তার খানিকটা অংশ বংশগতির প্রভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সহজাতভাবে পাওয়া আর খানিকটা পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার সূত্রে অর্জিতভাবে পাওয়া।

বংশগতি বনাম পরিবেশঘটিত দ্বন্দ্ব—

এই দুই অংশের পরিমাণ কত বা কোন অংশের প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী এই নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। পিণ্টার গ্যালটন, থর্ণডাইক, গডার্ড, ডাগডেল প্রমুখ একদল বিজ্ঞানী বংশগতির একছত্র প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁদের কথা হল—'শুয়োরের কান দিয়ে কি আর রেশমের থলি বোনা যায়?' অর্থাৎ বংশের প্রভাবে যারা শুয়োরের কান হয়ে জন্মেছে, হাজার চেষ্টা করলেও তাদের রেশমের সুতোয় রূপান্তরিত করা যাবে না। শুয়োরের কান আর রেশমের সুতো এ হল একেবারে জন্মগত ব্যাপার, কোন রকম কৃত্রিম প্রচেষ্টাতেও তাদের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়।

আবার পরিবেশের সমর্থকরাও বড় কম যান না। লক, হেলভেসিয়াস, জাড্, ক্যাটেল, বেগলে, ওয়াটসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীবৃন্দ মহাভারতের কর্ণের মতই বলেছেন—'জন্ম মোর যথা তথা কর্ম মোর হাতে—'

ওয়াটসন ত বংশগতির সমর্থকদের চ্যালেঞ্জ করে বল্লেন--যে কোন বংশের এক ডজন সুস্থ সবল শিশু যদি তাঁর হাতে দেওয়া যায় তাহলে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে তিনি তাদেরকে ইচ্ছামত মানুষ গড়ে তুলতে পারেন।

[Give me a dozen healthy infants well-informed and my scientific world to bring them up in, I might train them to become any type of specialist, I might select regardless of their hereditary equipment.]

মোট কথা এই দ্বন্দ্বের মূল বক্তব্য হল একজনের মতে পিতামাতার শুক্র ও ডিম্বকোষের (Sparmatozoa and ovam) সংসর্গের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের ভবিষ্যত-জীবনের পথ স্থানর্দিষ্ট হয়ে যায়, পারবেশ তার যতটুকু পারবর্তন ঘটায় তা একান্তই নগণ্য।

অপরের মতে শিশু একেবারে মোছা শ্লেট (Tabula rasa) নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তারপর পারবেশের প্রভাবে লেখা শুরু হয় সেই শ্লেটে। পিতামাতার যে প্রভাব আমরা শিশুর জীবন দেখি তা' পিতামাতার পারবেশে শিশুরা মানুষ হয় বলে।

সমস্যা সমাধানে পরিসংখ্যন তত্ত্ব—

কোন কোন বিজ্ঞানী পরিসংখ্যন তত্ত্বের সাহায্যে এই দুই মতের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত এবং কুখ্যাত ব্যাক্তর বংশ-বিতান অনুসন্ধান করেছেন। ওয়েজউড,—ডারউইন,— গ্যালটন পরিবারের বংশধারা অনুসন্ধান করে দেখা গেল বিভিন্ন পারবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এই সব বংশের অধিকাংশ ব্যক্তিই জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত হয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে জ্ঞানীবংশের ধারা চলেছে, পারবেশের প্রভাব তাকে বড় বেশী পরিবর্তন করতে পারেনি।

ডাগডেল আবার এর উল্টো দিকটাও দেখিয়েছেন কুখ্যাত যুক পরিবারের বংশগাত আলোচনা করে। পরিবারের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন একজন অপরাধ-প্রবণ ভবঘুরে জেলে। পরবর্তী দু'শ বছর ধরে এই বংশে যে সব ছেলেমেয়ে জন্মেছে, দেখা গেল তাদের অধিকাংশই হয়েছে দুর্বলমেধা, চোর, বদমাইস, উন্মাদ এবং সমাজ-বিরোধী প্রকৃাতর লোক।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছেন গডার্ড। আমেরিকার জনৈক ক্যালিকাক্ পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখেন ক্যালিকাকের দুই স্ত্রী। তাদের মধ্যে একজন সুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশের মেয়ে, এবং অপরজন হীনবুদ্ধি অপরাধপ্রবণ বংশের মেয়ে। আশ্চর্যের বিষয় প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশে অধিকাংশই মার্জিত রুচি, শিক্ষিত ব্যাক্ত আর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ভবঘুরে অপরাধপ্রবণ দুষ্ট প্রকৃাতর ব্যাক্ত জন্মগ্রহণ করেছেন।

যমজ সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষা করেও বেশ মজার তথ্য পাওয়া গেল। যমজ সন্তান দুই প্রকার হতে পারে—সমকোষী ও ভিন্নকোষী। যমজদ্বয়

যখন একই জননকোষ (zygote) বিভক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় তখন তাদের বলা হয় সমকোষী যমজ সন্তান (one-egg twins) আর একাধিক জনন কোষ থেকে যখন যমজ সন্তান জন্মায় তখন তাদের ভিন্নকোষী যমজ (two-egg twins) বলে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সমকোষী যমজেরা আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে অনেকটা এক ধরনের। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পারবর্তন ঘটে না।

কিন্তু ভিন্নকোষী যমজেরা দুটি স্বতন্ত্রভাবে জাত সন্তানের মতই। এদের মধ্যে পরিবেশ ঘটিত প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী।

[......the one-egg twins have similar heredities, regardless of whether they are reared together or apart. Two-egg twins differ in heredity as much as do brothers and sisters born at different times......L. C. Dunn and T. Dobzhansky.]

সুতরাং ভিন্নকোষী যমজ অপেক্ষা সমকোষী যমজ সন্তানদের অভিন্নতা বংশগতির অপরবর্তনীয় প্রভাবই প্রমাণ করে। উইংফিল্ড তাই বলেছেন যমজ সন্তানদের মানাসক শক্তির অভিন্নতা কেবলমাত্র পরিবেশ বিচার করে ব্যাখ্যা করা চলে না—[Environment is inadequate to account for the mental resemblance of twins.]

তবে বিপরীত মতের পরিসংখ্যানেরও অভাব নেই। পার্শি নান্ সাহেব ইংলণ্ডের বার্নাডো হোমস্ জাতীয় বিদ্যালয়ের উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে ভাল পরিবেশে মানুষ করে তোলা হয়, তাদের অধিকাংশই সুশিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগারক হিসাবে গড়ে উঠেছে। [The records of such institutions as the Barnado Homes point in the same direction as East's scientific analysis ; for they tend to show that the most unpromising stock when properly nurtured, may yield good and sound human materials —Percy Nunn.]

বংশগতির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব :—

বংশগতি আর পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধে পরিসংখ্যন তথ্য যে তত্ত্বই প্রকাশ করুক জৈববিজ্ঞানীরা নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রজননতত্ত্বের মূল সত্যটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। রসায়ন শাস্ত্র অনুযায়ী দুইটি

মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থের। এবং এই যৌগিক পদার্থের গুণাবলি মৌলিক পদার্থগুলির গুণাবলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। জীববিজ্ঞান শাস্ত্র অনুসারেও দেখা যায় পুরুষের শুক্রের (sperm) সঙ্গে স্ত্রীডিম্বের (ovum) সংযোগে যে ভ্রূণের (zygote) উৎপত্তি ঘটে, গুণানুসারে তা শুক্র বা ডিম্ব থেকে স্বতন্ত্র।

ভ্রূণ (zygote) হচ্ছে নিষিক্ত প্রথম জীবকোষ। এই জীবকোষটি ক্রমশ বহুগুণিত হতে হতে পরে জীবদেহ গঠন করে। সুতরাং ভাবী মানুষটির সমুদয় সম্ভাবনা এই ভ্রূণবিন্দুটির মধ্যেই সুপ্ত থেকে গিয়েছে বললে ভুল বলা হবে না।—এই হল বংশগতি [The sum total of the potentialities possessed by an organism in the zygote stage of its existences].

একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলি, যে সমস্ত শারীরিক মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, ঐ ভ্রূণটির মধ্যে তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাটি সুপ্ত রয়ে গিয়েছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পিতামাতার গুণাবলিই যে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয় একথা মনে করলে অন্যায় হবে না।—কিন্তু আগেই বলেছি, মৌলিক পদার্থদ্বয়ের মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটির গুণাবলি মৌলিক পদার্থদ্বয় থেকে যেমন স্বতন্ত্র হয়, তেমনি ভ্রূণের গুণাবলিও শুক্রের বা ডিম্বের গুণাবলি হুবহু অনুসরণ করে চলে না।

বংশগতির সূত্র—(Laws of Heredity)

বংশগতিধারাটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে তা থেকে আমরা কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। যথা—

(ক) কোন একজাতীয় প্রাণী বা জীব সেই জাতীয় প্রাণী বা জীবই উৎপাদন করে থাকে। (like begets like)—অর্থাৎ মানুষের গর্ভে মানুষই জন্মাবে, বিড়ালের গর্ভে বিড়াল, গরুর গর্ভে গরু অথবা আমের বীজ থেকে আম গাছেরই উদ্ভব ঘটবে।—এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সেই রকম লম্বা পিতার সন্তান লম্বা, বুদ্ধিমানের সন্তান বুদ্ধিমান, ফর্সা পিতার সন্তান ফর্সা হবার সম্ভাবনাই অধিক। ইতিপূর্বে বংশগতির স্বপক্ষে যে পরিসংখ্যান তথ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তাও এই সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলে।

(২) সমজাতীয় জীব থেকে সমজাতীয় সন্তানই উৎপন্ন হয়। আবার পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে বিভিন্নতাও থাকে যথেষ্ট। উভয়ের মধ্যে সব

সময়েই কিছু স্বাতন্ত্র, কিছু বিভিন্নতা এবং কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্তী পুরুষ অব্যবহিত পূর্ববর্তী পুরুষের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। অবশ্য এই পরিবর্তনের কারণ কি তা বলা যায় না।

(৩) অর্জিত বিদ্যা সোজাসুজি বংশধারায় চালান করে দেওয়া যায় না। শিক্ষিত পিতামাতার পুত্র হলেই যে সে সহজে শিক্ষিত হয়ে উঠবে এমন কথা নেই। সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর পিতার পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর নাও হতে পারে।

তবে গুণটা পুরোপুরি না দিতে পারলেও সম্ভাব্যতাটা বংশধারার মধ্যে কিছু পরিমাণে চালান করা যায়। শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান সমপরিমাণ শিক্ষিত হয়ত হবে না, তবে শিক্ষিত হবার সম্ভাবনাটা যে তার মধ্যে অধিকতর থাকবে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

(৪) পিতামাতা থেকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বংশধারা অনুসরণ করে চললে দেখা যাবে পৈতৃক গুণাবলির সমতা ও বিসমতা উভয়ই সমানভাবে বংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এও দেখা যাবে ক্রমশ বৈচিত্র্যের সংখ্যা কমে গিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে আসছে গুণগুলি। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গড় অবস্থা আছে। যদিও মাঝে মাঝে গোটাকতক অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়, কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যেই অস্বাভাবিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে চায়। আকৃতির কথাই ধরা যাক—মানুষের একটা স্বাভাবিক গড় উচ্চতা আছে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি লম্বা এবং কয়েকটি বেঁটে মানুষ জন্মায়। কিন্তু কয়েক পুরুষের মধ্যে দেখা যাবে লম্বা এবং বেঁটের সন্তানেরা গড়ের দিকেই সরে আসছে।

প্রজনন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—

কিন্তু কেন এমন হয়? প্রজনন তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যাবে একটি নিষিক্ত ডিম্বকোষ (fertilised ovum) বহুগুণিত হতে হতে ক্রমশ সম্পূর্ণ দেহটি গঠিত হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টিধর্মী বীজপঙ্কটি (germ plasm) অবিকৃত থেকে যায় মানুষের দেহে। সেই জীবকোষটি চলে যায় সন্তানের দেহে, এবং নূতন সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকে দেহের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক ওয়েজম্যান এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন মানুষ হল জননকোষটির ন্যাসরক্ষক মাত্র। এই হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ নয়, তারা যেন একই বীজপঙ্ক থেকে বিভিন্ন মাতৃগর্ভজাত দুই

বৈমাত্রেয় ভাই। (father and son are two step-brothers by different mother)

ওয়েজম্যানের তত্ত্ব অনুসারে কোন গুণই ত বংশধারায় প্রবেশ করার কথা নয়। তাছাড়া একটি বীজপঙ্ক থেকে একটি বংশের ধারা উৎপন্ন হলে মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

তাছাড়া পরীক্ষা দ্বারাও দেখা যায়, নিম্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে বীজপঙ্ক অবিকৃত থাকলেও মানুষের দেহে তা' শোষিত হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একটি বীজপঙ্ক সৃষ্টি হয়।

মেণ্ডেলের সূত্র (Mendel's law) :—

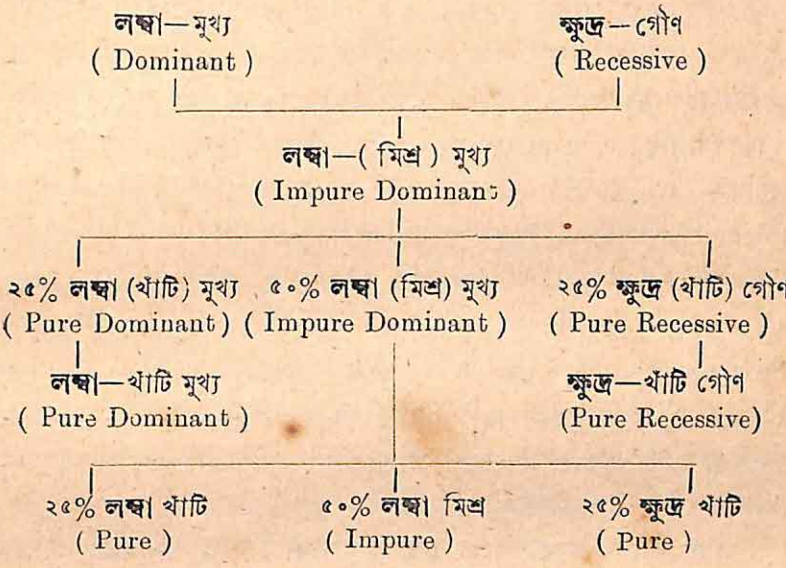
তাহলে বংশানুক্রমে গুণাবলির প্রসারণ ঘটে কিনা এবং ঘটলে তা কেমন করে ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। প্রজনন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জন গ্রেগর মেণ্ডেল সাহেব উনিশ শতকের মধ্যভাগে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তারি মধ্যে এই প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর মিলেছে।

প্রথমে তিনি ক্ষুদ্র আর লম্বা দুইজাতের মটর দানার সঙ্কর উৎপন্ন দ্বারা পরীক্ষা করে দেখলেন, বংশধারায় গুণাবলির প্রসারণ কি হিসাবে ঘটছে।

ক্ষুদ্র দানার আর লম্বা দানার সংমিশ্রণে যে ফলগুলি উৎপন্ন হল তা সবই হল লম্বাজাতের। হ্রস্বতার গুণটি যেন লুপ্তই হয়ে গেল। লম্বা-গুণের চাপে ক্ষুদ্রতা গুণটি যেন পেছিয়ে পড়ল। মেণ্ডেল এই এগিয়ে-আসা গুণটির নাম দিলেন মুখ্য (dominant)। আর পিছিয়ে-যাওয়া গুণটির নাম দিলেন গৌণ (recessive)। পরের পরীক্ষায় দেখা গেল গৌণ গুণটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি, সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র। সুযোগ পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করেছে বংশের মধ্যে। আরো আশ্চর্যের বিষয়, গুণের এই মুখ্যতা ও গৌণতা একেবারে গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।

অতঃপর এই লম্বাজাতের বীজগুলি বপন করে তা থেকে কিন্তু লম্বা আর ক্ষুদ্র দুই জাতের ফলই পাওয়া গেল ৩ : ১ অনুপাতে, অর্থাৎ উৎপন্ন ফলগুলির তিন ভাগ হল লম্বা জাতের আর একভাগ ক্ষুদ্র জাতের। ক্ষুদ্রগুলি হল খাঁটি (pure) ক্ষুদ্র অর্থাৎ এগুলির মধ্যে আর লম্বা হবার গুণ থাকল না। কিন্তু তিন ভাগ লম্বার মধ্যে একভাগ হল খাঁটি (pure) লম্বা আর দুইভাগ মিশ্র (impure) লম্বা। মিশ্র-লম্বা ফল চাষ করে তাথেকে আবার পাওয়া গেল একভাগ খাঁটি লম্বা, একভাগ খাঁটি ক্ষুদ্র এবং দুইভাগ মিশ্র লম্বা।

রস (Ross) সাহেব তাঁর বইতে এই মেণ্ডেলীয় বংশগতির ধারা বোঝাবার জন্য একটি নকসা দিয়েছেন তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে—



খাঁটি আর মিশ্র বলবার উদ্দেশ্য হল খাঁটিগুলির ঐ নির্দিষ্ট আকার একেবারে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে, আর মিশ্রগুলির তা হয়নি, একটু সুযোগ পেলেই তার মধ্যে বর্ণ সঙ্করের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মটরদানার পর আরো অন্যান্য উদ্ভিদ এবং ইতর প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা করেও মেণ্ডেল এক রকমই ফল পেলেন। সুতরাং মেণ্ডেলীয় তত্ত্বে বোঝা গেল পিতামাতার মধ্যে দিয়ে যদি দুই বিপরীতধর্মী গুণের সংমিশ্রণ ঘটে তবে মিশ্র বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই উভয়গুণের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ হতে পারে। পিতা ও মাতার জননকোষদুটির গুণানুসারে কোনও গুণ স্থায়ীরূপ পাবে, কোনটি আবার অস্থায়ী হিসাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে পরবর্তী বংশে। এইভাবে মেণ্ডেলীয় সূত্রে পিতাপুত্রের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়েরই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

মোটকথা, বংশধারায় প্রধাবিত গুণগুলি জীবকোষের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ঘটে থাকে।

আরো সূক্ষ্মতর পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিটি জীবকোষের মধ্যে ক্রোমোসোম (Chromosome) নামে অনেক জোড়া সুত্রাকার বস্তু রয়েছে।

পুংবীজ এবং স্ত্রীডিম্ব যখন মিলিত হয় তখন মিলিত জীবকোষের (zygote) ক্রমোসোমের সংখ্যাও দ্বিগুণিত হয়ে যায়। প্রত্যেকটি জীবের এই ক্রমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন মানুষের ২৪ জোড়া, গোরুর ৮ জোড়া ইত্যাদি। এ বিষয়ে মর্গান সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করে স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন—The sperm of every species of animal or plant carries a definite number of bodies called chromosomes. The egg carries the same number. Consequently, when the sperm unites with egg, the fertilised egg will contain the double number of chromosomes. For each chromosome contributed by the sperm there is a corresponding chromosome contributed by the egg, ie. there are two chromosomes of each kind which constitute a pair.

মর্গান সাহেব পরে আরো সূক্ষ্মতর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন প্রতিটি ক্রোমোসোমের মধ্যে আবার রয়েছে জিনি (gene) নামক আরো সূক্ষ্মতর বস্তু। মানুষের মধ্যে এই জিনির সংখ্যা কয়েক সহস্র। এবং এদের বিভিন্ন ধরনের মিলনের ফলেই সন্তানের মধ্যে এত গুণবৈচিত্র্য দেখা যায়। [The unit of inheritance is undoubtedly the gene of the chromosomes—Sandiford] সুতরাং কোন গুণ কি ভাবে কতটুকু কার মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে যাবে তা নির্ণয় করা আদৌ সহজসাধ্য নয়।

যাইহোক এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল যে **মানুষ তার আকৃতি আর প্রকৃতির অনেকখানি অংশই উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে, তবে কতটা পাবে এবং কি ভাবে পাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল।**

বংশধারায় অর্জিত গুণ :—

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তার কোন সদুত্তর ওতে পাওয়া গেল না। মার্জিতরুচি অভিজাত এবং শিক্ষিত বংশেই কেবল শিক্ষার ফল পাবে, অশিক্ষিত মূর্খ বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের বংশধারায়

শিক্ষায় কি কোন ফসলই ফলান যাবে না ?—অর্থাৎ মূল প্রশ্ন হচ্ছে, অর্জিত গুণাবলি কি বংশধারায় প্রবেশ করে না।

বৈজ্ঞানিক ওয়েজম্যান বীজপঙ্কের অব্যাহত ধারা উল্লেখ করে, বংশে অর্জিত গুণের প্রবেশ অস্বীকার করেছেন, এ কথা আগেই বলেছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে পুরুষানুক্রমে ইঁদুরের লেজ কেটে কেটে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন বংশে লেজহীন ইঁদুরের উৎপত্তি হয় কিনা। কিন্তু কোন ইঁদুরই লেজহীন হয়ে জন্মাল না। অর্থাৎ কর্তিত লাঙ্গুলের গুণটি বংশধারায় গেল না। কিন্তু ডারউইন 'জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) তত্ত্বে দেখিয়েছেন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় যে সব নূতন গুণ অর্জিত হয়েছে বংশধারায় সেই সব গুণ ক্রমশ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলেই জীবজগতে এত বৈচিত্র্য। লামার্কের মতে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়ার ফলেই বংশধারায় ক্রমশ বৈচিত্র্য এসেছে। এই ভাবেই জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে, উটের পা চ্যাপটা হয়েছে, বাঘের গায়ে ডোরা হয়েছে এমনি আরো কত কি ?

অথচ ওয়েজম্যানের পরীক্ষায় এই সত্যের সমর্থন পাওয়া গেল না কেন ? প্রশ্নের উত্তরে বার্ণাড শ ঠাট্টা করে বলেছিলেন—ইঁদুরগুলি তাদের দেহের উপর আঘাতকে স্থায়ী করে ধরে রাখতে চায় নি। (Mice did not like to perpetuate the assault on them).

একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে ইচ্ছাটি জীবের বাঁচবার ব্যাকুলতা থেকে উৎপন্ন এবং জীবনসংগ্রামে জয় লাভের সহায়ক, সেই জীবনপ্রয়াসটি মাত্র বংশধারায় সংক্রমিত হয় এবং ক্রমশ সৃষ্টিধারায় বৈচিত্র্য আনে।

এই তত্ত্ব অনুসারে আমরা মনে করতে পারি পরিবেশের সমস্ত প্রভাবই বংশধারায় অনুপ্রবিষ্ট না হলেও জীবন প্রয়াসের অনুকূল আচরণগুলির প্রভাব পড়ে বংশগতিতে। আজকে আমরা অনর্জিত বা সহজাত প্রবৃত্তি (Natural instincts) নাম দিয়ে মানুষের যে সব প্রবৃত্তিগুলিকে চিহ্নিত করেছি সেগুলিও জীবনপ্রয়াসের তাগিদে ধীরে ধীরে বংশধারায় অর্জিত হয়েছে। কি ভাবে এই নিরন্তর অর্জন কার্য চলেছে জীবের মধ্যে তা ইতিপূর্বে 'শিক্ষার প্রণালী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। অর্জনকার্য আজও বন্ধ হয়ে

যায়নি, ধীরে ধীরে তার কাজ সবসময়ে চলেছে, যার পরিচয় আমরা পাই পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়ার সার্থকতায়।

পরিবেশের প্রভাব :—

বংশগতির প্রভাবের কথা ত এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, এইবার দেখি পরিবেশের প্রভাব।

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে বড় হয়ে ওঠে তাই হল শিশুর পরিবেশ। এমন কি মাতৃগর্ভও নিষিক্ত বীজকোষের পরিবেশ মাত্র।

পরিবেশকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, নিকট পরিবেশ, দূর পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। দেশের আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব যে জীবের উপর কতবেশী তা ত আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।

সামাজিক পরিবেশ—অর্থে সামাজিক আচার আচরণ সংস্কার ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির কথা বলছি। মানুষের উপর এদের প্রভাবও অনস্বীকার্য।

তারপর **মানসিক পরিবেশ**—একজন ইতিহাসের ছাত্রের কাছে প্রাচীন যুগের একটা ছবি মুদ্রা বা মূর্তি যে প্রভাব বিস্তার করবে তার ঘরের পাশের নিত্য দেখা কোন জিনিসই তেমন পারবে না। বাংলাদেশের যে ছেলেটি ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় ব্যস্ত তার কাছে তার অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রতিবেশী অপেক্ষা সেক্সপীয়র মিল্টন বাইরন অধিকতর আত্মীয়।

দেহের পরিবেশ সবসময়ে আমাদের মনের পরিবেশ হয় না। মানসিক পরিবেশ যেন মনের চারিদিকে একটা সংস্কারের দেয়াল তুলে দেয়। সেক্সপীয়র তাই বলেছেন—"Make not your thought your prison"। সুতরাং মানুষের উপরে এই মানসিক পরিবেশও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, একথা বলাই বাহুল্য।

জীবের জীবনে এইসব নানাজাতীয় পরিবেশের প্রভাব যে কতবড় তা ডারউইন সাহেব তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিস্' (Origin of species) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে জীবের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত কত পরিবর্তনই ঘটে যায় যার ফলে জীবন

সংগ্রামে যোগ্যতার উর্দ্ধতন ঘটে। অরণ্যচারী, পর্বতবাসী, সমতলবাসী, মরুভূমিবাসী বিভিন্ন মানুষের আকার প্রকারের মধ্যে যে পার্থক্য তা একান্তভাবে পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে ওঠে এবং বংশধারায় সংক্রামিত হয়ে যায়।

গ্রাম্যবালক ও শহরবাসী বালকের চালচলন আচার আচরণ শিক্ষা দীক্ষা এমন কি বুদ্ধির ক্ষেত্রেও যে পার্থক্য দেখা যায় তারও প্রধান কারণ পরিবেশ।

সুতরাং মানুষের প্রকৃতি গঠনে বংশগতির প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, পরিবেশের প্রভাবও তেমনি নগণ্য নয়। —এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মিচুরিন (Michurin) ও লাইসেঙ্কোর (Lysenko) চমকপ্রদ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করতে হয়।

মিচুরিন কেবলমাত্র পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ভিদ জগতে নাকি নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সাধারণ গমকে তিনি সাইবেরিয়ার বরফের উপর অঙ্কুরিত করেছেন, একজাতীয় গম থেকে নানা জাতীয় গম উৎপন্ন করেছেন, এমন কি গমের গাছ থেকে রাই পর্যন্ত ফলিয়েছেন।

তাঁর সেই পরীক্ষার মূলকথা হল **জীবের উপরে বংশগতির প্রভাব একান্তই নগণ্য, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছামত সব কিছুই করা যায়।** লাইসেঙ্কো এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নাম দিয়েছেন **মিচুরিনিজম্** (Michurinism)। মিচুরিনিজম্ জীববিদ্যায় যুগান্তর ঘটিয়েছে বলে লাইসেঙ্কো-পন্থীরা দাবী করেন।

[Lysenko's followers claim many wonderful transformations of heredity. The most extravagant of these claims is that by planting common wheat under unfavourable conditions one can transform it not only into a wheat of a different species but even into rye. —Dunn & Dobzhansky]

অবশ্য এই দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে বর্তমান জীববিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর পরীক্ষাগারে মিচুরিনিজিমের তথ্য সন্দেহাতীতভাবে আজো প্রমাণিত হয়নি। আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে মিচুরিনিজম লাইসেঙ্কোর পরীক্ষাগারের বাইরে কোথাও সফল হয় নি।

[……Every type of experiment in Lysenko's arsenal was performed by biologists before him with results that fail to support him. And whenever his work is repeated by biologists and plant breeders outside the Soviet Union, the results contradict Lysenko's assertion—Dunn & Dobzhansky]

বংশগতি ও পরিবেশের সমন্বয়—

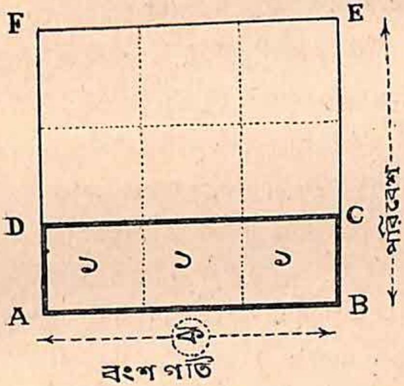
এতক্ষণ ধরে বংশগতি আর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে যা বলা হল তাতে মনে হতে পারে জীবের জীবনধারায় উভয়ের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। কারো মতে একটার জয় কারো মতে অন্যটার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে উভয়ের প্রভাব পরস্পর পরিপুরক। বংশগতভাবে প্রাপ্ত দোষগুণ কতটা বিকশিত হবে সেইটে নির্ভর করছে পরিবেশের উপর। অনেকে বীজ আর জমির উপমা দিয়ে উভয় শক্তির যুগপৎ প্রভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। ভাল বীজ না হলে কোন রসাল জমিই তাকে অঙ্কুরিত করতে পারবে না, আবার ভাল বিজ হওয়া সত্ত্বেও ইট পাথরে পড়লে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্যাণ্ডিফোর্ড প্রশ্ন করেছেন ইঞ্জিন আর গ্যাসোলিন এই দুটোর মধ্যে কোনটায় উপযোগিতা বেশী—(Which is more important—the engine or the gasoline ?)

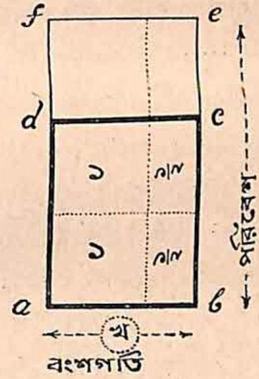
এই প্রশ্নের তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন—কাউকেই আমরা ছোট করতে পারি না—(Nobody in his senses would be little either) অর্থাৎ উভয়েরই সমমূল্য।

বংশগতির প্রকৃতিটি একেবারে স্থিরনির্দিষ্ট। গুণগতভাবে সে একেবারে অনড়—অনর্জিত অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সার্থক পরিবেশ তাকে উদ্দীপিত করে, পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। আমের বীজের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের আমের সম্ভাবনাই বংশানুক্রমিকভাবে সুপ্ত থাকে। সারযুক্ত ভালমাটির পরিবেশ পেলে তবেই সেই সুপ্ত সম্ভাবনা সুপ্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। এমন কি নিকৃষ্ট ধরনের আমের বীজকে ভাল পরিবেশের প্রভাবে রাখলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছু ভাল ফল আশা করা যায়। বিপরীত ক্রমে ভাল আমও হীনপরিবেশের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। —অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় **প্রত্যেক মানুষটি তথা প্রত্যেক জীবটি বংশগতি ও পরিবেশের গুণফলের**

সৃষ্টি। বংশগতির ত্রুটি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে বেশ খানিকটা সংশোধন করা যেতে পারে, আবার পরিবেশের ত্রুটিও ভাল বংশগতি অনেকটা সেরে নেয়।

একটা জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করি। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে যদি একটি সম্পূর্ণ মানুষ বলে ধরা যায় তাহলে তার ভূমিকে বংশ-গতি আর উচ্চতাকে পরিবেশ মনে করা যেতে পারে। ভূমি বা বংশগতির হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই বটে কিন্তু উচ্চতা বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে আমাদের। সুতরাং ভূমি কারো কম হলেও উচ্চতা যথাসম্ভব বাড়িয়ে সেটাকে পরিপুরণ করা যেতে পারে।





মনে করি, **ক**, **খ** দুই ব্যক্তি। তার মধ্যে **ক** এর বংশগতি **খ** অপেক্ষা ভাল, ধরা যাক দ্বিগুণ (**AB** = ৩, **ab** = ১½)

কিন্তু **ক** অপেক্ষা **খ** এর পরিবেশ যদি দ্বিগুণ উন্নত করা যায় তাহলে **ABCD** ও **abcd**র ক্ষেত্রফল সমান হয়ে যাবে। [**ABCD** = ৩, **abcd** = ৩]। অর্থাৎ **ক** অপেক্ষা **খ** হীন বংশে জন্মেও উন্নততর পরিবেশের প্রভাবে উন্নত হতে পেরেছে। নান্ সাহেব বার্ণাডো হোমসের ছেলেদের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই ভাবে তার ব্যাখ্যা করা যায়।

আবার উভয়েই যদি একই প্রকার হীন পরিবেশে থাকে তাহলেও বংশ-গতির প্রভাবে **ক**এর ফল **খ**এর চেয়ে উন্নত হবে।

কিন্তু উচ্চ বংশগতি যদি উচ্চ পরিবেশ পায় তবে তার ফল যে সর্বাপেক্ষা ভাল হবে তা ত সহজেই অনুমেয়। **ক** ও **খ** দুজনকেই যদি একই উন্নত পরিবেশে রাখা যায় তাহলে **ক**এর ফল **খ**এর চেয়ে উন্নত হবে। [**ABCD** = ৯, **abcd** = ৪½]

ইতিপূর্বে বিখ্যাত ও কুখ্যাত পরিবারের বংশ বিতানা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তার ব্যাখ্যাও এভাবে করতে পারি।

সামাজিক বংশানুবর্তন (Social heretage)—

এতক্ষণ ধরে বংশগতি আর পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় দলেরই দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করা গেল। কিন্তু কারো দৃষ্টিতেই ব্যাপারটির সম্পূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়নি। পার্শি নান্ সাহেব বলেন বৈজ্ঞানিকেরা মানুষকে যেন জড় পদার্থ বলেই মনে করেছেন। কিন্তু মানুষের স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে, তার নিজের প্রয়োজনের চাহিদা আছে। সেই অনুসারেই সে তার বংশগতি আর পরিবেশের প্রভাবকে কাজে লাগাচ্ছে।

[……the human organism, body and mind, is a centre of creative energy that uses endowment and environment as its working material; so that the elements it receives from nature and nurture do not make it what it becomes, except in so far as they are the bases of the free activity that is essential fact of its existance.—P. Nunn]

উডওয়ার্থ এই নির্বাচিত পরিবেশের একটা নূতন নামকরণ করেছেন কার্যকরী পরিবেশ (effective endowment)।

একই জমি থেকে আমগাছ আর নিমগাছ রস গ্রহণ করছে কিন্তু তার ফল হচ্ছে উল্টো।

একই পরিবেশে মানুষ হয়েও যমজ সন্তানদের কেউ হয় সাধু কেউ হয় গুণ্ডা।

সুতরাং পরিবেশের প্রভাব মানুষ কতটা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে চায় সেটাও উল্লেখযোগ্য। বলাইবাহুল্য এই ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে পরিবার সমাজ ও গোষ্ঠি।

বর্তমান যুগে যে ছেলে জন্মায়, জন্মানর সঙ্গে সঙ্গেই সে সভ্যতার নানা উপকরণের সংস্পর্শে আসে, সমাজ তারজন্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যালয় তৈরী করে রেখেছে, বিভিন্নদেশের বিভিন্ন যুগের মনীষীদের চিন্তাধারার সম্পদ গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করে রেখেছে। শিশুর জীবন গঠনে এ সকলের দানও নগণ্য নয়। স্যাণ্ডিফোর্ড এই কথাটাই সুন্দর করে বলেছেন—মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে জৈব বংশগতি নিয়ে এবং সামাজিক বংশগতির মধ্যে [Children are born

with a biological heritage; they are born into a social heritage.]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিভার সম্ভাবনা নিয়ে যদি আফ্রিকার হটেনটট্‌দের সমাজে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব হত না।

যে বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা হয় সব সময়ে, সে বাড়ির ছেলে অজ্ঞাতসারেই পড়াশুনার প্রভাব লাভ করে। একেই আমরা নাম দিই সামাজিক বংশগতি (Social heritage)।

শিক্ষকের দায়িত্ব—

বংশগতি আর পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব আলোচনা করা গেল। এ বিষয়ে শিক্ষকের কি করণীয়? মানুষের জীবনে বংশগতিই যদি একমাত্র প্রভাবশালী কারণ হত তাহলে শিক্ষকের ত কোন কিছুই করণীয় থাকত না। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না একথা ত সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু জীবন বিকাশে পরিবেশের দানও ত কম নয়। আগেই বলেছি বংশগতি দেয় সম্ভাবনা আর পরিবেশ দেয় তার রূপ। কে কতটা সম্ভাবনার মূলধন নিয়ে এসেছে তা ত জানা যাচ্ছে না, সুতরাং যথোপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে প্রত্যেকেরই সহজাত সম্ভাবনাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন শিক্ষক। শিক্ষকের অপর নাম পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণকারী (manipulator of environment); সুতরাং শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য পরিবেশ (effective environment) রচনা করে সামাজিক মানুষ হিসাবে তাকে যথাসাধ্য ফুটে উঠতে সাহায্য করা ছাড়া শিক্ষক আর কি করতে পারেন! বিদ্যালয়ের পরিবেশে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এসে শিক্ষার্থীর রুচি প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অন্যান্য শক্তি কি ভাবে বিকশিত হচ্ছে সে সবই শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বংশধারার ইতিহাসও যথাসাধ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই দুইটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে পরিবেশের প্রভাব শিশুর জীবনে কতটা কার্যকরী হচ্ছে।

তাই তুলনামূলক বিচার করতে গেলে বংশগাত আর পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সম্বন্ধেও শিক্ষকের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

———

পুনরাবৃত্তিবাদ

(Recapitulation Theory)

মাতৃগর্ভে নিষিক্ত জীবকোষ থেকে জীবের উৎপত্তি। তারপর ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই নানা প্রকার পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে করতে বিচিত্র জীবলীলার অনুবর্তন চলে।

এই হিসাবে প্রত্যেকটি জীব তার নিজ নিজ জীবনে জাতগত জীবনের (racial life) বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য ক্রমপর্যায় অনুসারে পুনরাবৃত্তি করে চলে। পশুজীবনে এই পুনরাবৃত্তির কাজ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। কারণ সে ক্ষেত্রে তার জীবনধারণের পথ একেবারে ছকে-বাঁধা স্থিরনির্দিষ্ট।

মানুষের জীবনেও এই পুনরাবৃত্তি সমভাবেই কার্যকরী বলে অনেকে মনে করেন। মানুষের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির কাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) জৈব পুনরাবৃত্তি (biological recapitulation) (খ) মানসিক বা সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি (cultural recapitulation)

জৈবপুনরাবৃত্তির মূলকথা—জীবসৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আদিতে ছিল এককোষদেহী আদ্যপ্রাণী, তারপর কোষবিভাজন পদ্ধতিতে ক্রমশ কোষ সংখ্যা বেড়ে চলল, সৃষ্টি হতে লাগল নূতন নূতন জীবের, শেষে বহুকোষদেহী জটিল মনুষ্য-দেহের ঘটল উদ্ভব। একটি এককোষদেহী অ্যামিবা থেকে শুরু করে সৃষ্টির বিচিত্র পথ পরিভ্রমণ করতে করতে আজকের এই অগণিত কোষ সমন্বিত জটিল মনুষ্যদেহে উপনীত হতে কত যুগযুগান্তর কেটে গিয়াছে, কে জানে।

উদ্‌বর্তন ক্রিয়ার এই যুগযুগান্তরব্যাপী পথ প্রত্যেকটি মানুষ তার মাতৃগর্ভে মাত্র কয়েকটি মাসে পরিভ্রমণ করে থাকে।

এককোষদেহী অ্যামিবা থেকে যেমন জটিল মনুষ্যদেহ হয়েছে তেমনি মাতৃগর্ভে নিষিক্ত জীবকোষ ক্রমশ কোষবিভাজন পদ্ধতিতে বহুগুণিত হতে হতে, শেষে মানবদেহের রূপ গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক উদ্‌বর্তন ক্রিয়ার যেখানে যুগযুগান্ত লেগেছে এককোষদেহী থেকে বহুকোষদেহীতে পরিণত হতে সেখানে সেই সমস্ত পথটাই মানুষকে পরিভ্রমণ করে আসতে হয়, মাতৃগর্ভে

কয়েকটি মাসের মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষ তার জন্মকালে যেন জাতিগত উদ্বর্তনের সুদীর্ঘ পথটি একবার করে অতিদ্রুত পুনরাবৃত্তি করে আসে। তাই এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয়েছে পুনরাবৃত্তিবাদ।

এইখানে শেষ হল জৈবজীবনের পুনরাবৃত্তি। শুরু হল সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরাবৃত্তি।

সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তি—শিশুর মানসিক বিকাশে তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। গুহাশ্রয়ী একক বন্য অবস্থা থেকে আজকের এই সুসভ্য অবস্থায় আসতে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে মানুষকে। সেই সকল অবস্থারই সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি ঘটে নবজাত শিশু থেকে পরিণত মানুষের অবস্থায় আসতে।

বন্য অবস্থায় মানুষের মানসিক গঠন যেমনটি ছিল তারি সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়াটি আমরা দেখতে পাই শিশুদের মধ্যে, তখনও মানুষের উচ্চতর মানসিক বৃত্তির উদ্ভব ঘটেনি। আবার আদি মানুষের ব্যবহার যেমন প্রধানতঃ সহজাত প্রবৃত্তিজ ও স্বতঃস্ফূর্ত শৈশবের ব্যবহারও তাই।

এই সময়ে তাদের উভয়েরই কর্মপ্রচেষ্টার মূল প্রেরণা একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি। মানুষের মনে তখনও চিন্তাভাবনা-যুক্তির উদ্ভব ঘটেনি, কেবলমাত্র ভাবাবেগের দ্বারাই সে তখন চালিত। শিশুদের মতই আদিম বন্য মানুষ খেলনা ভালবাসে। ঝকমকে জমকাল জিনিস, চকচকে কড়া রঙ, ঝমঝমে ঝঙ্কার তাদের ইন্দ্রিয়ানুভুতিকে বেশী আকর্ষণ করে। নিজের দেহকেই রঙচঙ দিয়ে সাজাতে চায়। নানা রকম ছবি এঁকে নাচ গান হল্লা করে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে চায়। ভূত পেত্নি, দৈত্যদানার অবাস্তব কল্পনা তারা বাস্তব পদার্থের মতই সত্য বলে বিশ্বাস করে। ভয় ভালবাসা ও ক্রোধ, এই তিনটি আবেগই তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা যায়। শিশু তার আদি পুরুষের মতই একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও নিষ্ঠুর, তাদের মতই সে আরাম বেদনা (pleasure and pain) নিন্দা প্রশংসা এবং পুরস্কার তিরস্কারের দ্বারা চালিত হয়। এককথায় মানুষের শৈশবকাল যেন মনুষ্য জাতিরই শৈশবকাল।

স্ট্যানলি হল্ তাঁর খেলার পুনরাবৃত্তি মতবাদে দেখিয়েছেন খেলার ছলে ছেলেরা কেমন করে সেই আদিজীবনের আনন্দময় দিনগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

আদিম বন্য অবস্থা থেকে মানুষ যেমন ক্রমশ এগিয়ে এসেছে—শিকার-নির্ভর জীবনে, যাযাবর জীবনে, পশুপালকের জীবনে, তারপর কৃষিজীবনের

মধ্যে দিয়ে বর্তমানের শিল্পপ্রধান যান্ত্রিক জীবনে. শিশুও তেমনি জীবনায়নে শৈশব-কৈশোর, বাল্য বয়ঃসন্ধির মধ্যে দিয়ে পরিণত মানুষে এসে উপনীত হয়েছে। বন্যজীবনের সঙ্গে শিশুজীবনের ক্রমোন্নতির ধারা যেন সমান্তরাল ভাবেই এগিয়ে চলেছে।

কৃষ্টি বিবর্তবাদ— (Culture Epoch Theory)

এই সত্যের উপর নির্ভর করে রেন এবং জিলার শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষ্টি বিবর্ত-বাদের (Culture Epoch Theory) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মতে বলা হয়েছে, সভ্যতার পথ অনুসরণ করে চলতে চলতে তার বিভিন্ন স্তরে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রণালী অনুসরণ করে এসেছে শিশুকেও সেই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করে শিক্ষা দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শিশুকালের পাঠ্যে রূপকথা বা ঐ জাতীয় আজগুবী কল্পনার কাহিনী থাকলে শিশুমনকে তা সহজেই আকর্ষণ করবে। তারপর নানাপ্রকার অভিযান-মূলক কাহিনী এবং অভিযান ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এইপ্রকার জাতিগত জীবনে যে যে ভাবের ছাপ পড়েছে, শিশুর ব্যক্তিগত জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে শিক্ষার প্ররোচনা বা উদ্দীপনা হিসাবে তাতে সবচেয়ে বেশী ফল পাবার সম্ভাবনা। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবন যেন আগাগোড়া সমান্তরালভাবেই চলে এসেছে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্য এই মতের চমৎকারিত্ব আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে এর মধ্যে অনেক ত্রুটিও দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথমতঃ, আদিম মানুষের যৌনআবেগ বিপুল কিন্তু শিশুদের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। সভ্য মানুষ অপেক্ষা আদিম মানুষের শারীরিক শক্তি ছিল অনেক বেশী। মানুষ যত সভ্যস্তরে এগিয়ে এসেছে ততই তার শারীরিক শক্তি কমেছে। কিন্তু শিশুদের বেলায় দেখা যায় এর বিপরীত।

আসল কথা হল, পুনরাবৃত্তি মতবাদে বংশগতির উপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশের উপর তা দেওয়া হয়নি, অনুমান করা হয়েছে অতীত জীবন ধারার প্রভাবটি বংশগতি মাধ্যমে একেবারে স্থিরনির্দ্দিষ্ট রূপ দিয়ে দেখা দেয় শিশুর জীবনে। পরিবেশ তার বিশেষ কোন পরিবর্তনই করতে পারে না।

প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে জাতিগত জীবনের ছাপটি একেবারে দৃঢ় ভাবে পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে বংশগতির মাধ্যমে। পরিবর্তনশীল

পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করলে পুনরাবৃত্তির বাঁধা পথটা আর ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু সত্যই কি পরিবেশের প্রভাব এতই নগণ্য ?

'বংশগাত ও পরিবেশ' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি বংশগতি জাতকের উন্নয়নের একটা সীমা নির্দেশ করে দেয় বটে কিন্তু সেই সীমার মধ্যে কে কতটা বাড়বে সেটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশগতি যে মানসিক সামর্থ্যের সীমা বেঁধে দেয় তার কতটুকু কাজে লাগবে বা না লাগবে সেটা ত নির্ভর করবে পরিবেশের উপর। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে আমরা বলতে পারি গুহাবাসী আদিম মানুষের উপর বিচিত্র পরিবেশের প্রভাব পড়ে তাকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে এসেছে সভ্য মানুষের দিকে। নবজাত শিশুর উপরও পরিবেশের প্রভাব পড়ে তাকে উন্নতির পথে নিয়ে চলে। কিন্তু এই দুই পরিবেশ ত এক নয়, তাদের প্রভাবও নিশ্চয়ই এক ধরনের হবে না। তাহলে বন্য মানুষের জীবনধারা ও সভ্য শিশুর জীবনধারা একই সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাবে কিসের প্রেরণায় ? কি সেখানে সাধারণ উদ্দীপক ?

সুতরাং এই পুনরাবৃত্তি মতটার কিছু অংশ সত্য এবং বাকীটা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের জীবনে অনেকখানি পূর্বপুরুষদের ছাপ রয়ে গিয়েছে। জৈবজীবনেও পূর্বতন জীবকূলের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে সেই জীবন অতীত জীবনের অন্ধ অনুবৃত্তি মাত্র নয়। পরিবেশের প্রভাবে তার পথ পরিবর্তনীয়।

সুতরাং রেন ও জিলার এই পুনরাবৃত্তিবাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে কৃষ্টি-বিবর্তবাদ রচনা করেছিলেন সেটাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে বাধা আছে। শিশুশিক্ষার পাঠক্রম রচনায় জাতিগত প্রগতির ধারাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে বরং নীতি হিসাবে কয়েকটা মৌলিক নির্দেশ গ্রহণ করতে পারি। বন্য মানুষের অবস্থা থেকে সভ্য মানুষের অবস্থার উপনীত হবার মূল কথা হল, সরলতা থেকে জটিলতা (from simple to complex)— কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি মানসিক ক্ষেত্রে। তাই শিশুশিক্ষার নীতি হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি কয়েকটি নির্দেশনা—সরল থেকে জটিল (from

simple to complex), বাস্তব থেকে কাল্পনিক (from real to imaginary), বিশেষ থেকে সাধারণ (from particular to general), তথ্য থেকে তত্ত্ব from concrete to abstract) ।

শিশুশিক্ষায় এই মূল নীতিগুলির মধ্যেই কৃষ্টি-বিবর্তবাদের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু রয়েছে তাকে আজ সত্য বলে সকল শিক্ষাবিদই মেনে নিয়েছেন।

———

জীবনায়ন

(Stages of development)

জীবনের পথ পরিক্রমা—

মানব শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকে বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা অর্জন করতে করতে জীবনের পথে এগিয়ে চলে, তারপর মৃত্যুর দ্বার দিয়ে একদিন অকস্মাৎ এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই জীবনায়নের পথে মানুষ একান্ত অসহায় শিশু অবস্থা থেকে শুরু করে ক্রমশ পূর্ণ পরিণত মানুষের অবস্থায় এসে উপনীত হয়; মানসিক ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্য ক্রমশ পুষ্টিলাভ করে।

শিশুর পাঠক্রম নির্ধারণ করতে গেলে তার এই শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়সে তার মানসিক গঠন বিভিন্ন প্রকার, শক্তি সামর্থ্য ও রুচি বিচিত্রতর। —শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার স্তরবিন্যাস শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার ক্রমপরিণত স্তর অনুসারেই গঠিত হয়।

জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মানবের এই জীবৎকালকে রুশো চারিটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের জন্য বিভিন্নপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল (infancy) ; পাঁচ থেকে বার বৎসর পর্যন্ত বাল্য (childhood) ; বার থেকে পনের বৎসর পর্যন্ত বয়ঃসন্ধি বা প্রাক্ কৈশোর (early adolescence) এবং পনের থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত কৈশোরোত্তর (late adolescence) কাল।

প্রত্যেকটি অংশের জন্য তিনি স্বতন্ত্র পাঠপদ্ধতির কথাও বলে গিয়েছেন। পরবর্তী কালে অবশ্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানবিদগণ বিভিন্নভাবে মানবজীবনের স্তর ভাগ করবার চেষ্টা করেছেন। ডঃ আর্নেষ্ট জোনস্‌এর মতে মানবজীবন চারিটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত, যথা—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তর শৈশব (infancy), তারপর দ্বিতীয় স্তর বাল্যকাল (childhood) দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্যন্ত, তৃতীয় স্তর কৈশোর (adolescence) অষ্টাদশবর্ষ পর্যন্ত এবং শেষ স্তর পূর্ণ-বয়স্ককাল (adult) অষ্টাদশবর্ষ বয়স থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ডঃ জোনস্ ছাড়া আরো অনেকে নানাভাবে এই স্তরভাগ করবার পরিকল্পনা করেছেন তবে ডঃ জোনসের স্তরবিন্যাসই মোটামুটিভাবে আমরা গ্রহণ

করতে পারি। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানবের এই জীবৎকাল চারটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত—**শৈশব** (infancy), **বাল্য** (childhood), **কৈশোর** (adolescence) এবং **পূর্ণবয়স্ক** (adult)। এই চারিটি অংশের মধ্যে প্রথম তিনটি নিয়েই শিক্ষা-বিজ্ঞানের কাজ, কারণ মানুষ পূর্ণবয়স লাভ করার প্রাক্কাল পর্যন্ত শিক্ষালয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে থাকে।

সুতরাং এই কয়টি অংশের মানসিক পরিণতির বৈশিষ্ট্য ও তজ্জনিত পাঠক্রম ও পঠনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এইখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

শৈশব (infancy)—

মাতৃগর্ভের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ থেকে শিশু পৃথিবীর এই শব্দবর্ণগন্ধময় বিপুল সমারোহের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে। চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বিচিত্র উত্তেজনা শিশু-চিত্তকে নিরন্তর আঘাত করতে থাকে। এই আঘাতের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া তখনও শিশু শেখেনি। কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের অঙ্গ সঞ্চালনের কৌশলটি শিশু ক্রমশ আয়ত্তে এনেছে—এছাড়া আর কোন অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর জানা নেই। জন্মের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শের প্রাথমিক অনুভূতিগুলি শিশুর আয়ত্তে আসে, তারপর আসে দেখা শোনা এবং পেশী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রভৃতি উচ্চতর অনুভূতি। এই সময়ে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর, তারপর বেশ কিছুকাল বাদে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ক্রমশ শিশু লক্ষ্য করে একটি বিশেষ ব্যক্তি তাকে আদর করে, খেতে দেয়, একটি বিশেষ ধরনের রঙ্গীন খেলনা তার হাতের কাছে দেখতে পায়, দোলনা বা কোলের মৃদু দোলানি তাকে আরাম দেয়, ঘুম পাড়ানিয়া গানের একটানা সুর তাকে আনন্দ দেয়। ক্ষুধার অস্বস্তি, পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গের দংশন জ্বালা, হঠাৎ আঘাত লাগার বেদনা—তাকে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এমনিভাবে শিশুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমশ ভরে উঠতে থাকে; দু'একটা করে অভ্যাস আয়ত্তে আসে। নূতন নূতন জিনিস শিক্ষা করে শিশু—শেখাটা চলে অবশ্য 'চেষ্টাভ্রান্তির নীতি', (trial and error method) অনুসরণ করে।

এইভাবে একান্ত **নিকটতম পরিবেশ** থেকে শুরু হয় শিক্ষার কাজ। জড়

ও জীবের পার্থক্য তখনও সে বুঝতে শেখেনি, একটা বেড়ালের বাচ্চা আর একটা কাঠের পুতুল দুটোই তার কাছে সমপর্যায়ের। মা ও ধাত্রীর পার্থক্য তার কাছে বড় নয়। পার্থক্য শুধু আনন্দ ও বেদনা ঘটিত বিভিন্ন অনুভূতির।

ভাললাগা মন্দলাগার (pleasure & pain principle) **মাপকাটি** দিয়েই শিশু তার অজানা জগৎকে বিচার করছে।

এই অবস্থায় মানব শিশুর সঙ্গে ইতর প্রাণীর বড় বেশী পার্থক্য নেই, কারণ উভয়েই তখন একমাত্র **সহজাত প্রবৃত্তির** (instinct) তাড়নায় চলে। ইতর প্রাণী সাধারণতঃ এই স্তরেই থেকে যায়; আর মানবশিশু ক্রমশ তার সহজাত প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরিয়ে তাকে জয় করতে শেখে।

তিনচার বৎসর বয়স থেকেই শিশুমনে একটা আত্মপর বোধ জাগতে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে চেতন শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। আত্মপর বোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু একান্তভাবে হয়ে পড়ে **আত্মকেন্দ্রিক**। জগতের সবকিছু যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘটছে। সে চায় সবাই তাকে আদর করুক, সকলের মনোযোগ তার দিকেই কেন্দ্রীভূত হ'ক, সকলেই তার হুকুম পালন করুক। এক কথায় মানবশিশু একান্ত স্বার্থপর। সে একটি ক্ষুদে ডিক্টেটর, বাপমায়ের ভালবাসার উপরেও সে একাধিপত্য অধিকার চায়। তাই ভাই বোনদের উপরে তার হিংসা, মাতৃস্নেহের ভাগীদার বলে।

এই আত্মকেন্দ্রিকতার চরম পরিণতি **আত্মপ্রেম** বা **আত্মরতি** (auto erotic)। শিশু আপনার প্রেমে আপনি মুগ্ধ, নিজেকেই সে সবচেয়ে ভালবাসে এই প্রবৃত্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে নার্শিসিজম (Narcissism)। গ্রীক পুরাণের আত্মপ্রেমমুগ্ধ নার্শিসাসের কাহিনী থেকেই এই আত্মরতিজাত প্রবৃত্তিটির নামকরণ।

শিশুপ্রকৃতি এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে **অন্তর্মুখী** (introvert)। বাইরের লোকের সঙ্গে বড় বেশী মেলামেশা সে করতে চায় না। শিশুমনের এই অন্তর্মুখীনতার কারণ সম্ভবতঃ দুইটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির যুগপৎ তাড়না। আগেই বলেছি শিশু হল ক্ষুদে ডিক্টেটর, তার ক্ষুদ্রজগতের সব কিছুই যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘটে এই হল তার ইচ্ছা। সবকিছুর মধ্যেই সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়, প্রবৃত্তির মধ্যে **আত্মপ্রসারেচ্ছা** (Self assertion) হয় প্রবল। কিন্তু বাইরের রূঢ় বাস্তবজগতে তা ত সম্ভব হয় না, প্রতিপদেই তার এই আত্মপ্রসারেচ্ছা বাধা পায়। জেগে ওঠে বিপরীত প্রবৃত্তি **আত্মবিলোপ**

(Self abasement)। তাই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে শিশু বাস্তব জগত থেকে সরে কল্পনার জগতে গিয়ে প্রবেশ করে, কারণ সেইখানে সে ইচ্ছামত আত্মপ্রসারের সুযোগ পায়। কল্পনার জগতের মাঝখানে বিরাজ করে শিশু স্বয়ং। ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে মাকে উদ্ধার করে, কখন বা রামের মত বনবাসে যায়, সঙ্গে যায় তার মা, কখনও হয় বিড়ালছানার কানাই মাষ্টার, কখনও বা গলির মোড়ের ফেরিওয়ালা। মেয়েরা খেলাপাত ঘরকন্নার ধুলোমাটির ভাত তরকারি রাঁধে, পুতুলের বিয়ে দেয়; বাস্তব জগতের অনুকরণ করে কল্পনার জগতে। এই জাতীয় খেলার নাম দেওয়া হয়েছে **কল্পনা-বিলাসের খেলা** (make believe play)। রবীন্দ্রনাথের শিশুকালের এই মনোভাবটি সুন্দরভাবে তিনি লিখেছেন তাঁর ছেলেবেলা গ্রন্থে— "—একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে 'আমার অচল' পাল্কি। হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলেছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখন বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে গা করছে ছম ছম।……তারপর একসময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ুরপঙ্খি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ঃ ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, 'সামাল, সামাল, ঝড় উঠল—"

এই বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য **পুনরাবৃত্তি** বা জানা পথে (routine and repetition tendency) চলবার প্রবৃত্তি। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা নূতন বন্ধু করতে চায় না, নূতন খেলা খেলতে চায় না, পুরানো গান পুরানো ছড়া পুরানো সুর বারবার পুনরাবৃত্তি করতেই বেশী আনন্দ পায়। নূতনের অভিযান অপেক্ষা পুরানোর পুনরাবৃত্তির ইচ্ছাটি শিশুমনের অন্তর্মুখিতা থেকেই উদ্ভূত হয়। নূতনের অভিযানে নূতন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন করে চলতে হয়। শিশু-মন তখনও তার জন্য তৈরি হয়নি।

অনুকরণ প্রবৃত্তি এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে শিশুর ব্যবহারে। খেলাধূলা চলাফেরা সবকিছুর মধ্যে দিয়েই শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে চলতে চায়। মেয়েদের ঘরকন্না করা বা ছেলেদের মাষ্টার হয়ে রেলিং-ছাত্রকে পড়ান— এ'সবই হল বড়দের আচরণের অনুকরণ।

আর একটি বড় প্রবৃত্তি এই সময়ে দেখা দেয়—সেটি **অদম্য কৌতূহল**। বাবা হয়ত একটা বড় কলের পুতুল কিনে এনে ছেলেকে দিলেন। ছেলে সেটা কোথায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে—তা নয়, কিছুক্ষণ পরেই হয়ত দেখা গেল পুতুলটি সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। ছেলের ছেলেমিতে নিশ্চয়ই বাবার রাগ হবে। কারণ আমরা ভুলে যাই যে শিশুমনের সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তি হল কৌতূহল। তার জন্যেই শিশু সবকিছু নিজে হাতে করতে চায়, ভাঙ্গতে চায় আবার ভেঙ্গে গড়তে চায়; জানতে চায় প্রত্যেকটি 'কি কোথায় কেন'র জবাব।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই কৌতূহল প্রবৃত্তিই হল শিক্ষকের প্রধান সম্পদ। কৌতূহল নিবৃত্তির প্রসঙ্গেই নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিশু। অনেক সময় হয়ত অহেতুক কৌতূহলের প্রশ্নবন্যায় পিতামাতা অভিভাবক শিক্ষক উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। তবু এ'কে কখনও জোর করে চেপে দেবার চেষ্টা করতে নেই। যতদূর সম্ভব ধীরভাবে শিশুমনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের এই শৈশবকালই হচ্ছে শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাল, এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিনিচয় নমনীয় ও পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহজেই ইচ্ছানুসারে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাই সুঅভ্যাস গঠন করা এই সময়ে যত সহজে সম্ভব এমন আর কোন কালেই নয়। এই সময়ই হল শিশুর সর্বাঙ্গীন গঠন কাল। চরিত্রবান সুনাগরিক হিসাবে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে এই সময়ের শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

এই বয়সে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের (Abstract knowledge) কোন মূল্য নেই। যে কোন ঘটনাই হোক শিশু তাকে তার **নিজের অভিজ্ঞতার স্তরে** এনে তবেই তাকে গ্রহণ করবে। ইতিহাসের গল্পে যত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী শিশু শুনুক, তার নিজের তৈরি প্যাকাটির তীরধনুক নিয়ে খেলাপাতির শিকার কাহিনী তার কাছে ঢের বেশী উত্তেজনাকর।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—জগতের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশুর যোগাযোগ সবে শুরু হয়েছে। তাই নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বেলায় যত **অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার** করা যায় অভিজ্ঞতাটি ততই শিশুর আয়ত্তে আসে। এই বয়সের শিক্ষা পদ্ধতিতে এই তথ্যটি বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

এই বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য **কর্মকেন্দ্রিকতা**। সবকিছু সে নিজের হাতে গড়তে চায়, সে স্রষ্টা। সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে দিয়ে তার আত্মপ্রসার ঘটে। বড়রা অনেক সময়ে শিশুদের অপটু হাতের কাজে সাহায্য করে কাজটাকে সুন্দর করতে গিয়ে শিশুদের বিরক্তিভাজন হয়। আমরা শিশুদের ভুল বুঝি—কাজটা সেখানে বড় নয়, করাটাই বড়।

শিশুশিক্ষার গোড়ার দিকটা তাই গ্রন্থাশ্রয়ী না করে কর্মাশ্রয়ী করা প্রয়োজন। ফ্রয়েবল্ ও মাদাম মন্তেস্বরী উভয়েই শিশুশিক্ষাকে কর্মাশ্রয়ী করবার পরিকল্পনা করেছেন। ফ্রয়েবলের শিক্ষার উপকরণ Gifts & occupations এবং মাদাম মন্তেস্বরীর Diadetic apparatus এই উদ্দেশ্য নিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছে; এবং ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিশুশিক্ষার জগতে যুগান্তর এনেছে।

বাল্যকাল (Childhood)

পাঁচের পর থেকে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণতঃ বাল্যকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই সীমারেখার কিছু অদলবদল হতে পারে।

শৈশবকাল যদি ভালভাবে সুনিয়ন্ত্রাধীনে অতিবাহিত হয় তবে বাল্যকালের সকল সমস্যারই স্বাভাবিক সুসমাধান হয়ে থাকে।

শিশুকালে যে কৌতূহল-প্রবৃত্তির উন্মেষ, বাল্যকালে তা পূর্ণ বিকশিত। বৈচিত্র্যময় জগতের সব কিছু দেখেই সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সব কিছুর কারণ জানতে তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তাই এই সময়ে কৌতূহল নিবৃত্তির প্রচেষ্টাই হল শিক্ষার মূলকথা—

এই স্তরে আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে—সেটি হল **যুথবদ্ধতা** (Gregariousness)। আত্মকেন্দ্রিক শিশু এইবার সংঘচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা একলা থাকতে ভালবাসে না, সব সময়ে সমবয়স্কদের সঙ্গে মিলেমিশে বেড়াতে চায়, ক্লাব সমিতি দল সংঘ ইত্যাদি গড়তে চায়।—শুধু তাই নয়, সংঘ-সমিতির প্রভাবও বালকের উপর পড়ে অপরিসীমভাবে। পিতামাতা অভিভাবকদের প্রভাব অপেক্ষা দলের প্রভাব তার উপর বেশী। অন্তর্মুখী শিশু এবার বহির্মুখী বালকে রূপান্তরিত হয়। সব সময়েই সে নিজেকে দলের একজন বিশ্বস্ত সভ্য হিসাবে জাহির করতে চায় এবং দলের লোকেদের কাছে বাহাদুরি দেখাবার লোভও হয়ে ওঠে

দুর্দমনীয়। এ সময়ে সঙ্গীদের নির্দেশ তার কাছে বেদবাক্য। পিতামাতা গুরুজনদের আদেশ অবহেলা করেও তারা সঙ্গীদের কথা মেনে চলতে চায়।

এটা অবশ্য আত্মবিস্তার (self assertion) প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শৈশবের আত্মপ্রচার ও আত্মবিলোপের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে এই বয়সে আত্মপ্রচার প্রবৃত্তিই বড় হয়ে ওঠে। আত্মপ্রচার ত একা থাকলে হয় না, সেজন্য অনুরাগী দল চাই। পাঁচজনের সামনে কৃতিত্ব দেখতে না পারলে ত বাহাদুরি হয় না, তাই ছেলেরা এ'সময়ে দলগত প্রাণ হয়ে পড়ে।

এই বয়সে শিক্ষার পদ্ধতিতেও সংঘপ্রিয়তার সুযোগ নিলে ভাল হয়। খেলাধূলা, ব্যায়াম, শিক্ষাভ্রমণ (Excursion), বিতর্ক সভা, অভিনয় প্রভৃতি এই বয়সের শিক্ষার আনুসঙ্গিক (Co-curriculum) হিসাবে খুবই উপকারী। শিক্ষাপদ্ধতিতেও প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method) এই সময়ের উপযোগী।

সংঘপ্রিয়তা থেকেই বালকের মনে সূচিত হয় গণমনের (Group mind) লীলা। বালক যখন একা থাকে বা বাড়ীতে পিতামাতার কর্তৃত্বাধীনে থাকে তখন যে কাজ করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, দলে পড়ে সেই কাজ সে একান্ত অবহেলায় করে ফেলে। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে দলবেঁধে কোন কিছু করবার দিকে তার ঝোঁকটা হয় বেশী। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাই ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে বালক শেষে আদর্শ সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

শিশুকালে যেমন সে তার নিজের ভাললাগা মন্দলাগার মাপকাঠিতে জগতের সবকিছুর মূল্য নির্ণয় করত, বালককালে তেমনি দলের নিন্দাস্তুতির মাপকাঠিতেই সে সব বিচার করে দেখতে শুরু করে।

সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না ক্রমশ কমে আসে, অর্থাৎ পূর্বের মত আর নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। ধীরে ধীরে সেগুলির উদ্বর্তন শুরু হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বালক ক্রমশই সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হতে শিখেছে।

কৈশোর (**Adolescence**)

মানুষের জীবনকে যে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হল তার মধ্যে এই কৈশোরকালটাই হল সবচেয়ে জটিল ও সমস্যামূলক। বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী এই সময়টা ঠিক কোন বয়সে আবির্ভূত হয় এবং কতদিন থাকে সেবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে

এই কৈশোরকালের আবির্ভাব তিরোভাবের সময়ের অনেক বিভিন্নতা ঘটে থাকে। তবে সাধারণতঃ বারোর পর থেকে আঠার বছর পর্যন্ত কৈশোরকাল বলে ধরা যেতে পারে। অনেকে আবার এই কালটিকে দুটো উপবিভাগে ভাগ করেন—প্রাককৈশোর (early adolescence) ১২-১৮ বৎসর, এবং কৈশোরোত্তর (late adolescence) ১৮-২৫ বৎসর কাল। অর্থাৎ প্রকৃত কৈশোরকালের উভয় দিকের কয়েকটা বছর জুড়ে কৈশোরোচিত ভাব দেখা যায়।

যাই হোক, কৈশোরকালের শারীরিক ও মানসিক গতি প্রকৃতি নিয়ে বহু মনোবিজ্ঞানবিদ বহুভাবে গবেষণা করেছেন। ষ্ট্যানলি হল ত এই সময়টাকে ঝড় ঝঞ্ঝার (Storm & Stress) কাল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ বা এ'কে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের কাল (Strain and Strife) বলেছেন। বালক এতকাল যে পথে চলে আসছিল অকস্মাৎ তার মোড় ফিরল পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিকে।

এক ধরনের মানসিক গতি প্রকৃতি চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছিল বালক, অকস্মাৎ যেন সব উলট পালট হয়ে গেল। অপরিণত বাল্যজীবন ও পরিণত যুবকজীবন, এই দুয়ের মধ্যে যেন জোড় মেলান হয় এই সময়টাতে। তাই এ'সময়ের মনস্তত্ত্ব জটিল, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সমস্যামূলক, চিন্তাভাবনার গতি দুর্জ্ঞেয়। দেহমনের দুইকূল ছাপিয়ে যৌবনজলতরঙ্গ অকস্মাৎ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যে জীবন তরণীর হাল ঠিক রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞ নাবিকের হাতে নৌকোর হাল থাকলে জোয়ারের টানে যাত্রা সুগম হয়, কিশোরের নবজীবন সফলতার স্বর্ণ উপকূলে সহজেই এসে উপনীত হতে পারে।

তাই হ্যাডো কমিটির রিপোর্টে প্রথমেই কিশোর বয়সের এই সম্ভাবনাকে এত বড় করে বলা হয়েছে—বার তের বছর বয়স থেকেই কিশোরদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এরই নাম কিশোরকাল। এই জোয়ারের মুখে স্রোতের অনুকূলে যদি নবজীবনের যাত্রা শুরু করা যায় তাহলেই সৌভাগ্যের কূলে গিয়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। ["There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of eleven or twelve. It is called by the name of adolescence. If that tide can be taken at the flood, and a new voyage

begun in the strength and along the flow of its current, we think that it will move on to fortune."—The Hadow Committee's report on "The education of the adolescence."]

যাইহোক এই বয়ঃসন্ধিকালে দেহমনের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে বালক অনেক সময় তাল রেখে চলতে পারে না। কার সঙ্গে কিভাবে কতটুকু মেলামেশা করতে হবে, কখন কি আচরণ করতে হবে, কিশোর কিশোরীরা অকস্মাৎ তার কোন দিশা পায় না।

'ছুটি'-গল্পের নায়ক ফটিকের বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বয়সী ছেলেদের দুর্দৈবের কথা সুন্দরভাবে লিখেছেন "—তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকমি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে, লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশবের এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু সেই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে-মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোন-এক শ্রেষ্ঠ

স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়—"

আগেই বলেছি—বয়ঃসন্ধিকালে দেহ ও মন উভয় স্তরেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। অতঃপর এই স্তরগুলির আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা যেতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক **দৈহিক পরিবর্তনের কথা**—

অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ডের মতে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তনটা অন্ততঃ দু'বছর পূর্বেই শুরু হয়ে যায়। ওজন আর উচ্চতার দিক দিয়েও মেয়েরা এই সময়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। [As the pre-pubertal acceleration of growth takes place some two years earlier in girls than in boys, early adolescence witnesses the phenomenon of a feminine superiority with regard both to height and weight.—Sandiford]

এই সময়ে ছেলেমেয়েরা অকস্মাৎ অনেকখানি লম্বা হয়ে পড়ে। দ্রুত অস্থিবৃদ্ধির ফলে হাত পা-গুলো হয় বেতর লম্বা, আকৃতি হয়ে যায় রোগা ঢেঙ্গা। পেশীতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়, অস্থি হয় ক্রমশ পুষ্ট, ফুসফুসের আয়তন বাড়ে, শক্তিশালী হয়। শ্বসনতন্ত্র, রক্তসংবাহনতন্ত্র, পাচনতন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি তন্ত্রের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই এই সময়ে তাদের প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান ঠিক না রাখলে পরবর্তী জীবনে অপুষ্টিঘটিত ও ক্ষয়জনিত নানাবিধ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই সময় থেকেই কিশোরকিশোরীদের যৌনজীবনের প্রত্যক্ষ স্ফুরণ ঘটে। কিশোর দেহে গুম্ফ শ্মশ্রুর আবির্ভাব হয়, কিশোরীদের মাসে মাসে ঋতুমতী হবার নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, স্তনোদ্গম শুরু হয়। বালকদের কণ্ঠস্বর এ সময়ে হঠাৎ বিকৃত হয়ে পড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়। শিশুকালের কোমল কণ্ঠস্বর যৌবনকালের পরুষ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন করবার জন্যে স্বরযন্ত্রে ভাঙ্গাগড়া চলে এ'সময়ে। সেইজন্য গলার স্বর সাময়িকভাবে বিকৃত হ'য়ে যায়।

অতঃপর মানসিক পরিবর্তনের কথা—

এইভাবে দেহের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করা গেল, মনের ক্ষেত্রে তা আরো বৈপ্লবিক। সবচেয়ে বড় কথা **যৌনচেতনার অরুণোদয়** এই সময়ে মনের দিগন্তকে রঙীন করে তোলে। বিপরীতলিঙ্গের প্রতি একটা অহৈতুক আকর্ষণ অনুভব করে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলরহস্যের প্রতিও একটা অনুসন্ধিৎসা জাগে মনে। কিন্তু তাদের মনের এই গোপন যৌনজিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর পায় না সমাজে। সর্বত্রই একটা চাপা চাপা লুকোছাপা ভাব, তাই অনেক ক্ষেত্রেই তারা একটা কাল্পনিক উত্তর মনগড়াভাবে তৈরী করে নেয়; কখনও বা বদছেলেদের সংস্পর্শে এসে মিথ্যা অসামাজিক পথে পা বাড়ায়।

এই সময়ে অভিভাবকদের অত্যন্ত সতর্ক ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা দরকার। অজ্ঞাত একটা নূতন অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্তে এসে একান্ত ভীত-বিহ্বল চিত্তে সকলের কাছে সে চায় একটু স্নেহ-ভালবাসা সহানুভূতি। এরই অভাবে অনেক ছেলে সারাজীবনের মত নষ্ট হয়ে যায়। বদছেলেদের পাল্লায় পড়ে একেবারে সমাজবিরোধী চরিত্রহীন গুণ্ডাশ্রেণীর (Juvenile delinquent) দলভুক্ত হইয়া পড়ে।

কিশোর কিশোরীরা এ'সময়ে আবার শিশুদের মত **অন্তর্মুখী** হয়ে পড়ে। বাল্যের দল বা সংঘের কর্মমুখর প্রভাব ক্রমশ ঘুচে গিয়ে বালক আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ে। নানারকম আজগুবী পরিকল্পনা তাদের মাথায় সব সময়েই আলোড়িত হতে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কিশোরকালকে তাই দ্বিতীয় শিশুকাল (Second childhood) বলে মনে করা হয়ে থাকে। কৈশোরকাল যেন শৈশবের পুনরাবৃত্তি।

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের কখনও কর্মহীন অবস্থায় একমুহূর্ত বসে থাকতে দিতে নেই। সব সময়েই কোন না কোন মানসিক বা শরীরিক শ্রমের কাজে তাদের নিযুক্ত রাখতে হয়। অনেকে মনে করেন 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' প্রবাদটি এই বয়সের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিশোরবয়সের কর্মহীন অলস মুহূর্তগুলি অস্ফুট যৌনকামনার রঙ্গীন নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে সন্দেহ করে অনেকে কিশোরকে সবসময়েই কর্মব্যস্ত রাখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অবসর বিনোদন মাত্রই যে কিশোর বয়সে সর্বনাশ ঘটিয়ে দেবে এমন কথা মনে করবার কোন

কারণ নেই। বরং নানারকম নির্দোষ খেলাধূলা, বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular activities), ছবি আঁকা, গানগাওয়া, বাগানকরা, অভিনয় করা ইত্যাদি আনন্দবর্ধক: কাজের মধ্যে কিশোর-মনকে-নিযুক্ত রাখলে ফল ভালই হয়। শিক্ষকের বা অভিভাবকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে এই সকল খেলাধূলায় বালকেরা অংশ গ্রহণ করবে, এবং সেই সঙ্গে যূথবদ্ধতা, সংগঠনী, যোধন, আত্মপ্রচার, সঞ্চয়, কৌতূহল প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সার্থক উদ্বর্তন ঘটতে পারবে।

এই সময়ে বালকের স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় কারণ এইটেই হল দেহ গঠনের কাল। বিশেষতঃ স্নান আহার শয়ন নিদ্রা পরিমিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া দরকার।

[Close attention must be paid to see that the scholars obtain a sufficient quantity of sleep on suitable bedding, live in fresh air, bathe frequently and wear loose hygenic clothing. —Sandiford—]

দেহ ও মনের এই অসাম্য অবস্থায় বালককে অত্যন্ত কড়া নজরে রাখার উপদেশ দিয়েছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় মধ্যে দিয়ে বালককে মানুষ করে তুলতে হয়। পান ভোজন শয়ন ভ্রমণ বা পোষাক পরিচ্ছদ কোন বিষয়েই যেন কিছুমাত্র আরামপ্রিয়তা বা বিলাসিতার ছোঁয়াচ না লাগে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুগৃহে অবস্থানকারী শিষ্যদের কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। জন লক ত এই বয়সের বালকদের চরম কষ্টকর জীবন যাপনের কথা বলেছেন। কোন রকম মুখরোচক মসলাযুক্ত সুখাদ্য গ্রহণেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। ষ্ট্যানলি হলও কিশোর কিশোরীদের জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

[The Spartan boys, at twelve, slept on straw or hay with no cover and at fifteen slept on reeds. The body in general, and specially the head, hands and neck, should not be too warmly dressed in cold weather. Beds should be rather hard and covering should be light. Too soft beds predispose people to sensuous luxury and tempt them to remain in them long after

awakening. This is just the hour most dangerous of all—Stanley Hall.]

আগেই বলেছি কিশোরকাল হচ্ছে **শৈশবকালের পুনরাবৃত্তি**। সুতরাং এ সময়েও ছেলেমেয়েরা আবার আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। নিজের বেশভূষা পরন পরিচ্ছদের দিকে নূতন করে দৃষ্টি পড়ে। ভাল করে চুল ছাঁটা, স্নো পাউডার সাবান মাখা, নূতন ফ্যাসানের জামা জুতা পরা এই সবদিকে কিশোর কিশোরীরা অবহিত হয়ে ওঠে। মোটকথা নিজেকে বেশ করে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঁচ জনের সামনে প্রকাশ করবার ইচ্ছা জাগে এই সময়ে।

এই সময়ে মনের একটি বড় ধর্ম হল **বীরপূজা**। কিশোর কিশোরীরা মনে মনে একটা আদর্শ বেছে নেয় এবং সেই আদর্শ অনুসারে চলতে চায়। এই আদর্শ কারো হয় দেশনেতা, কারো ধর্মনেতা, কারো কোন প্রিয় খেলোয়াড়, কারো বা কোন ফিল্ম-ষ্টার। আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে কেউ বা ধর্মমূলক বা সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবন অতিবাহিত করবার সংকল্প গ্রহণ করে। কেউ বা প্রিয় খেলোয়াড় বা ফিল্ম-ষ্টারের হাবভাব পোষাক পরিচ্ছদ অনুকরণ করে চলতে চায়। কখনও বা প্রিয় শিক্ষকের চলাবলা এমন কি হাতের লেখাটি পর্যন্ত অনুকরণ করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়। এই সময়ে যে সব ছেলেমেয়ে সত্যকার বড় আদর্শের সন্ধান পেয়ে যায় জীবনে তাদেরি জীবন হয় সার্থক, আর যে দুর্ভাগা তা পায় না তারা সমাজ-বিরোধী দুষ্ট প্রকৃতি লোকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে উৎসন্ন যায়।

নীতিবোধ ও ধর্মবোধ স্বাভাবিকভাবেই এ সময়ে মনকে প্রভাবিত করে। এটাও অবশ্য বীর-পূজারই নামান্তর। তার ফলে এই সময়ে কোন কোন ছেলে উৎকট ধর্মবায়ুগ্রস্থ হয়ে পড়ে। নানাপ্রকার ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মালোচনা ইত্যাদিতে মসগুল থাকে। কিন্তু এই ধর্মীয় ভাবাবেগ আবার ভাটার টানে সরে যায়, তখন হয়ত দেখা দেয় প্রবল নাস্তিকতা।

মোটকথা, দুই বিপরীতমুখী টানে মনের আবেগ দুই দিকেই সমান জোরে হেলে পড়তে পারে। কিশোর মন সব সময়েই বাস্তবরাজ্যকে অস্বীকার করে পলায়ন করতে চায় কল্পনার রাজ্যে। এই জাতীয় পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই সম্ভবতঃ নাস্তিকতার উদ্ভব।

পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবার জন্য মহৎ প্রেরণাও এই সময়ে কিশোরপ্রাণে স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হয়। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ, মহতের সেবায়

জীবন উৎসর্গ করবার ব্যাকুলতা কিশোর কিশোরীদের মনে দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই।

এই ভাবাবেগ-প্রধান আদর্শনিষ্ঠ অন্তর্মুখী কিশোর মনের পরিচর্যা করা যে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল কাজ তা সহজেই অনুমেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালও এই কৈশোরকাল। সুতরাং সার্থক শিক্ষক কিশোর মনের গতিপ্রকৃতি বুঝে সেই অনুসারে সহানুভূতি ও ভালবাসা সহকারে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন, অস্ফুট কলিকাগুলি পূর্ণবিকশিত পুষ্পে পরিণত করে নেবেন।

———

শিক্ষক

(The teacher)

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান

শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত—শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষনীয় বিষয়। আগেই বলেছি—এই তিনটির মধ্যে এককালে শিক্ষকেরই ছিল একাধিপত্য। তারপর শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর প্রতাপ। —এ'দুটোর চাপে শিক্ষার্থীর পাত্তাই পাওয়া যেত না। বাইরের বিশাল বিশ্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই ছিল না। জগতকে সে দেখত শিক্ষকের কোলে চড়ে পুঁথির লেখা জানালার মধ্যে দিয়ে। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে শিক্ষক তাঁর মনোমত বিষয়গুলি আহরণ করে তা'থেকে পুষ্টিকর মানসিক রসায়ন প্রস্তুত করতেন—তারপর চামচে করে সেই রসায়ন শিশুর গলায় ঢেলে দিতেন তিনি ভবিষ্যতের জ্ঞানী মানুষ তৈরী করবার টনিক হিসাবে।

শ্রেণীকক্ষে ঢুকলেই দেখা যেত উঁচু একটা মঞ্চের উপরে টেবিল চেয়ারে গম্ভীর মুখে বেত্রপাণি শিক্ষক—সামনে ভীতচকিত পাংশু-মুখ ছাত্রের দল। সুতরাং বিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চে শিক্ষকই নায়ক।

আমাদের দেশে যদিও এই অবস্থা আজও অব্যাহত, তবু বলতে হবে যুগ পাল্টেছে। —শুরু হয়েছে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক যুগ। শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত মনোযোগ আজ কেন্দ্রীভূত শিক্ষার্থীর দিকে। শিক্ষক ক্রমশ সরে যাচ্ছেন পশ্চাৎ ভূমিতে। সুতরাং মনে হতে পারে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান গৌণ। শিক্ষালয়ে শিক্ষক আজ তাঁর গৌরবময় আসনটি ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই শিক্ষার নবমূল্যায়নে শিক্ষকের মূল্য বোধহয় নিম্নাভিমুখী।

বর্তমানে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা—

কিন্তু তা নয়। বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষকের গুরুত্ব আরো অনেক বেড়েছে, দায়িত্ব হয়েছে আরো কঠিন। জাতি গঠন কার্যে শিক্ষককে এতকাল করতে হয়েছে শ্রমিকের কাজ। ঝুড়ি ঝুড়ি মূল্যবান জ্ঞানের ইট কাঠই শুধু বয়ে বয়ে জড়ো করেছে—অল্পই

তার কাজে লেগেছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের কাজ হল শিল্পীর কাজ। বুদ্ধি এবং হৃদয় বৃত্তির যুগপৎ ব্যবহারে শিক্ষক আজ প্রত্যেকটি শিশুকে জাতির দৃঢ় বনিয়াদ হিসাবে গড়ে তুলবার ভার নিয়েছেন। বিচিত্র বিশ্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথে শিশু এতকাল চলত শিক্ষকের কোলে চড়ে, আজ সে একাই চলতে চায়। শিক্ষক তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন সহজ সরল পথটি চিনিয়ে। শিক্ষার রঙ্গমঞ্চের প্রধান ভূমিকায় অভিনেতা আজ শিশু স্বয়ং একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিক্ষক হলেন সেই রঙ্গভূমির সুনিপুণ সজ্জাকর। শিক্ষক এমন কৌশলে পরিবেশ রচনা করবেন শিক্ষনীয় বিষয়ের উপযোগী সমস্ত কিছু উপস্থাপিত এবং সুসজ্জিত করবেন যাতে শিক্ষার্থী সহজেই খুঁজে পায় তার বাঞ্ছনীয় গন্তব্য পথ। একাজ গতানুগতিকভাবে বই পড়া জ্ঞান নিয়ে করা যায় না, অত্যন্ত বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে নব নব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে তবেই করা সম্ভব হয়। এই জন্যই শিক্ষককে বলা হয় পরিবেশ-নিয়ন্ত্রনকারী (manipulator of environment).

শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল শিক্ষককে বলেছেন শিশু-বাগানের মালি (gardener of the kindergarten) মাদাম মন্তেস্বরী বলেছেন পরিচালিকা (directress)। এই নূতন ভূমিকায় শিক্ষককে অনেক জ্ঞান অভিজ্ঞতা ধৈর্য আয়ত্ত করতে হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষকের কাজ পূর্বের থেকে আরো জটিল, আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো দায়িত্বশীল। অতএব, সমাজের এতবড় সুকঠোর কর্তব্য পালনের ভার যার উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণের অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব—

শিক্ষক-সুলভ গুণগুলির কথা আলোচনা করবার পূর্বে শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

শিক্ষকের দায়িত্ব দ্বিমুখী—

ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব—

প্রথম দায়িত্ব শিক্ষকের ব্যক্তিস্বরূপের, অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ঘটিত। এই প্রভাবকেই কয়েকটি বিভিন্ন দিক থেকে আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথমতঃ—শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত পরিবেশের একটা বৃহত্তর অংশ হচ্ছেন শিক্ষক স্বয়ং। মানুষ হিসাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলির অপরিসীম

প্রভাব পড়ে তাঁর ছাত্রের উপর। শিক্ষক হলেন পিতৃকল্প বা পিতার প্রতিনিধি (father substitute)। পুত্রের উপর পিতার প্রভাবের মতই ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব।

দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষক হবেন শ্রেণীকক্ষের গণমনের (group mind) নেতা। অজ্ঞাতসারেই তিনি গণমনের উপর নিজের কল্যাণকারী প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষার্থী-সমাজকে সুপথে পরিচালনা করতে পারবেন। অনুকরণ (imitation) অনুবেদন (sympathy) এবং অনুভাবন (suggestion) মনের ত্রিমুখী বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রের মনে আদর্শের প্রতিরূপটি মুদ্রিত করে দিতে পারবেন।

তৃতীয়তঃ—শিক্ষকের জীবনাদর্শের প্রভাবেই সাধারণতঃ ছাত্রের জীবনাদর্শ গঠিত হয়। আগেকার দিনে শ্রেণীকক্ষে জ্ঞানদাতার ভূমিকামাত্র ছিল শিক্ষকের, শিক্ষার নবভাবধারায় ছাত্রের সমগ্র জীবনকেই স্পর্শ করবে শিক্ষকের প্রভাব। বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিগত প্রভাব ও অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবনকে নূতন করে গড়ে নিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের কাছ হইতেই মানুষ শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ......গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা কার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে—"

চতুর্থতঃ—বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাবিতরণের কেন্দ্র নয়। বিদ্যালয় আজ আদর্শ সমাজের প্রতিরূপ হিসাবে গৃহীত। বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ সামাজিক পরিবেশ রচনা করে শিক্ষার্থীকে সামাজিক গুণাবলি অনুশীলনের সুযোগ দিতে হয়। এই দিক থেকেও শিক্ষকের সুসমঞ্জস ব্যক্তিসত্বার প্রভাব বিশেষ কার্যকরী। বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষক সুকৌশলে শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবেন।

পঞ্চমতঃ—বর্তমান শিক্ষা কেবলমাত্র গ্রন্থনিবদ্ধ নয়। পাঠাগার, যাদুঘর, পরীক্ষাশালা, ল্যাবরেটারী, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমেও শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সুতরাং শিক্ষক সেখানে কেবলমাত্র জ্ঞানদাতা গুরু-

মশাই না হয়ে উপদেষ্টা বন্ধু হিসাবে জীবনের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে জ্ঞান সঞ্চয় করতে সাহায্য করবেন।

দ্বিমুখী দায়িত্বের অপর দিক হল তাঁর শিক্ষক-সত্বা অর্থাৎ শিক্ষকের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা ঘটিত। একেও কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

গুরু হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব—

প্রথমতঃ—শিক্ষক যে যে বিষয়ে পাঠদান করবেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান তাঁর অবশ্যই থাকবে। পাঠদান করতে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান আয়ত্তে না থাকলে পাঠদান কখনই স্বচ্ছন্দ হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যহ পাঠদান করতে যাবার পূর্বে পাঠ্য-বিষয়গুলি শিক্ষক একবার ভালভাবে আলোচনা করে নেবেন, তবেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ—মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব বিষয়ে বেড়েই চলেছে। নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব আলোচনা পুরাতন জ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত করছে। সুতরাং শিক্ষককেও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় রাখতে হবে। নইলে তিনি পুরাতনপন্থী (back-dated) হয়ে পড়বেন।

এই দায়িত্বগুলি সার্থকভাবে পালন করতে হলে শিক্ষককে যে কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণাবলির অধিকারী হতে হয়, সে কথা ত বলাই বাহুল্য।

শিক্ষকোচিত গুণাবলী (অনর্জিত বা সহজাত)

এই গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি অনর্জিত বা সহজাত এবং কতকগুলি অর্জিত। প্রথমেই সহজাত গুণের আলোচনা করি। সহজাত গুণের মধ্যে আবার শারীরিক গুণের কথাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

অনেক শিক্ষাবিদের মতে শারীরিক গুণের গোড়ার কথাই হল 'আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারি' অর্থাৎ শিক্ষককে **দর্শনধারী** হতে হবে প্রথমে। অবশ্য দর্শনধারী বলতে চিত্রাভিনেতাসুলভ সৌন্দর্যের কথা বলা হচ্ছে না। বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ হাস্যময় শক্তিশালী অথচ সুসম দেহবিন্যাস সমন্বিত চেহারা হলে ভাল। কারণ সমগ্র ছাত্রের মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হবে তাঁকে। সুন্দর সুগঠিত উন্নত দেহ সে বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। অবশ্য দৈহিক সৌষ্ঠব শিক্ষক জীবনের সার্থকতা লাভের পক্ষে অপরিহার্য

নয়। তবে বিকলাঙ্গ পঙ্গু বা ব্যাধিগ্রস্থ শরীর হলে শিক্ষকতা কার্যে বিশেষ অসুবিধা হয়, সে কথা ত বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় কথা—**কণ্ঠস্বর**। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর বেশ সুমিষ্ট অথচ সুউচ্চ হওয়া দরকার। পড়ানোর প্রধান উপকরণই হল কণ্ঠস্বর। অস্পষ্ট উচ্চারণ, তোতলামি বা আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত ভাষা ইত্যাদ পাঠ পরিচালনায় বাধাসৃষ্টি করে।

তৃতীয় কথা—**স্বাস্থ্য**। শিক্ষকের চেহারা সুন্দর অসুন্দর যাই হোক, তাঁর স্বাস্থ্যটি যে বিশেষ ভাল হবার দরকার সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষকতা কার্য শুধু মানসিক নয়, শারীরিক শ্রমসাধ্যও বটে। ছাত্রের সর্বপ্রকার ত্রুটি দূর করবার জন্য শিক্ষকের চাই নিরলস প্রচেষ্টা। তাই শিক্ষককে হতে হবে সুস্থ সবল এবং কষ্টসহিষ্ণু।

চতুর্থতঃ—শিক্ষকের **অসীম ধৈর্য সহিষ্ণুতা** এবং **সদাপ্রফুল্লিত শান্ত মেজাজ** শিক্ষকবৃত্তির বোধহয় সর্বপ্রধান গুণ। সদাচঞ্চল শিশুদের সর্বপ্রকার দুষ্টামি, পাগলামি বোকামি উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে তার মানসিক-বিকাশ সাধনের চেষ্টা করতে হবে শিক্ষককে।

পঞ্চমতঃ—**সহানুভূতিশীলতা**। শিক্ষকের স্নেহপ্রবণ হৃদয় সব সময়েই ছাত্রের মঙ্গল কামনায় ব্যাকুল থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি—"সব শেষে বলব যেটাকে সবচেয়ে বড় মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব।···ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে। এই জন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়—মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ।" এই স্নেহই শিক্ষকতা বৃত্তির প্রধান উপাদান। পিতা যেমন আপন সন্তানকে ভালবাসে তেমনি আন্তরিক ভালবাসা থাকবে ছাত্রদের প্রতি। বালকের প্রত্যেকটি ব্যবহার, বালকের দৃষ্টিতে দেখে বিচার করতে হবে। নিজের বাল্যজীবনের কথা চিন্তা করে দেখতে হবে, তবেই চঞ্চলচিত্ত বালকের

দুষ্টামির তাৎপর্য শিক্ষক বুঝতে পারবেন এবং তবেই তিনি বিচারের কঠোরতা স্নেহধারা সিঞ্চনে কোমল করে নিতে পারবেন।

ষষ্ঠতঃ—**বাগ্মিতা ও বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য**। শিক্ষকতার কার্যে এই গুণটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যে অথবা সুশাসন রক্ষার কার্যে শিক্ষকের প্রধান অবলম্বনই হল তাঁর বাক্য। সুতরাং সেই বাক্যের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে যিনি যতটা পারদর্শী হবেন শিক্ষকতায় তিনি ততটাই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবেন। এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সপ্তমতঃ—শিক্ষকের যেন কোন **মুদ্রাদোষ না থাকে**। শিশুরা বড়ই অনুকরণপ্রিয়। শিক্ষকের মুদ্রাদোষগুলি স্বভাবতই তারা অনুকরণ করে ব্যঙ্গ করতে চাইবে।

অষ্টমতঃ—**প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**। এই গুণটিও শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ শ্রেণীকক্ষে বসে পাঠ পরিচালনা করতে করতেই অনেক সময়ে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে হবে শিক্ষককে। সুতরাং অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করবার জন্য শিক্ষককে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়।

নবমতঃ—শিক্ষক হবেন **চটপটে** (smart)। শ্রেণীকক্ষে তিনি এক জায়গায় থাকবেন বটে কিন্তু চারিদিকেই তাঁর নজর চলবে। তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির আড়ালে ছেলেরা লুকিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করলেও যেন তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি না এড়ায়। স্যাণ্ডিফোর্ড রহস্য করে বলেছিলেন—শিক্ষক যখন রামের দিকে দৃষ্টি দেবেন তখন শ্যামের গতিবিধিও যেন দৃষ্টিপথের আড়ালে না যায়। [The ability to see Tommy's movements while looking at John is essential to successful teaching]

দশমতঃ—**রসজ্ঞান** (sense of humour)। শিক্ষকের যথোপযুক্ত রসজ্ঞান না থাকলে শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালনা হবে অত্যন্ত নীরস ও বিরক্তিকর। গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু হাল্কা নির্দোষ হাস্যরসের অবতারণা করলে ছাত্রদের মনের একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়, পাঠদান সজীব হয়ে ওঠে, সমগ্র শ্রেণী আনন্দোদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

তবে এই হাস্যরসের সৃষ্টি করতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে যেন কোন খেলো রসিকতা বা ফাজলামি না করা হয়। ইংরাজীতে বলে— laugh with the teacher but not at the teacher শিক্ষকের হাসির সঙ্গে ছেলেরা হাসবে, শিক্ষককে দেখে হাসবে না।

একাদশতঃ—শিক্ষককে হতে হবে **চরিত্রবান, সত্যবাদী** এবং **পক্ষপাতশূন্য**। এই কয়েকটি গুণ শিক্ষকতা বৃত্তির পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষকের কথার কোন দাম নেই, অথবা তিনি কারো প্রতি অযথা পক্ষপাতী বলে প্রমাণিত হলে শিক্ষার আদর্শই নষ্ট হয়ে যাবে। ছাত্রের কাছে কোন শ্রদ্ধা সম্মান তিনি পাবেন না।

দ্বাদশতঃ—**কর্মচতুরতা** (Tactfulness)—বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্য পরিচালনার সম্পর্কে শিক্ষককে অনেক সময় হয়ত অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে তৎপরতার সঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবার কৌশলই হচ্ছে কর্মচতুরতা। কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়।

ত্রয়োদশতঃ—**আত্মবিশ্বাস**। এই হল শিক্ষকতাগুণের চরম কথা। শিক্ষকের যদি যথোচিত আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে তিনি কখনই সার্থক শিক্ষক হতে পারবেন না। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস না থাকলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কখনই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে পারবেন না।

শিক্ষকোচিত গুণাবলি (অর্জিত)—

এতক্ষণ ধরে অনর্জিত বা স্বাভাবিক গুণপনার কথা বলা হল। এইবার অর্জিত গুণাবলির আলোচনা করি। শিক্ষাকার্যটি একটি বিশেষ শিল্পকার্য, সুতরাং অন্যান্য শিল্পকার্যের মতই এর জন্যে একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষার অর্থাৎ **শিক্ষণের** (Training) **প্রয়োজন**। অপর শিল্পকার্যে জড়পদার্থ নিয়ে কারবার অথচ শিক্ষাকার্যের কারবার জীবন্ত পদার্থ নিয়ে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ে। তাই এ' কার্যের পরিচালনা-শিক্ষা এত প্রয়োজনীয়। প্রথমেই বিষয়-জ্ঞানের অনুশীলন—বিদ্যালয়ের শিক্ষণকার্যে ব্রতী হতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে **উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজন**। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যতটুকু জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান শিক্ষকের আয়ত্তে না থাকলে তিনি কখনই সুষ্ঠুভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ—**মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন**। শিক্ষাদান করা মানে শ্রেণীকক্ষে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দান করা নয়, ছাত্রদের ঐ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। আগেই আমরা দেখেছি, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী

জ্ঞান অর্জনে শিশুকে সাহায্য করবেন শিক্ষক। সুতরাং শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞান না থাকলে কোনমতেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—**শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন**। এ সম্বন্ধে গতানুগতিক পন্থা পরিহার করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করে চলবার উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান থাকলেই তা শিশুদের দেওয়া যায় না। সেটা নির্ভর করে দেবার কৌশলের উপর, এবং এই কৌশলই হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতি। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যে সব শিক্ষাদান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তারই সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া শিক্ষা কখনই সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারে না।

শিক্ষক কি জন্মায় না তৈরী হয়? (Are teachers born or made?)

শিক্ষকের গুণাবলি সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা গেল তাতে শিক্ষকের অনেকগুলি সহজাত গুণের কথা বলা হয়েছে। সেই জন্যই অনেকে মনে করেন শিক্ষকসুলভ গুণাবলি নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনিই মাত্র সত্যকার শিক্ষক হতে পারেন, অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ শিক্ষককে তৈরী করা যায় না, শিক্ষক জন্মায়।

সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন। শিক্ষককে যদি তৈরী করা না যায় তবে এত শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি? অথচ শিক্ষকোচিত গুণাবলির অধিকাংশই যে সহজাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ বলে গৃহীত হয়েছেন তাঁরা ত কেউই শিক্ষণতত্ত্ব শিক্ষা করে আসেন নি। সহজাত প্রতিভা বলেই তাঁরা শিক্ষাকার্যকে শিল্পকার্যে রূপান্তর করতে পেরেছেন। তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি?

এ' ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষকের অনর্জিত গুণগুলিও অনুশীলন সাপেক্ষ। শিক্ষাদান কার্যে নেমে যে উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন, তা স্বাভাবিকভাবে সকলের সমান থাকে না। আর তা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সব সময়ে তা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায় না। তাই কেবলমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর না করে পূর্বসূরি সার্থক শিক্ষাবিদগণের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করলে অনেক সময়ের ও শ্রমের লাঘব হয়। তাছাড়া সব কাজেরই একটা ন্যূনতম কার্যদক্ষতা (minimum working efficiency) আছে। সেই পর্যন্ত প্রত্যেককেই গড়েপিটে শিখিয়ে তৈরী করে

নেওয়া যায়। শিক্ষণশিক্ষায় সেই ন্যূনতম দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারবেন সকলেই। তার মধ্যে যাঁর সহজাত গুণ অধিক, তিনি যে অধিকতর ভাল শিক্ষক হবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই, তবে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গড়শ্রেণীর শিক্ষকেরও প্রয়োজন কম নয়। দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হলে কোটি কোটি শিশুর জন্য লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কবে কে কোথায় শিক্ষকের সহজাত প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হবেন তারই আশায় দেশ অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। কাজ চালাবার মত গড়শ্রেণীর শিক্ষক তাকে তৈরী করে নিতেই হবে হাজারে হাজারে। এই কাজ শিক্ষক শিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলির দ্বারা নির্বাহ করা হচ্ছে।

তাছাড়া আরো একটা কথা বিবেচ্য—যাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষকোচিত গুণাবলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা যে শুধু আদর্শ শিক্ষকই হয়েছেন তাই নয়—নিজেদের জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে শিক্ষাতত্ত্ব রচনা করে গিয়েছেন। তাঁরা শুধু শিক্ষকই নন, শিক্ষাপথের তাঁরা আদর্শ পথিকৃৎ। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভ করলে এই পথের যাত্রীর ভুলত্রুটি ব্যর্থতার হাত থেকে সহজে অব্যাহতি লাভ করা যায়। মোটকথা অনর্জিত গুণ নিয়ে জন্মালেও তার অনুশীলন প্রয়োজন। পথিকৃৎগণের পথ অনুবর্তন করে, তাঁদের অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছা এবং আগ্রহ সহকারে চললে আদর্শ শিক্ষক হওয়া কঠিন নয়।

তাছাড়া মানুষের সব ক্ষমতাই ত প্রথমে পরিস্ফুট ভাবে দেখা দেয় না। অনেক ক্ষমতা সুপ্তভাবে থেকে যায়। সময় সুযোগ এবং শিক্ষার সহায়তা পেলে সেই সুপ্ত ক্ষমতা জাগ্রত হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় সেই জাগানর কাজেও অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।

যাই হোক, মোট কথা হল—শিক্ষক জন্মগ্রহণও করেন, আবার গঠিতও হন। তবে যাঁরা শিক্ষকোচিত অনর্জিত গুণগুলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে শিক্ষক হয়েছেন এবং যাঁরা কেবলমাত্র অর্জিত গুণের জোরে শিক্ষক হয়েছেন—তাঁদের থেকে যাঁরা জন্মগত শিক্ষক হয়েও গঠনগত শিক্ষণের অনুশীলনে শিক্ষক হয়েছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করি—

"—যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি

ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।… যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি।"

—এই চিরনবীনতাই হল শিক্ষকবৃত্তির চরম কথা।

শিক্ষালয়

১। আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

—রবীন্দ্রনাথ

২। দস্তর মত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

৩। The ideal school should be a miniature of society in which the child can be taught to live, work and utilize his capacities and the complexities of modern social life.

—John Dewey

৪। A school should be a natural society......there should be no cramping or stifling of citizens, but room for all.

—P. Nunn

৫। The school is but one among many educational agencies and forces of society.

—Counts

৬। School houses should be comfortable and attractive.

—Comenius

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(Development of School Idea)

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—

হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়েই জলের দিকে ছোটে, খাবার ঠুকরে খেতে চেষ্টা করে, ছাগল ছানা জন্মের কিছুক্ষণ পরেই উঠে দাঁড়াতে পারে, আর কয়েক দিন পরেই ঘাসের পাতা ছিঁড়তে চেষ্টা করে—এইভাবে মনুষ্যেতর সকল শিশুই আত্মনির্ভর হয়ে উঠে অত্যল্পকালের মধ্যেই। কিন্তু মানবশিশু সুদীর্ঘ কাল পড়ে থাকে একান্ত অসহায় হয়ে, তারপর অতি ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলতে শুরু করে জীবনের পথে। জীব মাত্রেই এই জগতে আবির্ভূত হয় প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ জাতীয় কতকগুলি অনর্জিত সহজাত স্বাভাবিক ধন নিয়ে। মানবেতর জীবলোকের এইগুলোই হল প্রধান পাথেয়, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই তারা চলতে শুরু করে জীবনের গতানুগতিক পথে। অর্জিত অভিজ্ঞতার রঙ হয়ত কিছু লাগে, কিন্তু তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। মানুষের বেলাতেও প্রবৃত্তির বেগটা সমানই আছে কিন্তু তার প্রকাশের ধারাটা গিয়েছে বদলে। মানুষ তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত করে সেই বেগগুলিকে এমন সুন্দর করে, এমন অভিনব করে প্রকাশ করে যে তার পিছনকার অদম্য জৈব প্রবৃত্তির মূর্তিটা আর তেমন ভাবে চোখে পড়ে না।

মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য—

এইখানেই মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবলোকের তফাৎ। মানুষের জীবনের পথ জটিল ও বন্ধুর। একজনের পথ অন্যজনের থেকে স্বতন্ত্র, তাই ঐ চলার কৌশল আয়ত্ত করার কাজটা কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিলে মানুষের চলবে না, পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী উত্তর পুরুষদের কাজে লাগবে দিগদর্শনী হিসাবে—এবং এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারণের উপায় হিসাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শিক্ষালয় রূপ একটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই শিক্ষালয়গুলির উৎপত্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। শিক্ষালয়ের উৎপত্তির কাহিনী জানতে হলে তাই সভ্যতার পথে মানুষের জয়যাত্রার বিভিন্ন স্তরের পরিচয় আমাদের সর্বপ্রথম সংগ্রহ করতে

হবে।—এবং তা করতে হলে বর্তমানের এই পরমাণবিক যুগের থেকে বহুসহস্র বৎসর পিছিয়ে যেতে হবে সভ্যতার সেই অরুণোদয়ের প্রাক্কালে।

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি—

গুহাবাসী মানুষ পশুস্তর থেকে তখন খুব বেশী দূর সরে আসেনি। পশুদের মতই তার জীবনযাত্রা পরিচালিত হচ্ছে প্রবৃত্তির তাড়নায়। তখনও গোষ্ঠী-চেতনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, পারিবারিক বন্ধনও দৃঢ় নয়, তথাপি তার নিজস্ব পরিজন বলতে অল্প যে কয়েকজন মানুষ একসঙ্গে দল বেঁধে বসবাস করে তাদের মধ্যেই চলতে থাকে **অভিজ্ঞতার আদান প্রদান**। বলাই বাহুল্য,—এই অভিজ্ঞতার আদান প্রদান কোন উদ্দেশ্যমূলক নয়, কোন পরিকল্পনা অনুসারে নয়, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যও নয়।

গুহাশ্রয়ী আদিম অবস্থা—

বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তিবশে মানুষ পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছে, বন্য পশুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনপণ সংগ্রামে আত্মরক্ষা করেছে, খাদ্য সংগ্রহ করেছে। সংগ্রামে পরাজিত হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কখন বা জয়লাভ করে বাঁচার পথ সহজ করেছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরাজিত মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই বিজয়ী মানুষের সকল কৌশল অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছে।......কর্মক্লান্ত বিজয়ী বীর হয়ত সন্ধ্যার পর অবসর সময়ে আগুনের পাশে 'বসে গল্প করে তার যুদ্ধজয়ের কথা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা—কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, হয়ত কেবল মাত্র আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি বশেই, কিন্তু এইসঙ্গেই অজ্ঞাতসারে শুরু হয়েছে শিক্ষার কাজ। মোট কথা, **এই স্তরে শিক্ষাটা এসেছে একেবারে স্থূল জৈবজীবনের তাগাদায় উপজাত** (byproduct) **হিসাবে অনুকরণের মাধ্যমে।** সুতরাং এর কোন লক্ষ্যও নেই, পরিকল্পনাও নেই। এই হল শিক্ষালয়ের আদিম রূপ—এই অনির্দিষ্ট, উদ্দেশ্যহীন, পরিকল্পনাহীন, আকস্মিক এবং অনুকরণ-নির্ভর শিক্ষা-ব্যবস্থা চলতে থাকে মানব সমাজের সুদীর্ঘ শৈশবকাল জুড়ে।

সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ—

যাই হোক, মানুষ ক্রমশ এগিয়ে আসে সভ্যতার পথে—জীবন-সংগ্রাম ক্রমশ-জটিল হয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে। জীবনযুদ্ধের অস্ত্রও ক্রমশ শাণিত হতে থাকে। অস্ত্র নির্মাণের নিপুণতা এবং অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল ক্রমশ প্রাথমিক স্থূল পর্যায় শেষ করে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে উন্নীত হল। সেই সব অস্ত্র-

নির্মাণ বা প্রয়োগ কৌশল তখন শুধু আর পরিকল্পনাহীন আকস্মিকতার উপর ফেলে রাখা চলে না। **মানুষ অনুভব করল তার সেই সব নব নব উদ্ভাবিত কৌশল পরবর্তীদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা।**

সভ্যতার পথে আরো অনেকদিন এগিয়ে আসার পর জৈব প্রয়োজনের গতি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে। মানুষ শিখেছে কাপড় বুনতে, মৃৎপাত্র তৈরী করতে, তীর ধনুক নির্মাণ করতে, পাথর থেকে সূক্ষ্মতর উন্নততর অস্ত্র তৈরী করতে, পশুপালন করতে।—

এই শিক্ষা একদিনে হয়নি বা একজনের জীবনে হয়নি। অতীত অভিজ্ঞতার অনেক মুকুলিত প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে তবেই ধীরে ধীরে সে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। দিনান্তে কর্মক্লান্ত অভিজ্ঞ প্রাচীনেরা আগুনের পাশে বসে অর্বাচীনদের কাছে অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে যে বীজ বপণ করেছিলেন তা'থেকেই পরে উৎপন্ন হয়েছে আজকের এই বিদ্যালয়গুলি।

বিদ্যালয় অবসর যাপনের কেন্দ্র—

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ইংরাজী স্কুল (school) শব্দের অর্থ শব্দটির উৎপত্তির অনুসন্ধানে মিলবে। অগ্নিকুণ্ড-কেন্দ্রিক অবসর যাপনের কেন্দ্রগুলি পরে কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের স্থান হিসাবেই ব্যবহৃত হতে লাগল গ্রীক স্খোল (skhole) শব্দের দ্বারা। এবং আরো পরে ইংরাজী 'স্কুল' শব্দটি গ্রীক স্খোল শব্দ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, এবং তার অর্থ হয়েছে বিদ্যা বিতরণ কেন্দ্র।

অর্থাৎ এই অগ্নিকুণ্ড-কেন্দ্রিক অবসর যাপনের স্থানগুলিই হল বর্তমান শিক্ষালয়গুলির ভ্রূণাবস্থা।

তারপর সেই ভ্রূণগুলি ক্রমশ কেমন করে মানব গোষ্ঠীর বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়স্বরূপ হয়ে উঠল, সে কাহিনী বিস্ময়কর—

মানব সভ্যতার উদ্বর্তনের কাহিনী বলতে গেলে আবার গোড়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। কোন সুদূর অতীতকালে মানুষ পৃথিবীর বুকে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, তখন কেমন ছিল তার বাহ্যিক রূপ, কেমন বা তার অন্তরের রূপ আজ তা পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। তবে অরণ্যাশ্রয়ী গুহাবাসী পশুর সঙ্গে তার কোন তফাৎ ছিল না। যমজ ভায়ের মতই তারা এই পৃথিবীর বুকে জৈব জীবনের তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে· কিন্তু

তারপর? পশুজন্ম সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই জীবন পথ অনুবর্তন করে চলেছে, কিন্তু মানুষ বেছে নিয়েছে স্বতন্ত্র পথ, যে পথে চলতে চলতে আজ সে বিদ্যুতালোকিত বিস্ময়কর আণবিক যুগে এসে পৌছেছে। সে পথের দিশা তাকে কে দেখাল? উত্তরে বোধহয় বলা যেতে পারে—মানুষের বিস্ময় এবং তার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি। জগতের বিচিত্র পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ এসেছে, পরিস্থিতির নূতনত্বে বিস্মিত হয়েছে—খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে কার্যকারণ সূত্র। এবং এই খোঁজার পথেই প্রকৃত তার অমিত শক্তির খবর এবং গোপন ঐশ্বর্যের খবর মেলে ধরেছে মানুষের সামনে। এই খোঁজার পথই হল মানুষের সভ্যতার পথ। বিচিত্র তার ইতিহাস, সুদীর্ঘ তার কাহিনী।

প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যই কি কম? দিনে সূর্য চন্দ্রের অমোঘ আবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বিস্ময়কর পটপরিবর্তন, ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্লাবন, ভূমিকম্পের আকস্মিক ভয়াল আবির্ভাব,···তার চেয়েও বিস্ময়কর, জীবনের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে মৃত্যু—কেন আসে, কোথা থেকে আসে, কি তার কারণ? আদিম মানুষের মনে বিস্ময় জাগে, কার্যকারণ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দিশে পায় না। একটা ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড শক্তির লীলা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।—এই অজ্ঞাত শক্তির অনুভূতিই তাকে ভীত করে তোলে, কোনো এক অজানা দৈবশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে—এবং এই সচেতনতার মধ্যেই রয়েছে সব জাতির ধর্ম প্রেরণার মূল কথা। এই ভয়াবহ দুর্জ্ঞেয় শক্তির পরিচয় নিতে একদল চিন্তাশীল মানুষ চিরকালই তার বুদ্ধি বিবেচনামত চেষ্টা করে এসেছে। এমনি করে উৎপত্তি ঘটেছে ধর্মের ও ধর্মগুরুর।

সর্বশক্তিমান যাদুকর মানুষ—

বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এদের উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন রকমে। দেশে দেশে কালে কালে এর রূপ হয়েছে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত মানব গোষ্ঠীর মনের উপর এদের প্রভাব অসামান্য।

আদিম মানব সমাজে এই সব মানুষ সর্বশক্তিসম্পন্ন সর্বরহস্যবিদ বলে শ্রদ্ধা ও ভয় অর্জন করেছে। সমস্ত সমাজের বিবেক ছিল এই কয়েকটি রহস্য-সন্ধানী মানুষের হাতের মুঠোয়। আদিম সমাজের এরাই হল একাধারে

চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং শিক্ষক। ইংরাজিতে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিকম্যান (magic man) বা যাদুকর।

আগেই বলেছি—মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পূর্বে বিকেন্দ্রীভূত জীবনে ব্যক্তি-গত ভাবে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল একান্তই আকস্মিকভাবে অনুকরণের মাধ্যমে। তার পর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে গোষ্ঠী, সমাজ। মানুষের অভিজ্ঞতাও ক্রমশ প্রসারিত হতে লাগল। যাদুকর মানুষদের সম্পর্কে এখানে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগপীড়িত আদিম মানুষ তার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে। এ ধর্ম বলতে কোন আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ নয়, কতকগুলি বিধি নিষেধ দিয়ে ঘেরা সংস্কারের প্রথা অনুবর্তন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় অস্পষ্ট ধর্মবোধ ক্রমশ বিচিত্র ধরনের বিধি-নিষেধ, পূজা-পদ্ধতির রূপ গ্রহণ করতে লাগল। এই পদ্ধাত এমন জটিলতর হয়ে উঠল, যে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হল। সুতরাং ধর্মকেন্দ্র-গুলির সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে।—এর সব প্রথা মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে চেয়েছে। সুতরাং সেইগুলিই হল তখনকার প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়। তথাকথিত জ্ঞানী মানুষেরা তাদের প্রথানুবর্তনের সংস্কার াদয়ে পরবর্তী যুগের জ্ঞানী মানুষ তৈরী করে যেতেন। এককথায়, তখনকার শিক্ষক গুরু পুরোহিতেরা তৈরী করে যেতেন তাঁদের উত্তরসাধক, ভাবীকালের গুরু পুরোহিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরু পুরোহিত—

শিক্ষার ক্ষেত্রে এইভাবে গুরু পুরোহিতের আধিপত্য শুধু সভ্যতার গোড়ার দিকের ইতিহাসেই দেখা গিয়েছিল তাই নয়, সর্ব দেশে সুদীর্ঘকাল ধরেই এই আধিপত্য চলে এসেছে অব্যাহত গতিতে। অবশ্য দেশে দেশে কালে কালে তার রূপ হয়েছে বিচিত্র। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা কেবলমাত্র প্রথানুবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শও অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় আধিপত্যের ন্যূনতা ঘটেনি কোথাও। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রেরণাই একমাত্র প্রেরণা। হিন্দু যুগের বর্ণশ্রমী সমাজে শিক্ষালয় হল গুরুগৃহ, শিক্ষণীয় বিষয় হল আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনার প্রস্তুতি।

এরপর বৌদ্ধ যুগ—সেখানেও ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। বৌদ্ধ ধর্মে বর্ণাশ্রম সংস্কার না থাকায় শিক্ষার ক্ষেত্রটা অনেকখানি গণতান্ত্রিক হল বটে, কিন্তু ধর্মীয় নিগড়ের সঙ্গে তার বন্ধন এতটুকু শিথিল হল না। শিক্ষাক্ষেত্র হল মঠ, বিহার, সাংঘারাম, আর শিক্ষক হলেন ভিক্ষু, শ্রমণ, আচার্য প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ। মুসলমান যুগে তো মক্তব, মাদ্রাসা আর মসজিদ একার্থবাচক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষাগুরুও মৌলভী, ধর্মগুরুও মৌলভী।

সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসেও দেখা যায় চার্চের অখণ্ড প্রতাপ। বাইবেল পড়ানর এবং ধর্ম শেখানর উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে প্রথম শিক্ষালয় গড়ে উঠেছিল। শুধু ইংলণ্ডই বা বলি কেন, সমগ্র ইউরোপের শিক্ষার ইতিহাস ধর্ম প্রচারের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

মোট কথা, শিক্ষালয়ের উৎপত্তির ইতিহাসে বিকেন্দ্রীভূত আদিম অবস্থার পর থেকে **শিক্ষালয় যখনই কোন একটা কেন্দ্রীভূত উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠবার চেষ্টা করেছে, তখন থেকেই তার উদ্দেশ্যের মূল প্রেরণায় দেখা দিয়েছে ধর্মবোধ।**

শিক্ষালয় ও সমাজ

(School and Society)

—এসব ত হল পুরোণো দিনের কথা। বর্তমানের কথা হল, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ। স্নতরাং শিক্ষালয়গুলিও এখন আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, পুরোপুরি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ধর্মবোধ বনাম সমাজবোধ—

ইতিহাসে দেখতে পাই—রাজতন্ত্রের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ বিপ্লবের পিচ্ছিল পথে গণতন্ত্রকে আহ্বান করে এনেছে, প্রত্যেকটি মানুষের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছে। এই স্বীকৃতির মধ্যে শিক্ষাধারারও একটা বিরাট পরিবর্তন শুরু হল। জাঁ জাকুই রুশোর চিন্তাধারার প্লাবনে একদিকে যেমন ফরাসী ব্যাষ্টিলের পতন ঘটল অন্য দিকে চিরাচরিত শিক্ষাধারার কারাগারগুলিরও অবসান ঘটল। কর্তৃপক্ষের (তা সে পুরোহিতই হোক আর রাজাই হোক) ইচ্ছা ও প্রয়োজনের ছাঁচে প্রত্যেকটি মানুষকে ঢালাই করে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেবার কারখানা হিসাবে গড়ে উঠেছিল শিক্ষালয়গুলি। নূতন যুগের ভোরে শিক্ষালয়ের সেই সর্বজনীন ছাঁচ ভেঙ্গে দিয়ে ব্যক্তিগত রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হল। ল্যাটিন শেখবার ষ্টিমরোলারের তলায় নিষ্পেষিত 'জন' শিক্ষাবিদদের কানে নূতন বাণী বহন করে আনল। শিক্ষালয়গুলির লক্ষ্য ও আদর্শ গেল বদলে।

বর্তমান যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই শিক্ষালয়গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একে একেবারে একটা নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি বললেন সমাজের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই শিক্ষালয়ের স্থান বললেও ঠিক বলা হল না, শিক্ষালয়ই হল স্বরূপতঃ একটা সম্পূর্ণ সমাজ।—মানব সমাজের একেবারে নিখুঁত বাস্তব প্রতিরূপ। কথাটা বিশ্লেষণ করা দরকার।

শিক্ষালয়—স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ—

সমাজ কাকে বলে? কতকগুলি মানুষ একজায়গায় একই পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হলেই কি তার মধ্যে সমাজ গড়ে ওঠে? সৃষ্টির আদম যুগে মানুষ ছিল একক আত্মকেন্দ্রিক। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল পরিবার, দল, গোষ্ঠী, সমাজ। এই সমাজ গড়ার পেছনে শুধুমাত্র জীবন ধারণের সুবিধা

অসুবিধার প্রশ্নই ছিল না, ছিল জীবন প্রয়াসের মূল প্রশ্ন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের আকর্ষণেই সে সমাজ গড়েছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাকে স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করেও। মানুষের মূল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে অনেকগুলিই যে সমাজ গঠনের জন্য দায়ী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

যূথবদ্ধতা, আত্মপ্রচার, রণলিপ্সা, আত্মবিলোপ, অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তিগুলির কোনটিই একক জীবনের পরিপোষক নয়, যৌথ জীবনেই তাদের সার্থকতা। বিদ্যালয় গঠনের মূলেও দেখা যায় এই সব সহজাত প্রবৃত্তিরই কাজ।

যৌথ জীবনের আনন্দ, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রসারের সুযোগ, খেলার বা পড়ার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোধন প্রবৃত্তির তৃপ্তি এই সবই ঘটে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে।

প্রবৃত্তির ক্রিয়া ছাড়াও সমাজ-জীবনের আরো কয়েকটি বন্ধন আছে, যথা—ধারাবাহিকতা, ঐতিহ্যের গৌরববোধ, অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং অগ্রগতির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। শিক্ষালয়ের জীবনেও এগুলি সমভাবেই কার্যকরী।

—বিষয়গুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানব সমাজ একটা আকস্মিক বস্তু নয়। হঠাৎ বহু লোক একত্র মিলিত হলেই সমাজ গড়ে ওঠে না। সমাজের ধারাবাহিকতা আছে ;—শিক্ষালয়েরও আছে এই ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা। যে বিদ্যালয় যত প্রাচীন, যে বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস যত বিচিত্র ঘটনাবহুল ও গৌরবপূর্ণ, সেই বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন ততই সার্থক।

তারপর প্রত্যেক মানব সমাজের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে ; একটা আর একটার নির্জীব প্রতিরূপ নয়। মানুষে মানুষে যত মিলই থাক, খানিকটা অংশে প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র, এবং এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তার নিজস্ব অভিব্যক্তিটি ধরা পড়ে। বিদ্যালয়ের বেলাতেও তাই। সব বিদ্যালয়ই এক ছাঁচে ঢালা—তার মধ্যে থেকেও যে বিদ্যালয় তার একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারে, ছাত্রের মনে সে তত বেশী সমাজ-জীবনবোধ জাগ্রত করে দিতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন, কোন একটি বিশেষ প্রার্থনা সংগীত, একটি বিশেষ পোষাক, কোন একটি বিশেষ নিয়ম ছাত্রের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ জাগ্রত করে দেয়।

এর পর তিরস্কার পুরস্কারের কথা—সমাজ থাকলেই তার একটা শৃঙ্খলা

থাকবে এবং নিয়ম পালনকারী বা ভঙ্গকারীর পুরস্কার বা তিরস্কার করবার ক্ষমতাও থাকবে সমাজের হাতে। বিচার ও শাসন করবার অধিকার যদি সমাজের না থাকে তবে সেই সমাজের বন্ধন কেউ মানবে না—সামাজিক সংহতি যাবে নষ্ট হয়ে। বিদ্যালয়ের বেলাতেও তাই। ভাল কাজের পুরস্কার ও অন্যায় কাজের তিরস্কার বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে, তার ফলে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন হয় শক্তিশালী।

প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীর বা সমাজের অগ্রগতির একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিধি নিষেধ গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়েরও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। বিদ্যার্জন, আত্মিক বিকাশ, দেহ ও মনের সুসম গঠন প্রভৃতি লক্ষ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালিত হয়।

এ ছাড়া আছে গণমনের লীলা—নান্ সাহেব এই লীলার একটি বিশেষ প্রকাশের নাম দিয়েছেন "মাইমেসিস" (mimesis)। এর প্রকাশ শরীর মন ও বুদ্ধি, মানুষের এই তিনটি বিভিন্নস্তরে তিন ভাবে ঘটে থাকে। যথা অনুকরণ, সহানুভূতি ও অনুভাবণ। এই তিনটি ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে এইটুকু বলা যায় যে মনের এই সাধারণ বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় সমাজের মধ্যে, বিদ্যালয়ের মধ্যেও। এই ভাবে একই উদ্দেশ্যে একই শৃঙ্খলায় এবং একই নীতিবোধের দ্বারায় যে গণচেতনার উদ্ভব হয়, তাকেই আমরা সমাজ চেতনা বলতে পারি। এবং এই হিসাবে বিদ্যালয় হল সমাজেরই অনুকল্প।

জন ডিউই এই মতটিকেই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষ সামাজিক জীব, অর্থাৎ সমাজ-জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ ঘটে থাকে, এইটেই হল শিক্ষার মূল কথা।

তাই ডিউইর মতে ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করে যাওয়াটা শিক্ষা নয়, বর্তমান জীবন-ক্রিয়াই হল শিক্ষা (Education is a process of living, not a preparation for future living—J. Dewey)। শিক্ষার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালয়ের সংজ্ঞাও স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। শিক্ষালয় বলতে আর সমাজ কর্তৃক গঠিত জ্ঞান বিতরণের একটা কারখানা মাত্র নয়। শিক্ষালয় সমাজেরই অনুকল্প। সেখান থেকে ছেলেরা পুস্তক নিবদ্ধ বিষয়গুলির জ্ঞান ছাড়াও সামাজিক জীবন

যাপনের সুপরিণত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইখানেই হল শিক্ষালয়ের প্রকৃত মূল্য।

শিক্ষালয় স্বাভাবিক সমাজ ও কৃত্রিম সমাজ—

শিক্ষালয়ের এই নূতন গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করতে গিয়ে ডিউই আব্রাহাম লিঙ্কণের সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিখ্যাত সংজ্ঞাটি (democracy is rule of the people, by the people and for the people) ঈষৎ পরিবর্তন করে বলেছেন—শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। (Education is of, by and for experience)। সুতরাং বিদ্যালয়গুলি হল স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। একদিক দিয়ে দেখলে একে স্বাভাবিক সমাজও বলা যেতে পারে আর অন্যদিক দিয়ে দেখলে একে কৃত্রিম সমাজ বা সমাজের একটি আদর্শ প্রতিরূপ বলেও ধরতে পারা যায়। আগেই বলেছি, স্বাভাবিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই শিক্ষালয়ের মধ্যে বিরাজমান। সেই দিক থেকে শিক্ষালয়গুলিকে স্বাভাবিক সমাজও বলা যায় কিন্তু বাস্তব সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়ের আবার অনেক পার্থক্যও আছে। শিক্ষালয়-সমাজ হল বাস্তব সমাজেরই একটা প্রতিরূপ বটে, তবে তা শুদ্ধ সংস্কৃত ও মার্জিত প্রতিরূপ। (School is a simplified, purified and better balanced society—J. Dewey)

সুনির্বাচিত এই তিনটি বিশেষণের (সরল, সুমার্জিত ও সুষম) দ্বারা জন ডিউই বাস্তব সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়-সমাজের পার্থক্যটি কি ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য—

বর্তমান সমাজ-জীবন অত্যন্ত জটিল এবং বহু বিচিত্র স্বার্থের সংঘর্ষে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আজ আবর্ত-সঙ্কুল। সরল শিশু এই জটিল আবর্তের মধ্যে থেকে তার নিজস্ব পথটি নির্বাচন করে নিতে পারে না। তাই শিক্ষালয়-সমাজ-জীবনের পরিবেশ হবে সহজ ও সরল (simplfied)।

তারপর, মানুষের সমাজে কত কলুষতা, আবিলতা ও পাপ। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই যে অল্পবিস্তর পশুপ্রবৃত্তি আছে, তারই যৌথ প্রকাশ সময়ে সময়ে সমাজ জীবনের আবহাওয়া বিষাক্ত করে দেয়। বিদ্যালয়ের সমাজে এই কলুষতা থাকবে না—বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন হবে বিশুদ্ধ ও পবিত্র (purified)।

এইবার সুষমতার কথা। বাস্তব সমাজে ধন, জন, মান, জাতি, বর্ণ হিসাবে কত বিভেদ। এই বিভেদ অনুসারে পদে পদে মানুষের সত্যকার মূল্যবোধ ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে থাকবে না এই কৃত্রিম বিভেদ, থাকবে না কোন প্রকার অসমতা। ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সেখানে একই সঙ্গে একই মর্যাদায় মানুষ হবে; বিদ্যালয়-সমাজ জীবন হবে তাই সুন্দর ও সুষম (better balanced)।

এই হল আধুনিক কালে সমাজধর্মী মানুষের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে শিক্ষালয়ের নূতন মূল্যায়ন।

———

শিক্ষালয় শ্রেণীকরণ

(Types of School)

সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে কি ভাবে শিক্ষালয় গড়ে চলেছে শিক্ষালয়ের বিবর্তনের ইতিহাসে তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

বর্তমান কালে মানুষের প্রয়োজন হয়েছে অতি ব্যাপক, তাই শিক্ষালয়ের কার্যপরিধি হয়েছে প্রসারিত। যেদিন থেকে শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেইদিন থেকেই বহু-বিস্তৃত শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়েছে সমাজকে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতিও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষা আজ শুধু সবল সুস্থ মানবের জন্যই নয়, শিশু বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র পঙ্গু অন্ধ বধির জড়ধী প্রভৃতি সকল বয়সের সকল অবস্থার সকল শ্রেণীর জন্যই স্বীকৃত। তাছাড়া সভ্য মানবসমাজের জটিল জীবনযাত্রার সর্ববিধ কার্য সহায়ক হিসাবেই শিক্ষাকে রূপায়িত করবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। শিক্ষা আজ আর কেবলমাত্র ভাগ্যবন্তদের বিলাসভোগ্য নয়, সকল মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন সাধনের অপরিহার্য উপাদান। তাই আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও এই বহুমুখী প্রয়োজন সাধনের কেন্দ্র হিসাবে বহু প্রকারের।

আজকের দিনের সভ্য সমাজ তার এই গুরু দায়িত্ব পালনে কি পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছে জানতে হলে এই সব বহু বিচিত্র বিদ্যালয়গুলির স্বরূপ ও কার্যপ্রণালী জানা আবশ্যক।

শিক্ষাবিদ ফিণ্ডলে (Findlay) আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে শ্রেণীকরণ করেছেন—

(১) বিদ্যালয়ের মালিকানা (ownership) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক অসামর্থ্য (physical disabilities) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স ও যোগ্যতা (age and attainments) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৪) বিদ্যালয়ের পাঠক্রম (curricula) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৫) শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের (range of responsibility) পরিমাণ হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৬) শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদা (social upbringing) হিসাবে শ্রেণীকরণ,

(৭) শিক্ষার্থীর লিঙ্গ (sex) হিসাবে শ্রেণীকরণ।

অতঃপর এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষালয়গুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক—

(১) প্রথমেই **মালিকানা হিসাবে** শ্রেণীকরণের কথা। এ সম্বন্ধে ফিণ্ডলে ইংলণ্ডের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং সেই দিক থেকে তিনি ৭।৮ ধরণের বিদ্যালয়ের তালিকা দিয়েছেন,—যথা—গৃহশিক্ষালয় (Home school), কোচিং ক্লাশ এবং ডাক মারফৎ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান (coaching class and corresponding school).

ব্যক্তিগত মালিকানার বিদ্যালয় (Proprietory schools) ন্যাসী বিদ্যালয় (endowed schools), সোসাইটি স্কুল, ন্যাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ন্যাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি।

আমাদের দেশে অবশ্য এত প্রকারের বিদ্যালয় না থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় পুরা সরকারী, আধা সরকারী বা সরকারী সাহায্য পুষ্ট, পুরা বেসরকারী, ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত এবং কিছু কিছু ন্যাসী (endowed) বিদ্যালয় আছে। কোচিং ক্লাশ (coaching class) জাতীয় একপ্রকার বিদ্যালয় ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে আজকাল অনেক গড়ে উঠেছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ **শারীরিক অসামর্থ্যের** (physical disabilities) **ভিত্তিতে** গড়া বিদ্যালয় পূর্বে আমাদের দেশে বেশী ছিল না। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় বিকৃতাঙ্গ ও দুর্বলমেধা হতভাগ্যদের জন্য বহুপ্রকার বিদ্যালয় রয়েছে বহুকাল থেকে। আমাদের দেশেও এই জাতীয় মূক বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয়, জড়ধী ও চরিত্র-সংশোধনী বিদ্যালয় বর্তমানে কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

শারীরিক মানসিক ও নৈতিক—এই তিন স্তরের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই বর্তমান সংজ্ঞানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং এগুলির বিকৃতি সংশোধনের দায়িত্বও নিতে হয়েছে শিক্ষালয়গুলিকে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীর **বয়স ও মানসিক যোগ্যতা**

অনুসারে শ্রেণীকরণ সবদেশেই আছে। সাধারণতঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক ক্ষমতা বাড়ে এবং শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতাও বাড়তে থাকে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুবিদ্যালয় (Nursery school), প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্নমাধ্যমিক (Junior high school) বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক (High School) ও উচ্চতর মাধ্যমিক (Higher Secondary School) বিদ্যালয়, তারপর মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি নানাপ্রকার শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) চতুর্থতঃ **পাঠক্রম** (curricula) অনুসারে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকরণ একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে সকল দেশে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা করে থাকে সমাজ। বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য বিভিন্ন, পাঠক্রমও বিভিন্ন। ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলের মূল পাঠক্রম ছিল ল্যাটিন —যেমন আমাদের দেশে টোল চতুষ্পাঠিগুলি প্রাধান্য দিয়েছে সংস্কৃত শিক্ষাকে। তেমনি চিকিৎসা বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, পূর্ত বিদ্যালয়, বাণিজ্যিক বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক প্রকার বিশেষ বিদ্যার পঠন-পাঠনার বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সমাজে।

(৫) পঞ্চমতঃ **দায়িত্ব গ্রহণ**। দায়িত্ব গ্রহণের শ্রেণীকরণ নির্ভর করে শিক্ষার্থী কতক্ষণ শিক্ষালয়ের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে তারই উপরে। আবাসিক বিদ্যালয়, ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়, দিবা-বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৬) ষষ্ঠতঃ **শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদা**। এই অনুযায়ী বিদ্যালয় সব দেশেই কিছু কিছু আছে। সমাজ ব্যবস্থায় নানা প্রকার উচ্চ নীচ স্তরভেদের বিরুদ্ধে আজকাল নানা দেশে নানা প্রকার আন্দোলন চলেছে, কোথাও বা কিছু কিছু সফলতাও ঘটেছে, কিন্তু যুগ-সঞ্চিত আভিজাত্যবোধের মনোভাব এখনো বহুদেশে নানা অছিলায় রয়ে গিয়েছে। বিলাতের পাবলিক স্কুলগুলির আভিজাত্য সর্বজন বিদিত। ভারতবর্ষেও দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের জন্য বিলাতি পাবলিক স্কুল ধরণের কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর রাজন্যবর্গের বিলোপ সাধনেও এই অভিজাত বিদ্যালয়গুলি বিলুপ্ত হয়নি। দুন স্কুল, সিন্ধি স্কুল প্রভৃতি ১৪টি অনুমোদিত পাবলিক স্কুল আজও ব্যয়বহুল বিলাতি পাবলিক স্কুলের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এই জাতীয় অভিজাত শ্রেণীর স্কুলগুলির সার্থকতা

সম্বন্ধে মুদালিয়ার কমিশন বলেছেন—"If public schools are properly organised and training is given on right lines they can help to develop correct attitudes and behaviour and enable their students to become useful citizen···etc..."

(৭) সপ্তমতঃ **লিঙ্গ অনুসারে** শ্রেণীকরণ—এই শ্রেণীকরণ সব দেশেই স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে। বালকবালিকাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন, সামাজিক জীবনধারাও বিভিন্ন হওয়া কর্তব্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বালক-বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই বিভাগটি অন্যগুলির মত একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয়। কারণ পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির অধিকাংশই আবার স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিভক্ত।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে দেখেছি আত্মোপলব্ধি বা পারপূর্ণ আত্মবিকাশ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। নানা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ সব সময়েই নিজেকে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছে। মানুষে মানুষে কত পার্থক্য, রুচি সামর্থ্য বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকটি মানুষ অনন্যসাধারণ। তাই তাদের প্রত্যেকের বিকাশের ধারাও অনন্যসাধারণ। আবার অপর দিক দিয়ে দেখলে মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকলেও সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে তার কতকগুলি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত রুচির স্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক কর্তব্যের দাবী উভয়েরই সমন্বয় করতে হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

আমাদের দেশে এই কর্তব্য সাম্পাদন করবার জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, এই প্রসঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) শিশু-বিদ্যালয় বা নার্শারী স্কুল—

সাধারণতঃ ২ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্যই এই জাতীয় বিদ্যালয়। এই বয়সের শিশুরা স্বাভাবিকভাবে পিতামাতার কাছে গৃহ-পরিবেশেই মানুষ হয়ে থাকে। তাই এই বিদ্যালয়গুলিকেও গৃহ-পরিবেশের যথাসাধ্য অনুরূপ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে শিক্ষার কোন গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে চলা সম্ভব নয়, এবং শিক্ষা বলতে যে প্রচলিত অর্থ আছে তাও এখানে প্রযোজ্য নয়। নার্শারী স্কুল এদেশে পূর্বে বড় একটা ছিলনা—কিন্তু ইউরোপ

অঞ্চলে বহুদিন থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। শিল্পনির্ভর সভ্যতায় মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রের সংসারে পিতামাতা উভয়েই জীবিকাঅর্জনের জন্য দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে কাটাতে বাধ্য হন—তাই সেই সব পরিবারের শিশুদের দেখাশুনা করবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ওসব দেশে গড়ে উঠেছে এই জাতীয় শিশুবিদ্যালয়। খেলাধূলা ও আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে সেখানে শিশুর আনন্দময় গৃহপরিবেশের অনুকল্প রচনা করবার চেষ্টা হয়। তা ছাড়া নাগরিক সভ্যতার চাপে মানুষের বাসস্থানও ক্রমশ এত ছোট এক সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে যে শিশুদের ইচ্ছামত খেলাধূলা চলাফেরা করে বেড়াবার একান্ত স্থানাভাব। নার্শারী স্কুলের খোলামেলা জায়গায় শিশুদের হৃদয় মন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এদেশেও ক্রমশ শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নার্শারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। শিশুরা খেলতে চায়, নিজের হাতে গড়তে চায়, শিশুদের সঙ্গ চায়, এ'সবই তারা পায় নার্শারী স্কুলে। নানাবিধ খেলনার সহায়তায় শিশুদের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকে এই সব স্কুলে। শিক্ষক এখানে বন্ধু ও খেলার সাথী। অত্যন্ত ভালবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষক শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার সার্থক উদ্গতির ব্যবস্থা করতে পারেন।

তাছাড়া নিয়মানুর্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিবিধ জিনিসপত্রের যথাসাধ্য ব্যবহার শিক্ষা, মলমূত্র পরিত্যাগ, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস প্রভৃতিও এই নার্শারী স্কুলের প্রধান কর্মাঙ্গ।

নার্শারী স্কুলে নিয়মিত আহার নিদ্রা ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকে। নাচ গান আবৃত্তি অভিনয় খেলাধূলা, ছবি আঁকা, পুতুলগড়া রংকরা প্রভৃতি বিবিধ আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুমনের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ-সাধন ঘটে এখানে।

মোটকথা, শিশুদের স্ফুটনোন্মুখ দেহমনকে সৌন্দর্যময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হল এইসব নার্শারী স্কুলের প্রধান লক্ষ্য।

প্রাইমারী ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় (Junior Basic Schools)

এখান থেকেই শিশুদের বিধিবদ্ধ শিক্ষা অর্থাৎ লেখাপড়ার সূচনা। ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত এই স্কুলের সীমানা। এই বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হল শিশুমনের অসামাজিক বৃত্তিগুলিকে সামাজিক বৃত্তিতে পরিণত করা। এখানেই শিশু ক্রমশ সামাজিক জীব হিসাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে

মিশে কাজ করতে শেখে। আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এই সময় থেকেই সর্বপ্রথম লিখন পঠন ও কিছু অঙ্ক (3 R) শেখাবার ব্যবস্থা। তবে পূর্বকালে শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে লিখন পঠনাদি ছাড়া আর কিছু থাকত না। কিন্তু বর্তমানে নানাপ্রকার হাতের কাজের মাধ্যমে শিশুর সৃজনীশক্তির বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ছন্দ তাল-যুক্ত সঙ্গীত—নৃত্যাদি সহযোগে শরীর সঞ্চালন ও ব্যায়ামের খেলাও হয়ে থাকে।

এই বয়সেই ছেলেদের মস্তিষ্ক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পেশী সঞ্চালন শেখাতে হয়।

তাছাড়া, অনুবন্ধ-প্রণালীতে (Co-relation of Studies) বিবিধ জ্ঞান-মূলক শিক্ষার ঐক্যসাধনের পদ্ধতিটিও এই বয়সের উপযুক্ত। সেইজন্য কার্য সমস্যা-মূলক পদ্ধতি (Project Method) এই বয়সের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাই হল এই স্তরের সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে আজকাল ব্যাপকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষালয় স্থাপনের নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—

প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ করবার পর ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ ১১+থেকে ১৬+ বৎসর পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষণ কাল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ছয় বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। উচ্চতর শিক্ষা বা বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ভূমিকা স্বরূপ এই স্তরের শিক্ষার মূল্য যে সমধিক তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া মুকুলিত শিশুমনকে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ বিকশিত করে তোলার কাজেও এই স্তরের শিক্ষার মূল্য অপরিসীম।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতে মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মাত্র ছটি বৎসর যথেষ্ট নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রেরা যখন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এলেকায় প্রবেশ করে তখন তারা যথোপযুক্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে আসে না। তার ফলে শিক্ষার অব্যাহত ধারার ভাল করে জোড় লাগে না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য দশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে আরো দুটো বৎসর যোগ দিয়ে দ্বাদশ

শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করবার পরামর্শ দিয়েছেন অনেক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ।

মুদালিয়র কমিশন দুই বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসর যোগ দিয়ে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেছেন।—(It is now generally recognised that the period of Secondary education covers the age group of about 11 to 17 years……The various arguments that have been adduced in favour of this view have led us to the conclusion that it would be best to increase the Secondary stage of educatiou by one year and to plan the courses for a period of four years, after the middle of Senior Basic Stage.)

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে বর্তমানে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। ১৪+ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সীমা। শিক্ষা-জীবনের এই অংশটি পূর্ববর্তী উচ্চ প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ধরা যায়। এই অংশের পাঠ্য-তালিকাও (Curricula) পূর্ববর্তী অংশের ধারা অব্যাহত রেখেই প্রস্তুত করতে হবে।

জীবনের এই প্রথম আট বছরের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করবার সময়ে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, এটি যেন কেবলমাত্র উচ্চতর শিক্ষার ভূমিকামাত্র না হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়েছে। অবিলম্বেই হয়ত এই অভিপ্রায় কার্যকরী করার চেষ্টা করা হবে। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা করে এই অংশের পাঠ্যতালিকা ও পঠনপদ্ধতি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(ঘ) **উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়—**

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দুই বৎসর এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে তিন বৎসর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ডিগ্রী কলেজীয় ৪ বছরের শিক্ষাকালের প্রথম বছরটি মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সের কলেজে—এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কলেজীয় শিক্ষার একটা বছর লাভ করে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব করেছেন মুদালিয়র কমিশন।

এই স্তরের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করবার সময়ে যুগপৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও সামাজিক দাবীর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়—তাই এখানে কতকগুলি অবশ্য পঠনীয় কেন্দ্রীয় বিষয় (Core Subjects) এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত রুচি-নির্ভর ঐচ্ছিক বিষয় (Periferry Subjects) সন্নিবেশিত করতে হবে।

উচ্চতর বিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলিতে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিজ্য, চারুশিল্প ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এই গুলিকে বলা হবে সর্বার্থসাধক বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose Schools)।

কোন কোন উচ্চতর বিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে একটি ধারায় ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

(ঙ) **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—**

এরপরে স্নাতক শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে।

কৃষি, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা, নানাবিধ কারুশিল্প চারুশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিক্ষাদানের পরোক্ষ-প্রতিষ্ঠান

(Educational agencies other than School)

শিক্ষালয়ের প্রকারভেদ

শিক্ষালয়ের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি মানব সভ্যতায় অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য ভাবেই সংযুক্ত। জীবন সংগ্রাম যত জটিল হয়ে এসেছে সেই সংগ্রামের উপযুক্ত হাতিয়ার সংগ্রহ করবার প্রয়োজনীয়তাও তত বেড়েছে। তাই জীবনের পথে চলবার বিচিত্র ধরনের কৌশল শিক্ষা দেবার কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে উঠেছে শিক্ষালয়-গুলি। কিন্তু শিক্ষালয় বলতে আমরা আজ যে সব বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান বুঝি সেগুলি পুঁথিগত বিদ্যা বিতরণের ও বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের সাময়িক কেন্দ্র মাত্র। এই প্রতিষ্ঠান ত মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবে স্পর্শ করে নেই। তাই এখানকার শিক্ষা-রসধারা মানুষের সমগ্র জীবনকে রসসিক্ত করে রাখতে পারে না।

আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষা তো জীবনের একটি খণ্ডাংশের অনুশীলিত বস্তু নয়, শিক্ষার কাজ চলে সারা জীবন ব্যাপী। জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মানুষ যে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে সে সবই তার শিক্ষার অঙ্গীভূত। পরিপার্শ্বিকের মাধ্যমে, নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমশ ভরে উঠছে, মানুষ শিক্ষা লাভ করে চলেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নানা সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উৎসব আনন্দ উপলক্ষ্য করে মানুষের চিত্ত প্রসারিত হয়, সংযোগ ঘটে এক মনের সঙ্গে বহু মনের। এমনি ভাবে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে, শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে মানুষ আর কতটুকু সময় থাকে? তার চেয়ে অনেক বেশী সময় তার কাটে সমাজের পরিবেশে। শিক্ষালয়ের বাঁধা-ধরা পঠন-পাঠনার বাইরে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এই সামাজিক পরিবেশ।

সুতরাং তথাকথিত শিক্ষালয় ছাড়াও শিক্ষাদানের পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান সমাজে ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, নানা বেশে, নানা রূপে। শিক্ষাদানের কাজ সেখানে নিরন্তর চলেছে অজ্ঞাতসারে।

পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—

এমনি ধরনের কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি এখানে উল্লেখ করি—

গৃহ :—

(১) প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মানুষের গৃহ। —পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গৃহের স্থান সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাচীনতমও বটে। জন্মের পর থেকেই ত শিশু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করে। স্থতরাং শিক্ষাও সেই সময় থেকেই শুরু হয়। বিশেষতঃ এই শিশুকালে যে অভ্যাস দানা বেঁধে ওঠে, যে মানসিক গঠনটি শিশু গড়ে তোলে পরবর্তী জীবনে তা আর সহজে পরিবর্তন করা যায় না। মোট কথা শিশুশিক্ষার ভিত্তির উপরেই পরবর্তী জীবনের শিক্ষার সৌধ গঠিত হয়। একমাত্র গৃহপরিবেশেই শিশুহৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি স্থকুমার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়। উদারতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিবিধ সদগুণের সঙ্গে দরদ ভরা মনের কোমল স্পর্শ শিশুর মনে অঙ্কুরিত হয় একমাত্র তার আত্মীয়স্বজন পরিবৃত শান্তির নীড় গৃহ পরিবেশে ; একথা স্বদেশের ও বিদেশের বহু মনীষী স্বীকার করেছেন—

শিক্ষাবিদ রেমণ্ট বলছেন—The home is the soil in which spring up those virtues of which sympathy is the common characterstic. It is there that the warmest and most intimate affections flourish. It is there that the child learns the difference between generosity and meanness, considerateness and selfishness, justice and injustice, truth and falsehood, industry and idleness :—

জীবনের এই প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক হলেন জননী। তাই শিশুর ভাবী জীবনে জননীর প্রভাব অপরিসীম। জর্জ হাবার্ট বলেছেন, একশটি শিক্ষকের কাজ করেন একটিমাত্র ভাল জননী [One good mother is worth a hundred school master—George Herbart] 'যে হাত দোলনা ঠেলে সেই হাতই রাজ্য পরিচালনা করে'—এই বিখ্যাত ইংরাজী প্রবচনটির তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মনীষীর জীবনেই আমরা তাঁদের মহিয়সী জননীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে দেখতে পাব।

কমিনিয়াস থেকে শুরু করে রুশো, ফ্রয়েবল, পেষ্টালৎসি প্রমুখ সকল শিক্ষাবিদেরাই শিশুশিক্ষায় মাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান স্বীকার করেছেন। গৃহ বা পরিবার ত সমাজেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ, সুতরাং শিশুকে যে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার মৌল কর্তব্যটি পালন করেন প্রধানতঃ তার পরিবার।

মোট কথা, এই গৃহ পরিবেশের শিক্ষাতেই আত্মকেন্দ্রিক শিশু ক্রমশ গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এবং এইখানেই শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রচার ঘটে। ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত পরিবারের বৃহত্তর সুখদুঃখের সঙ্গে একান্ততা অনুভব করতে শেখে।

তাছাড়া গৃহশিক্ষার মাধ্যমেই অনেক সময় শিশু তার জাতিগত বৃত্তিশিক্ষা শুরু করে। পিতার বৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তার জন্য তাকে অন্য কোথাও যেতে হয় না। পিতার বা ঐ বৃত্তিধারী অভিভাবকের কাছ থেকে শিশু ভাবী কর্মজীবনের শিক্ষানবিশী শুরু করে।

কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক সভতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র গৃহ পরিবেশের প্রভাব ক্রমশ ভেঙ্গে পড়েছে। জীবন সংগ্রামের জটিলতায় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষ আজ বেরিয়ে পড়েছে পথে, শান্ত গৃহকোণের পবিত্র পরশ থেকে আজ অধিকাংশ শিশুই বঞ্চিত থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে গড়ে উঠেছে নার্শারী স্কুল। পূর্বেই এগুলির কথা উল্লেখ করেছি।

(২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—

পরোক্ষ শিক্ষাদানের কেন্দ্রগুলির মধ্যে গৃহের পরেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থান।

সকল দেশে সকল যুগেই দেখা গিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অসামান্য প্রভাব। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষাদান কার্যটিই এককালে শুরু হয়েছিল ধর্মপ্রচারের আনুসঙ্গিক হিসাবে। মঠ, মন্দির, সংঘ, মসজিদ, চার্চ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু করেছিল।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় চার্চের প্রভাব যে এককালে কত বেশী ছিল তা সে দেশের শিক্ষাধারার ইতিহাস খুললেই দেখা যাবে। শুধু ইংলণ্ডেই নয়, সারা ইয়োরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অসামান্য।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবেই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বৈদিক যুগে বা বৌদ্ধ যুগে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্যটি মঠমন্দির মাধ্যমেই পরিচালিত হত। মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল মসজিদকে কেন্দ্র করেই।

বর্তমান কালে অবশ্য মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বিচার একাধিপত্য আজকাল আর আশা করতে পারা যায় না।

তাই শিক্ষার প্রত্যক্ষ কেন্দ্র হিসাবে এই সব ধর্মায়তনগুলির স্থান আজ আর তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু মানুষের মন থেকে ধর্মীয় প্রভাব আজ ক্ষীণতর হয়েছে মাত্র, একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই শিক্ষার কেন্দ্রে ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব আজো বড় কম নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনে আজও যথেষ্ট সক্রিয়। তাই সামাজিক জীব মানুষের উপর তার প্রচণ্ড প্রভাব নানাদিকে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বিশেষতঃ নীতিবাদও ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যদিও বর্তমান যুগে নীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় তবু প্রত্যেক ধর্মানুশাসনের মূল কথাই হল নীতি শিক্ষা। তাই বর্তমানের যুক্তিবাদী মানুষের মনও নীতিশিক্ষার ছদ্মবেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবকে মেনে চলতে বাধ্য হয়।

তা'ছাড়া ধর্মানুষ্ঠানগুলি আজকাল সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমানের বিবিধ পূজানুষ্ঠানগুলি ধর্মানুশীলন অপেক্ষা সামাজিক আনন্দ উৎসবের উপলক্ষ্য হিসাবেই পালিত হচ্ছে।

উপরন্তু যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, পাঁচালী প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের মূল অনুষ্ঠানগুলি আজ লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন।

সুতরাং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আজও মানুষের মনকে নিত্য নব অভিজ্ঞতার অনুশাসনে পরিচালিত করে চলেছে।

শিক্ষার পরোক্ষ কেন্দ্র হিসাবে অতঃপর নানাবিধ সংঘ সমিতি প্রভৃতি সামাজিক সংগঠনের নাম করতে হয়।

সংঘ সমিতি ও সামাজিক সংগঠন—

আগেই বলেছি, শিক্ষা বলতে শুধু পুস্তক নিবদ্ধ জ্ঞান বোঝায় না, এর অর্থ আরো ব্যাপক। নানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশায় ভাবের বিচিত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসার লাভ ঘটে।—সেই অভিজ্ঞতাই

হল শিক্ষা। সুতরাং নানাজাতীয় সংঘ সমিতির শিক্ষাদান কার্যটিও একেবারে নগণ্য নয়।

নানা উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে দল গড়ে। খেলাধুলা, আনন্দ উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ, প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষ্য বিভিন্ন সংগঠনের। এগুলি সাধারণতঃ স্বল্পকালস্থায়ী সংগঠন। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়েও মানুষ অনেক সময় দল গঠন করে। সেগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দল। বিভিন্ন রাজনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য শিল্পকলা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব দল গড়া হয় সেগুলির প্রভাবও মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী। এই সব সংঘ সমিতির মাধ্যমে মানব চরিত্রের এক একটা দিক পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) যুব আন্দোলন—

আজকাল সবদেশেই যুব আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যুব আন্দোলনের সার্থকতা প্রচুর। যুব সমাজের পরোক্ষ শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে এই যুব আন্দোলনের প্রভাবও অপরিসীম। বয়ঃসন্ধি কালে কিশোর-কিশোরীরা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে, জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করে এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং অমিত যুব শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে যুব সংঘগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থে নিজেদের দলগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপে যুব সংঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বলাই বাহুল্য, এ হল শক্তির অপব্যবহার। সমাজসেবা, দুর্গতসেবা, ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধন—এইগুলিই যুব সংঘগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৪) মুদ্রাযন্ত্র ও বক্তৃতামঞ্চ—

বর্তমান যুগে জনসাধারণের উপর এই দুটির প্রভাব অসাধারণ। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করে জনমত গঠনকার্যে মুদ্রাযন্ত্র, তথা সংবাদ-পত্রের জুড়ি নেই। বিভিন্ন দলের ও মতের বিভিন্ন সংবাদপত্র নিজ নিজ মতের সমর্থনে নানাপ্রকার তথ্য সন্নিবেশপূর্বক প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। পরিবেশনশৈলীর গুণে জনসাধারণের মনে এর ফলে গভীর রেখাপাত করে।—ফলে সংবাদপত্রগুলিই জনমত গঠনকার্যে আজকাল বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

বক্তৃতামঞ্চের মাধ্যমেও সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মতামত জনগণের মধ্যে প্রচার করে থাকেন, এবং তার ফলে সমাজের উপরে তাঁদের প্রভাবও সংক্রামিত হয়। বর্তমানে অবশ্য সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কার্যেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। তবে সমাজজীবনের নানা দিকে, বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক দিকে এই দুটি শক্তিশালী মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার অধিকতর কাম্য।

(৫) চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিসন—

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিসনের প্রভাব বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটির মধ্যে আবার চলচ্চিত্রের প্রভাব বোধহয় সর্বাধিক। চক্ষু ও কর্ণ উভয়েরই যুগবৎ ব্যবহারের সুযোগ থাকার ফলে মানুষের মনে এর আবেদন হয় গভীর। শিক্ষাদানকার্যে এই শক্তিশালী মাধ্যমটির সুষ্ঠু ব্যবহার পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল বিশেষভাবেই করা হচ্ছে—কিন্তু এদেশে এখনো এর তেমন প্রয়োগ দেখা যায়নি।

বেতারকেও আজকাল কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য করে না রেখে শিক্ষাদানের কার্যে ব্যবহার করলে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষাদানকার্যে চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিসন আজকাল ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে বেতারকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা সবে শুরু হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র স্থাপন করে খ্যাতনামা শিক্ষবিদগণের শিক্ষাদান-কৌশল প্রত্যেক ছেলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

টেলিভিসন অবশ্য এদেশে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ব্যাপক ব্যবহারের হয়ত এখনো বিলম্ব আছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই তিনটি শক্তিশালী মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

(৬) রাষ্ট্র—

শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়গুলির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রভাব ত আছেই, তাছাড়া, শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবেও রাষ্ট্রের স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অতীতকালে মানবগোষ্ঠীর উপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব যত বেশী ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তত বেশী ছিল না। ক্রমশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব কমতে

থাকে এবং সেই স্থানে সমাজ-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়ে। রাষ্ট্র তার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য নানাপ্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করে, আইন কানুন রচনা করে অধীনস্থ মানব-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

নানাপ্রকার সমাজ-উন্নয়নমূলক জনহিতকর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র। সেই দায়িত্বে জনগণকে অবহিত করে তুলবার জন্যে সরকার থেকে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার পুস্তক-পুস্তিকা, বুলেটিন, রিপোর্ট, পরিসংখ্যান তথ্য প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে থাকে। শিক্ষা উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকার সভা সমিতি সংঘ স্থাপন করে, গবেষণা কার্যে বৃত্তি দিয়েও সরকার পরোক্ষভাবে শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী প্রচার বিভাগ নানাভাবে মূল্যবান তথ্য প্রচার করেও জনসাধারণের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে থাকেন।

———

শিক্ষালয়—শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান

(School as Direct Educational Agency)

এতক্ষণ যে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করা গেল, বলাই বাহুল্য, শিক্ষাদান করা সেগুলির কোনটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানাজাতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শিক্ষাদান কার্য গৌণভাবে নির্বাহ হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু মানুষ একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কেবলমাত্র শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়েই—সেই প্রতিষ্ঠানের নাম বিদ্যালয় (School)। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদান করা। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে চলতে গিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে কি কি কাজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অতঃপর সংক্ষেপে সেই কার্যগুলির পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করা যাক্।

(১) **অনুপূরণ কার্য**—(Supplimentary function)

শিশুর শিক্ষা শুরু হয়েছে গৃহ পরিবেশ থেকেই। তারপর নানাপ্রকার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরন্তর শিক্ষার কাজ চলছে।—কিন্তু এইসব শিক্ষা ত কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে চলে না। লব্ধজ্ঞানের মধ্যে থেকে যায় অনেক ফাঁক, অনেক শূন্যস্থান। জ্ঞানের সেই সব শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে দেয় বিদ্যালয়।

বিভিন্ন স্থান থেকে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা মধ্যে সংযোগ সাধন করে দেয়। লব্ধজ্ঞানের অনুপূরক হিসাবে জ্ঞানকে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) **সংশোধন কার্য**—(Corrective function)

শিক্ষার পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেগুলির নাম করা হল সেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, সে কথা আগেই বলেছি। অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষার কাজটা ঘটে উপজাত হিসাবে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রভাব সব সময়েই যে মঙ্গলজনক হবে এমন কোন কথা নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী প্রভাবটাই প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়। বিদ্যালয়ের কাজ হল সব ক্ষেত্রে ঐ সব ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে মঙ্গলজনক প্রভাবটুকু বেছে নিতে সাহায্য করা।

দৃষ্টান্ত হিসাবে সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক। এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গলজনক প্রভাব অপেক্ষা রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাবে ছাত্রের মন বিষিয়ে দেবার সম্ভাবনাই অধিক। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় ছাত্রকে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে যেতে না দিয়ে সংবাদপত্রের যেটুকু গ্রহণযোগ্য, সেইটুকুই মাত্র বেছে নিতে সাহায্য করবে।

(৩) প্রতিরোধন কার্য—(Preventive function)

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, সংশোধন অপেক্ষা প্রতিরোধন কার্যকরী, (Prevention is better than cure.) এই সত্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইতিপূর্বে পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজবিরোধী ও নীতিবিরোধী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব প্রভাবের সংশোধন অপেক্ষা প্রতিরোধনের চেষ্টা করা আরো বেশী যুক্তিযুক্ত। সেই দায়িত্বও বহন করতে হবে বিদ্যালয়কে।

(৪) সমন্বয় কার্য—(Integrative function)

পরোক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি মারফত প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়। বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন মত, বিভিন্ন বক্তৃতার বিভিন্ন নির্দেশ, বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন ধরণের উপদেশ শিক্ষার্থীর মনে বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। বিদ্যালয় এই সব স্ববিরোধী মতগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীকে একটি কল্যাণকর নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

(৫) সংরক্ষণী কার্য—(Custodial function)

বর্তমানের এই সদাপরিবর্তনশীল জগতে আদর্শের পরিবর্তন ঘটছে, মতের ও পথের নব নব দিশা উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কিন্তু এই নিয়ত-পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও একটা অপরিবর্তনীয় সত্যের সন্ধান মিলবে প্রত্যেক জাতির চিন্তা ভাবনার মধ্যে। এই অপরিবর্তনীয় সত্যটিই হল জাতির ঐতিহ্য।

বিদ্যালয় হবে জাতির এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কিশোর মন যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিদ্যালয়ই এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে থেকে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারা সংরক্ষণ করে শিক্ষার্থীকে জাতির ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে চলতে সাহায্য করে।

(৬) উদ্দীপন কার্য—(Stimulative function)

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরণের ভাবধারার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থী কখনও উৎসাহিত হয়ে ওঠে, কখনও অবসাদগ্রস্থ হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মনে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনার প্রেরণা জুগিয়ে তার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

(৭) মূল্যায়ণ কার্য—(Evaluative function)

শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, এবং এক অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে অন্য অভিজ্ঞতার বিচিত্র সম্পদ সে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করে চলে। তবে এই সংগ্রহ কার্য সকলের দ্বারা সমান ভাবে হয় না। ব্যক্তিগত রুচি সামর্থ্য ও পরিবেশগত সুযোগ অনুসারে সঞ্চয়নের কাজও নানাজনের নানা-রকম। কিন্তু এই সঞ্চয় কার কতটা হল তা পরিমাপ করবার দরকার এবং সে ভারও রয়েছে বিদ্যালয়ের উপর। বিদ্যালয় শিক্ষা দান করে, নানা অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান সংগ্রহ করে এনে ছাত্রকে পরিবেশন করে কিন্তু এই পরিবেশিত জ্ঞান ছাত্র কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে সেটাও ধরা পড়ে বিদ্যালয়ে নানা-প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এই হিসাবে ছাত্রের অর্জিত জ্ঞানের মূল্য নির্ণয় করাও বিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ।

বিদ্যালয়—সমাজের প্রাণকেন্দ্র

(School as a Community Centre)

শিক্ষার্থীরা বাস করে নিজ নিজ গৃহ পরিবেশের মধ্যে, বিদ্যালাভ করতে যায় শিক্ষালয়ে। সুতরাং শিক্ষালয় ও গৃহ এই দুইটাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তবেই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ তত্ত্বটির সন্ধান পাওয়া যায়। এর কোন একটি অংশ বাদ দিলেই শিক্ষা হবে খণ্ডিত।

তাই বর্তমানে শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা অনুসারে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবন ও সামাজিক-জীবন একই সূত্রে গ্রথিত করতে হবে, শিক্ষালয়ের ছাত্রজীবন ও সমাজের বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে হবে। এ'ছাড়া শিক্ষালয়গুলির আরো একটা গুরুতর কর্তব্য পালনে তৎপর হবার প্রয়োজন আজকাল। আধুনিক কালের শিক্ষালয় কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা বিতরণের কেন্দ্র হয়েই থাকবে না, সমাজ-জীবনেরও সার্থক অভিব্যক্তি প্রকাশের কেন্দ্র হতে হবে তাকে। গ্রামীন্ সমাজ-জীবনের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ উৎসব শিক্ষালয়গুলিকে আশ্রয় করেই রূপায়িত করে তুলতে হবে। স্বাধীন দেশের শিক্ষালয়ের উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের গোড়ার কথাই হল জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এবং শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সংযোগ সাধন।

—এখন সমস্যা, কি করে এই দায়িত্ব পালন করা যায়। কেবল কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন এবং অবাস্তব তত্ত্বের চর্চা করেই বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হবে না। এখানে ছেলেমেয়েরা বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে, তবে শিক্ষা হবে সুসম্পূর্ণ এবং সার্থক।

অপরের সহযোগিতায় শিখবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে, সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির স্বার্থ বলি দিতে, আচারে আচরণে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিতে। তিরস্কার পুরস্কারের চাপে বাইরের থেকে চাপান শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার প্রেরণায় বিদ্যালয়ের বিবিধ অনুষ্ঠান যেন ভাল-ভাবে নির্বাহ করতে পারে ছেলেমেয়েরা—সেই দিকে শিক্ষক মহাশয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

একটা জিনিস আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকব যে ছেলেমেয়েরা যখন

নিজের থেকে বিদ্যালয়ের কোন উৎসব অনুষ্ঠানের বা নাটক অভিনয়াদির ব্যবস্থা করে তখন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ত বাইরে থেকে কোন চেষ্টাই করতে হয় না। সুতরাং বিদ্যালয়ের বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের দায়িত্বের উপরেই ছেড়ে দিতে হয়। ঐ প্রসঙ্গে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বটাই ছেড়ে দিতে হবে ছাত্রগোষ্ঠীর উপর। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কোন কর্মসূচী তৈরী করে ছাত্রদলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলার আর কোন প্রয়োজনই হবে না।

আগেই বলেছি, বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজেরই ছোট সংস্করণ—অর্থাৎ বৃহৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র সমাজ। এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সমাজ দুইটির মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে যে সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে তারই উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সাফল্য ও সার্থকতা। গৃহে এবং সমাজ-জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত কতরকম সমস্যার সম্মুখীন হই, কতরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করি। তারই উপর ভিত্তি করে যদি শিক্ষাদান করা যায় তবে সেই শিক্ষাই হবে বাস্তবধর্মী প্রকৃত শিক্ষা, পক্ষান্তরে বিদ্যালয়ে ছেলেরা যে শিক্ষা পাবে প্রাত্যহিক জীবনকে তা যেন প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোন স্থান যদি আবর্জনাময় নোংরা অস্বাস্থ্যকর হয় তবে সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সমবেত প্রচেষ্টায় তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলবেন এবং তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাসীদেরও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবহিত করে তুলবেন। মোট কথা, বিদ্যালয়ের প্রভাব পড়বে সমাজের উপর এবং সমাজের প্রভাবও যে বিদ্যালয়ের উপর পড়বে সেকথা ত বলাই বাহুল্য। সমাজের মধ্যে অনেক সময়ে এমন লোক থাকেন যাঁদের নানা বিষয়ে নানা-প্রকার অভিজ্ঞতা আছে, নানাপ্রকার জ্ঞান আছে, সেই সব অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকেদের মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, জ্ঞানের কথা ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করতে বলা যেতে পারে। এই ভাবে বৃহত্তর মানব-সমাজে ও ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা উচিত।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে 'অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি' (Parent-teacher Association) গঠন করা ভাল। এই সমিতির কাজের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে। কোন বিশেষ দিনে বা বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে ছাত্রের অভিভাবকবৃন্দকে বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে

এসে মেলামেশা আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা যায়। বিদ্যালয় তথা শিক্ষকদের উপর সমাজ যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে সেটা কিভাবে কতটুকু পালিত হচ্ছে বা পালিত না হবার কি কি প্রতিবন্ধক আছে সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষই অবহিত হবেন।

বিদ্যালয়কে আমরা সমাজবৃক্ষের ফুল বলে মনে করতে পারি। সমাজ থেকেই প্রাণরস সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে ফুটেছে সংস্কৃতির পুষ্প। এই যোগাযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সংস্কৃতির পুষ্পও যাবে শুখিয়ে, সমাজবৃক্ষও কুশ্রীতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সুতরাং শিক্ষার নূতন ভাবধারায় বিদ্যালয় হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের প্রাণকেন্দ্র। বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই সমাজের সংস্কৃতিমূলক চিন্তাধারা রূপ গ্রহণ করবে।

এই বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়দেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। শিক্ষকতা-বৃত্তিকে কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে না দেখে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকর্মের উপায় হিসাবে দেখলে শিক্ষালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে। শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁরা সমাজে একটি অতি প্রয়োজনীয় মঙ্গলকর কর্তব্যকর্ম সুসম্পাদন করছেন এই মনোভাব নিয়েই নূতন যুগের শিক্ষকদের কাজ করতে হবে।

কর্মের পথে কোন সমস্যা দেখা দিলে সকল শিক্ষক প্রধানশিক্ষক মিলে, এমন কি বিদ্যোৎসাহী অভিভাবকবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদ্যালয়ের সকল কাজে ত বটেই, এমন কি অনেক সামাজিক কল্যাণকর্মেও তাঁদের নেতৃত্ব করতে হবে। শিক্ষকবৃন্দের চারিত্রিক প্রভাব ছাত্রদের সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেবে।

আজকের ছাত্ররাই ত ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই শিক্ষালয়ের মধ্যে দিয়ে তারা শুধুমাত্র পুঁথিনিবদ্ধ জ্ঞান সংগ্রহ না করে চরিত্রবান সুনাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করতে শিখবে।

মোট কথা, নূতন যুগের অভ্যুদয়ে শিক্ষালয় সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা আজ একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষালয় আজ একটা সহজ সরল সুষম সমাজ। ছাত্রেরা এখানে দলবদ্ধভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় কাজ করতে শিখবে, এবং সেই কাজের মাধ্যমেই তাদের ভাবী জীবনের পথ রচিত হবে।

——

সমাজোন্নয়নে বিদ্যালয়ের দান

(The School as Contributor to Social Well-being)

সমাজের প্রয়োজনে সমাজ থেকেই কি ভাবে বিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটেছে ইতঃপূর্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সমাজোন্নয়নেও বিদ্যালয়ের দান অপরিসীম। সমাজ যেমন বিদ্যালয় গড়েছে, বিদ্যালয়ও তেমনি সমাজ গঠনে, রক্ষণে, ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সমাজ বলতে কি বুঝি ? কতকগুলি মানুষ একসঙ্গে থাকলেই তাকে সমাজ বলে না। সমাজ ব্যষ্টির গাণিতিক যোগফল মাত্র নয়। বহুমানবের একীভূত সত্বাই হচ্ছে সমাজ-জীবন। এবং একীভূত সত্বার মূল কথাই হল সামাজিকতাবোধ। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ত সমাজ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যদি এই সামাজিকতাবোধটি জাগ্রত না হয়, তাহলে কখনই সমাজ গড়ে ওঠে না।

কিন্তু সামাজিকতাবোধ কি করে জাগান যায় মানুষের মধ্যে ? শিশুকাল থেকেই যদি মানুষের মাঝে তা জাগান না যায়, তবে সে মানুষ হবে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী ও অসামাজিক—সামাজিক অগ্রগতির পথে সে হবে বাধাস্বরূপ। ভেঙ্গে পড়বে সমাজ বন্ধন, ব্যাহত হবে সভ্যতার অগ্রগতি।

—তাই বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব শিশুমনে সামাজিক বোধ জাগ্রত করে দেওয়া, আত্মকেন্দ্রিক শিশুকে সমাজ-কেন্দ্রিক মানুষে রূপান্তরিত করা।

বিদ্যালয় সমাজেরই সৃষ্টি একটা কৃত্রিম সমাজ। বিদ্যালয়ের কাজও প্রধানতঃ বিদ্যাদান হলেও পরোক্ষভাবে সমাজবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরী করা। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে সব অপূর্ণ ক্ষমতা, সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে বিদ্যালয় সেগুলি সযত্নে পরিস্ফুট করে তুলবে, এবং তাদের প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সমাজ।

আজকের দিনে যে সব শিশু বিদ্যালয়ের বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে দিয়ে ছোট্ট শেলেটটিতে অঙ্ক কষছে, হৈ হল্লা করছে, খেলা করছে, দুষ্টুমি করছে, আগামী দিনে তারাই হবে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদেরি হাতে তখন থাকবে সমাজ পরিচালনার ভার। আজ যাঁরা সমাজে নেতৃত্বের পতাকা হাতে

সামনের সারিতে এগিয়ে চলেছেন, সেই পতাকা তাঁরা আগামী দিনে দিয়ে যাবেন সমাজের যোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে। কিন্তু তার সংযোগ ঘটাবে কে? একমাত্র বিদ্যালয়ের মারফতই তাঁরা এই সংযোগটি ঘটাতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ই কেবলমাত্র অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগ ঘটিয়ে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—মানুষে মানুষে পার্থক্যের অন্ত নেই। বিদ্যা বুদ্ধি রুচি শক্তি সামর্থ্য চিন্তা—সব দিক দিয়েই ত প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন। এই সব বিচ্ছিন্ন একক পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সংহতিতে ত সমাজ গড়ে ওঠে না। তাই আপাতঃবিরোধী গুণাবলির মধ্যে থেকে তার সাঙ্গীকরণ ও সাধারণীকৃতি আবিষ্কার করা প্রয়োজন। মানুষে মানুষে এত পার্থক্য, এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এই সাধারণীকৃতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে সমাজ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের একটি প্রধান কাজ হল এই সব সাধারণীকৃতি আবিষ্কার। বিভেদের মধ্যেও একটা মিলনের সূত্র খুঁজে বার করা, যে সূত্র দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে জড়িয়ে বাঁধা যায়।

বিদ্যালয় তার প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মনে খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে তুলবে সংঘচেতনা (espirit-de-corps) বা যৌথ মনোবৃত্তি। এই হিসাবে সামাজিক সংশক্তি রক্ষাকল্পে বিদ্যালয়ের দান অপরিসীম।

তৃতীয় কথা—সমাজের নেতৃত্ব আজ যাঁদের হাতে রয়েছে, তাঁরাই ত চিরকাল থাকবেন না। তাঁদের হাত থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করা দরকার। বিদ্যালয় তার বিবিধ পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করতে সচেষ্ট হয়; তার আত্মিক মানসিক শারীরিক বৌদ্ধিক প্রভৃতি সমস্ত দিকের উন্নতি করাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। আদর্শ গণতান্ত্রিক মানুষ গঠন করাই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। যার যেটুকু ক্ষমতা লুকিয়ে আছে সেটুকু আবিষ্কার করা ও সুমার্জিত করে প্রকাশ করা—এই হল আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথা।

সেই হিসাবে জীবনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার মত যোগ্য ব্যক্তি সরবরাহ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিদ্যালয়।

সুতরাং বিদ্যালয় যেমন সমাজগঠনে সাহায্য করে তেমনি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের ধারাও অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ—মানুষে মানুষে আজ নিরন্তর হানাহানি। ঈর্ষা বিদ্বেষের হলাহলে পরিপূর্ণ হয়েছে মানুষের সমাজ। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবার আদিম প্রেরণায় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা, শ্রেণীসংগ্রাম, বর্ণবিদ্বেষ, অত্যাচার অবিচার আজ চারিদিকে ব্যাপকভাবে জাল বিস্তার করেছে। এর ফলে সামাজিক সংশক্তি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এর হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে গেলে শিশুকাল থেকেই সামাজিকতাবোধ শিক্ষা দেবার প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন।—একমাত্র বিদ্যালয়ের দ্বারাই এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার কথা আগেই উল্লেখ করেছি—এই প্রসঙ্গে জন ডিউইর ব্যক্তব্যটি উল্লেখ করি—

"—Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained. It involves many intellectual, social and moral qualities which cannot be expected to grow of their own accord."

———

শিক্ষনীয় বিষয় ও পদ্ধতি

১। ……যখন এমনতর প্রশ্ন শুনি—'আমরা কী শিখিব', 'কেমন করিয়া শিখিব', 'শিক্ষার কোন প্রণালী কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছে,' তখন আমার এই কথাই মনে হয় শিক্ষা জিনিসটা ত জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব, এবং আমরা কি শিখিব, এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যতবড়, তাহার চেয়ে বেশী জল ধরে না। —রবীন্দ্রনাথ

২। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা। —রবীন্দ্রনাথ

৩। Play is the agency employed to develop crude powers and prepare those powers for life's uses. —Karl Groos

৪। The real remedy for the evils of examinations would appear to lie in a closer relation between in teaching and the examining functions. —Raymont

৫। Spasmodic government is weak government.

—John Locke

৬। The curriculum is the child's introduction to life, as schooling is the preparation for it. —Monroe

৭। Learning without thinking is empty, thinking without learning is dangerous —Confucius

পাঠ্যক্রম নির্ধারণ

(Curriculum Construction)

পাঠ্যক্রম কি ?—

শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তাই নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুবিধ মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন দেশ যখনই কোনও একটা লক্ষ্য নির্বাচন করে নিয়েছে তখনই সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। মানব-জীবনের যে কয়েকটা বছর তার শিক্ষার কাল বলে নির্ধারিত, সেই কয়েকটি বছরের নিরলস সাধনার ফলেই মানুষ তার অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে চলে। এই সাধনার পদ্ধতিটিও নির্ধারিত হয় অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। লক্ষ্যে উপনীত হবার এই সাধন পদ্ধাতরই নাম হল পাঠ্যক্রম, অর্থাৎ শিক্ষার পথে গন্তব্যস্থানের নাম যদি শিক্ষার লক্ষ্য (aim), তবে সেই গন্তব্যস্থানে পৌছুবার পথের নাম হল পাঠ্যক্রম (curriculum)।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলি।

জ্ঞান অনন্ত। বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে এই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের কোন কোন অংশ শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করতে হবে সেইটেই প্রথমে স্থির করে নেবার দরকার। তারপর, শুধু বিষয় নির্বাচন করলেই হবে না, শিক্ষাকালের সমগ্র সময় জুড়ে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির শ্রেণীবিন্যাসও করতে হবে। —অর্থাৎ, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি বিষয় পড়তে হবে এবং কোন কোন শ্রেণীতে কতটুকু করে পড়তে হবে, সে সবই পাঠক্রম নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ্যক্রম নীতি—অতীতে ও বর্তমানে—

পাঠ্যক্রমের ইংরেজী প্রতিশব্দে কারিকুলম (curriculum)। এই শব্দটির অন্তর্নিহিত মূল অর্থের মধ্যেই পাঠ্যক্রম বলতে এককালে কি বোঝাত তার পরিচয়টি নিহিত রয়েছে। কারিকুলমের বুৎপত্তিগত অর্থ হল ঘোড়-দৌড় মাঠের ঘোড়া দৌড়ানর নির্দিষ্ট পথ (track)। ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া যেমন এই নির্দিষ্ট পথ (track) অনুসরণ করে চলতে বাধ্য হয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাবার পথ বেঁধে দেয় পাঠ্যক্রম (curriculum)। এই বাঁধা পথ ঘোড়ার পক্ষে যেমন অপরিবর্তনীয় তেমনি কারিকুলমের বাঁধা পথ ধরেই শিক্ষার্থী একদিন উপনীত হবে শিক্ষার গন্তব্যস্থলে। —এই ছিল সেকালের বিশ্বাস।

বর্তমানে অবশ্য পাঠ্যক্রম বা কারিক্যুলম সম্বন্ধে ধারণা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অনড় অপরিবর্তনীয় জড়ধর্মী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এককালে চলতে বাধ্য হয়েছিল শিক্ষার্থীরা, আজকাল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য ও সামাজিক পরিবেশ অনুসরণ করেই গঠিত হয় পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রমের এই পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগোচিত শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য অনুসরণ করেই। —কারণ সমাজের আদর্শ, সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে শিক্ষার আদর্শ এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কৌশল পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে।

এককালে কিছু জ্ঞান আহরণ করাই ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক। শিক্ষার লক্ষ্য আজ শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষ তৈরী করা নয়, গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শ নাগরিক তৈরী করা, তাই শিক্ষার পাঠ্যক্রম বর্তমানে যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল। খেলাধুলা, ব্যায়াম, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি কার্যগুলি এককালে যা ছিল পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত বিষয়, আজ তাই সহপাঠ্যক্রম বা পাঠ্যক্রমভুক্ত (co-curriculum) বলে গৃহীত।

অতীতের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিক্ষায় মানসিক শৃঙ্খলা-তত্ত্বের (theory of formal discipline) উপরে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হত।

এই তত্ত্ব অনুসারে এমন কতকগুলি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছিল যেগুলির অনুশীলন করলে নাকি বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ লাভ ঘটে। যেমন গণিতের চর্চা মনের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও জ্যামিতির চর্চা যুক্তি স্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও তার ব্যাকরণ মানসিক ধী-শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, কাব্য সাহিত্য মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে মার্জিত করে। —এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই ছাত্রের মানসিক শৃঙ্খলা সাধনের আশায় আপাত-অপ্রয়োজনীয় দুরূহ বিষয় নিয়ে সেকালের পাঠ্যক্রমকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হত।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব-গবেষণায় উক্ত মানসিক শৃঙ্খলা-তত্ত্বের ধারণা একেবারে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল শিক্ষার সঞ্চরণশীল শক্তির (Transfer of training) কোন অস্তিত্ব আছে বলেও স্বীকার করা হচ্ছে না।

এই তত্ত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল যে মানুষের মনের নাকি কতকগুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে, যথা—স্মৃতি, কল্পনা, একাগ্রতা ইত্যাদি। যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করে ঐ মানসিক বৃত্তিগুলির কোন একটি যদি চর্চা করা যায় তাহলে ঐ বৃত্তিটি সাধারণভাবেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং পাঠ্যক্রম নির্ধারণের সময়ে মনের ঐসব বৃত্তিগুলিকে ধার দেবার জন্যেই কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করা হত। এ ছাড়া বিষয়গুলির আর কোন সার্থকতা ছিল না। ইয়োরোপীয় বিদ্যালয়গুলিতে বহুদিন ধরে গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি কঠিন ক্লাসিক ভাষা ও তার ব্যাকরণের পঠন-পাঠনা চলেছিল এইসব মানসিক বৃত্তি-তত্ত্বের খাতিরে।

কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানের কোন পরীক্ষাতেই মনের এই স্বতন্ত্র বৃত্তি-তত্ত্ব (Faculty thory) বা শিক্ষায় সঞ্চরণবাদ (Transfer of training) সমর্থিত হয়নি। সুতরাং আজকাল পাঠ্যক্রম নির্ধারণে মনের বৃত্তি-তত্ত্ব বা শিক্ষার সঞ্চরণবাদ প্রভৃতির দিকে আর লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না।

বর্তমানের সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিটি ফলিত মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাই পাঠ্যক্রম নির্ধারণেও সেই মনোবিজ্ঞানেরই অনুমোদন চাই।

একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য অপরদিকে সমাজের দাবী ও সামাজিক পটভূমি এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য এই তিনের সার্থক সমন্বয় হবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মধ্যে। আগেকার পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে শুধু একটি সমস্যাই ছিল—কি পড়বে, বর্তমানের সমস্যা কে পড়বে, কেন পড়বে এবং কেমন করে পড়বে? এই তিনের জবাবের উপর নির্ভর করবে—কি পড়বে। এই দিক দিয়ে জাতীয় জীবনে পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব অনেক বেশী। পাঠ্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে জাতি কি চায়, কি তার আদর্শ।

এই সকল দিক বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করবার সময় কোন কোন নীতির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে এগোতে হবে, সেইটে আগে স্থির করে নিতে হয়।

শিক্ষার নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব :—

নীতির কথা বলতে গেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতিগত মত-বৈচিত্র্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। আগেই বলেছি পাঠ্যক্রম নির্ধারণে যে নীতি অনুসরণ করে চলা হয়, তা নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের উপরে, এবং সেই লক্ষ্যটি আবার নির্ভর করে জাতির জীবন-দর্শনের উপরে। অর্থাৎ যুগে

যুগে দেশে দেশে জাতিগত জীবন-দর্শন অনুসারে নিরূপিত হয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অনুসারেই নির্ধারিত হয় পাঠ্যক্রম।

সুতরাং পাঠ্য নির্ধারণের নীতি (Principle of Curriculum Construction) আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মূলকথাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাববাদী (Idealist)

ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ এই জগতের কারণস্বরূপে একটি পরম সত্ত্বার অস্তিত্ব অনুভব করেন। এই পরম সত্ত্বাই বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে মানবের মধ্যে। সেই হিসাবে জাতিগত ঐতিহ্যের মূল্য তাঁদের কাছে অপরিসীম। যুগে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল চিন্তা ও ভাবধারা আমাদের জন্য সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন সেই হল আমাদের উত্তরাধিকারের মহামূল্য সম্পদ। আমাদের ভাবী বংশধরদের কি সেই সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি?

সুতরাং পাঠ্যক্রমের মধ্যে পূর্বপুরুষদের আহৃত এই সব শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারের পরিচয় থাকা চাই। এই ভাববাদীগণ পাঠ্যক্রম নির্ধারণে শিশুর চাহিদা অথবা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অপেক্ষা জাতিগত দাবী বড় করে দেখেছেন। বর্তমান অপেক্ষা অতীত সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতিবাদী (Naturalist)

প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রকৃতিই হচ্ছে একাধারে মানবের শিক্ষাদাতা ও শিক্ষণীয় বিষয়। প্রকৃতির অকৃত্রিম সহজ সরল সংস্পর্শে এসে মানুষ একান্ত স্বাভাবিক ভাবে যে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানই হল সত্যকার জ্ঞান। সামাজিক জীবনের বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির স্থূল হস্তাবলেপে প্রকৃতির এই সরল স্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। প্রকৃতিবাদী রুশোর মতে প্রকৃতির হাত থেকে যা আসবে তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। মানুষের সংস্পর্শে এলেই তা নষ্ট হয়ে যাবে।—এই ধরণের প্রকৃতির অকুণ্ঠ স্তুতি ও মানবসমাজের প্রচণ্ড নিন্দা করেছেন রুশো।

সুতরাং শিশুর বর্তমান কালের অভিজ্ঞতার মূল্যই একমাত্র সত্য। অতীত বা ভবিষ্যতের প্রতি কোন মোহময় আকর্ষণ নেই প্রকৃতিবাদীদের। তাঁদের মতে প্রকৃতি থেকে যা স্বাভাবিকভাবে শেখা যায়, তাই শুধু পাঠ্যক্রমের

অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কোন রকম পুঁথিগত কৃত্রিম জ্ঞানের বোঝা শিশুর মাথায় চাপালে চলবে না।

জড়বাদী (Materialist)

জড়বাদীদের মতে শিক্ষার্থীর বর্তমান বাস্তব পরিবেশ মাত্র অবলম্বন করে পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। মৃত অতীত বা অজাত ভবিষ্যতের ব্যর্থ কল্পনার কোন স্থান নেই। শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জড়জগতের যাবতীয় সুখ-সুবিধা আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ লাভ করা। সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে যে সব জ্ঞান পৃথিবীর ইহলৌকিক সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির সহায়ক সেইগুলিমাত্র অনুশীলনযোগ্য, এবং সেইগুলিই জড়বাদীদের মতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রয়োগবাদী (Pragmatist)

এই মত একান্তই অর্বাচীন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই প্রকৃতপক্ষে এই নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রয়োগবাদীদের মূল কথা হল, কোন তথ্য বা তত্ত্ব সত্য হিসাবে গ্রহণ করবার পূর্বে তা যাচাই করে দেখতে হবে জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগযোগ্যতা কতটুকু, সার্থকতা কি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর উপযোগিতা কি ?

ডিউইর মতে শিক্ষা মানেই হল জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সমষ্টি। জীবন এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে তুলতে। এই বিকাশই হল জীবন এবং এই এগিয়ে চলা জীবনই হল শিক্ষা।—সুতরাং সীমাবদ্ধ কোন নির্দিষ্ট জ্ঞানকে শিক্ষার বিষয়বস্তু বলে মনে করা যায় না। তাই প্রয়োগবাদীদের মতে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনা করাও সম্ভব নয়।

সমগ্র জীবনের সংহত অভিজ্ঞতাই যদি শিক্ষার মূল কথা হয় তাহলে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিরাট পটভূমি বা কর্মক্ষেত্রকেই পাঠ্যক্রম বলে মনে করতে হয়।

প্রয়োগবাদীরা তাই শিক্ষার্থীর সদাপরিবর্তনশীল-পরিবেশ লব্ধ নিত্যনব কর্মপ্রচেষ্টাকেই পাঠ্যক্রম বলে মনে করেছেন। পুঁথিনিবদ্ধ কোন জ্ঞানকে তাঁরা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি।

সেইজন্য জন ডিউই তাঁর ল্যাবরেটারী স্কুলে প্রথমে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমেরই প্রবর্তন করেননি। অবশ্য পরে প্রয়োগবাদীরা পাঠ্যক্রমকে

একেবারে লোপ না করে শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরিবর্তনশীল করে নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এইভাবে দেখা গেল—বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন, তাই তাঁদের পাঠ্যক্রম-নির্ধারণের প্রণালীও হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের।

মোটকথা, পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার লক্ষ্যটি নিরূপিত হয়, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, দেশটাকে কিভাবে গড়তে চাই, তার ছাঁচটাই হচ্ছে পাঠ্যক্রম। সেইজন্যই পাঠ্যক্রমের এত গুরুত্ব।

পরাধীন ভারতের কর্তৃপক্ষ আমাদের যেভাবে গড়তে চাইত তার পরিচয়টি রয়ে গিয়েছে সেই আমলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদের বিশাল রথখানাকে আইন শৃঙ্খলার রশি বেঁধে দেশের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার মজুর গড়তে চেয়েছিল তারা এদেশে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষগড়া নয় পরমুখাপেক্ষী চাকুরিজীবী গ্রন্থকীট গড়া। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে সেই লক্ষ্যের পরিচয় মিলবে।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটি—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পাঠ্যক্রম আমাদের দেশে এখন প্রচলিত আছে, মুদালিয়র কমিশন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে সাতটি বড় বড় ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন—যথা—

(১) দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যেন কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি-ক্ষেত্র মাত্র। এ'ছাড়া তার আর কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই। পাঠ্যক্রমের চরম পরিণতি হল প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ অর্থাৎ কলেজে প্রবেশের একখানি ছাড়পত্র লাভ। এনট্রান্স (Entrance) বা ম্যাট্রিক্যুলেশন (Matriculation) শব্দ দুইটির মধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষার ঐ একমুখী লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে 'বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা' (School Final Examination)—এই ধরণের একটা নির্বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে।

(২) একান্ত পুঁথিগত—

কলেজীয় পাঠ্যক্রমের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে স্কুলের পাঠ্যক্রমের পুঁথির বোঝা বেড়ে গিয়েছে। তাই পাঠ্যক্রম হয়ে পড়েছে পুঁথিপ্রধান ও অবাস্তব। মাধ্যমিক স্তরের পরে সব ছেলেই হয়ত উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে না, সংসারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। সেক্ষেত্রে এই পুঁথিগত

বিদ্যা তাকে জীবনের পথে চলবার কোন পাথেয়ই দিতে পারবে না। কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে যে জ্ঞান লাভ হয় জীবনের ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে তা কোন কাজেই লাগে না। তাছাড়া মানসিক শক্তিচর্চার যতটুকু ব্যবস্থা এতে রয়েছে, দৈহিক শক্তিচর্চার কোন ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন বাস্তবজ্ঞান-বিবর্জিত কতকগুলি গ্রন্থ-পণ্ডিত সৃষ্টি করা ছাড়া এর আর কোন সার্থকতা নেই।

(৩) অনাবশ্যক তথ্য ভারাক্রান্ত—

পাঠ্যক্রম খুবই বড় এবং অনাবশ্যক তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত, অথচ তার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নেই—এমন অনেক বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলি শিক্ষার্থীর কোনদিনই কোন কাজে বা প্রয়োজনে লাগবে না এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যেও তারা নেই।—অথচ শিক্ষার্থীর মানসিক গঠনের দিক থেকে অপরিহার্য এমন অনেক বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৪) ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগের অভাব—

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে হলে যে সকল বাস্তব কার্যাবলির প্রবর্তন ও অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন, পাঠ্যক্রমে তার কোন স্থান নেই। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য হাতে-কলমে নানাপ্রকার কাজ করবার দরকার এবং সেই কাজের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে।

তাছাড়া পুঁথিগত ভাবে যা কিছু তারা শিখবে সেই সম্বন্ধে যদি কাজ করবার সুযোগ তারা পায়, তবে সেই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, গ্রন্থপাঠের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পায়।

(৫) কৈশোরের প্রয়োজন অস্বীকার—

কৈশোরের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয়নি। কৈশোরে বালক বালিকাদের নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রচলিত পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোন্ ছাত্র কি চায়, কোনদিকে তার আগ্রহ, কোন সন্ধানই তার নেওয়া হয়নি বর্তমান পাঠ্যক্রমে। বরং পিতামাতা কি চায়, কর্তৃপক্ষ কি চায়, সেইগুলোই একমাত্র বিবেচ্য হয়েছে পাঠ্যক্রমে।

মানুষে মানুষে যে রুচি আগ্রহ ও ক্ষমতার পার্থক্য আছে সেটাও আদৌ স্বীকার করা হয়নি।

(৬) পরীক্ষাশাসিত—

সমগ্র পাঠ্যক্রমটি একমাত্র পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই প্রভাবান্বিত। আগেই বলেছি মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হল কলেজীয়-শিক্ষায় প্রবেশের একখানি ছাড়পত্র সংগ্রহ। ছাড়পত্র সংগ্রহের অর্থ পরীক্ষা পাশ। তাই গাদা গাদা নোট-বই মুখস্থ করে সাধু ও অসাধু যে কোন উপায়ে হোক পরীক্ষাবৈতরণী পার হতে হবে—পাঠ্যক্রম নির্ধারণেও এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে স্রেফ মুখস্থের জোরেই যেন মোটামুটিভাবে পাশ করা যায়। পরীক্ষায় সফলতা লাভের দ্বারাই যেন পাঠ্যক্রমের সফলতা নির্ণয় করা হয়েছে।

(৭) কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব—

কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন স্থান নেই বর্তমান পাঠ্যক্রমে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে এখন দ্রুত শিল্প-প্রসার ঘটছে। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাবে এ প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কলা বিজ্ঞান, চারু ও কারুশিল্পে, খনিজ প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকে বিভিন্নস্তরের উপযুক্ত কর্মী তৈরী করা। কিন্তু কেবল মাত্র পুঁথিসর্বস্ব পাঠ্যক্রমে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

পাঠ্যক্রম রচনার বাস্তব নীতি—

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের এই সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার জন্য আমাদের পুরা শিক্ষাব্যবস্থাই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষাবিদেরা অনেক দিন থেকেই অবহিত আছেন এবং এই পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশন দেশের আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচনার বাস্তব নীতি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

শিক্ষার্থীদের রুচি ও শক্তিসামর্থ্য, দেশের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক পটভূমি এই তিনের সার্থক সমন্বয়ে একটি কার্যকরী ও বাস্তবধর্মী পাঠ্যক্রম রচনা করতে হলে যে মৌলনীতি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে এইবার সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করি।

(১) পাঠ্যক্রমের একটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা—

প্রথমেই শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম শব্দটির সংজ্ঞা ও তার সীমানা নির্দিষ্ট করে নেবার দরকার। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের কাজ কেবলমাত্র গ্রন্থনিবদ্ধ পাঠ্যবিষয়গুলির নির্বাচন ও শ্রেণীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকবে না—আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তার কাজ। শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয় জীবনে যা কিছু জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, আগ্রহ এবং মানসিক শারীরিক ও আত্মিক শক্তি অর্জন করবে সেই সমস্তই হবে তার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। [The curriculum may be defined as the totality of subject matter, activities and experiences which constitutes a pupil's school life—19th Century Year Book] গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উপযুক্ত নাগরিকরূপে শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীনভাবে গড়ে তুলতে হলে যা যা তার জানা দরকার, বোঝা দরকার এবং করা দরকার সমস্তই থাকবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে নয়, ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, গবেষণাগারে, অবসর বিনোদনের স্থানে, মেলামেশা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে নিরন্তর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, মনে রাখতে হবে, তার কোনটাই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত নয়। মুনরোর ভাষায় বলতে গেলে পাঠ্যক্রম হচ্ছে শিক্ষার্থীর জাতিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। [The curriculum is but eptomized representation to the child of the cultural inheritance of the race.—Monroe]

(২) কর্মকেন্দ্রিকতা—

লিখনপঠন-সর্বস্ব পুঁথিগতবিদ্যা কতখানি অবাস্তব ও নিরর্থক সেবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। সুতরাং পাঠ্যক্রম কেবলমাত্র পুঁথিগত বিমূর্ত চিন্তার আধার হবে না। হাতে-কলমে কাজ করবার ব্যবস্থাও থাকবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে।—কারণ কেবলমাত্র মস্তিক পরিচালনায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ হয় না। যথোপযুক্ত পেশী সঞ্চালনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

[The curriculum should be thought of in terms of activity and experience rather than of knowledge to be acquired and facts to be stored.—Spens' Report]

(৩) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—

—শিক্ষা কখনও দেশকাল নিরপেক্ষ হয় না। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখানকার সামাজিক পটভূমিকে বিস্মৃত হলে সে শিক্ষা হবে অবাস্তব। তাছাড়া ভাবী নাগরিকবৃন্দকে দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক করে তুলতে হলে তারও গৌরবময় পরিচিতি পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকা চাই।

(৪) **স্বয়ংসম্পূর্ণতা—**

বর্তমান পাঠ্যক্রম ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী অভিযান চলেছে কলেজীয় শিক্ষার দিকে। কিন্তু অনেক ছেলেই ত কলেজ পর্যন্ত যেতে পারবে না, মধ্য পথ থেকে যারা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে তাদের সেই স্বল্পার্জিত বিদ্যাটা কোন কাজেই লাগবে না। এত অর্থ সামর্থ্য ও সময়ের অপচয় ছাত্রের জীবনেও ক্ষতিকর।

তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে বিদ্যালয়-জীবনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূমিকামাত্র না হয়ে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রচিত হয়। জুনিয়র হাই স্কুলের পাঠ্যক্রমেও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করে চলতে হবে। এই শ্রেণী পর্যন্তই আমাদের দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা। সুতরাং এর পাঠ্যক্রমও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রচনা না করলে মাঝপথে থেমে-যাওয়া অগণিত ছাত্রের অপরিমিত অপচয় ঘটবে।

(৫) **ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্য—**

বর্তমান যুগের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথাই হল শিশুকে শিক্ষার উপযোগী করে তুলবার চেষ্টা না করে শিক্ষাকেই শিশুর উপযোগী করতে হবে। অর্থাৎ, বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের ব্যক্তি-বৈষম্য (individual differnce) অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা পায়।

কিশোরকালের পরের থেকেই ব্যক্তিগত রুচি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। তাই পাঠ্যক্রমে ৮ম শ্রেণীর পর এমন কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন, যার ভিতর থেকে শিক্ষার্থী তার রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারে।

কিন্তু সমস্ত বিষয়ই ত শিক্ষার্থীর পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকেও এমন কতকগুলি বিষয় থাকবে, যেগুলি অবশ্য-পাঠ্য।

পাঠ্যক্রমে তাই শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন উভয়েরই সমন্বয় করা হবে দুই জাতীয় বিষয় সন্নিবেশ করে। তাতে থাকবে অল্প কয়েকটি

অবশ্য-পাঠ্য কেন্দ্রীয় বিষয় (core subjects) এবং অনেকগুলি বৃত্তস্থ নির্বাচন-যোগ্য ঐচ্ছিক বিষয় (periphery subjects)।

(৬) বাস্তব মূল্যায়ন—

পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেগুলির নিজস্ব বাস্তব মূল্য বিচার করেই তা করা হবে। মানসিক শৃঙ্খলাসাধনের তত্ত্ব (disciplinary value) অথবা শিক্ষায় সঞ্চরণ-তত্ত্বের (Transfer of Training) দিকে লক্ষ্য রেখে কোন বিষয় গ্রহণ করা হবে না।

জীবনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে, সেইগুলিই মাত্র গ্রহণ করা হবে, অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়বাহুল্যে পাঠ্যক্রমকে অযথা ভারাক্রান্ত করা চলবে না।

(৭) পরিবেশ—

পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে যে সমাজে ও যে পরিবেশে তা প্রচলিত হবে তার কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। কৃষিপ্রধান দেশের গ্রামাঞ্চলে যে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন, শিল্পপ্রধান নাগরিক জীবনে তার প্রয়োজন তা থেকে স্বতন্ত্র। পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের সময় এই পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তা ও দাবীকে উপেক্ষা করে চললে সে পাঠ্যক্রম হবে একান্ত অবাস্তব। সেইজন্য পাঠ্যক্রম হবে যথোচিত নমনীয় (flexible), পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য। এককথায়, সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সার্থক সমন্বয় ঘটবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে।

(৮) অনুবন্ধ প্রণালী—

বর্তমানে পাঠ্যবিষয়ের আধিক্যে পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। (Compartmentation of subjects) চরম প্রয়োগে পরস্পর সম্বন্ধহীন বিষয় বাহুল্য ছাত্রের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে।

বিভিন্ন বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধহীনভাবে ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় বলেই পাঠ্যক্রমকে এত গুরুভার মনে হয়। অথচ অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে সমজাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিষয়-বিভাজন নীতির শিক্ষার চাপ (teaching load) অনেক কমে যায়।

মুদালিয়র কমিশন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সমজাতীয় কতকগুলি বিষয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করবার কথা বলেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিক বিজ্ঞান, ও

ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে না পড়িয়ে পরিবেশ-পরিচিতি (Social studies) নামে একটি বিষয় হিসাবে গণ্য করলে পড়ার চাপ অনেক কমে যায়। কারণ এই সব বিষয়গুলিই মানব সমাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সাধারণ-বিজ্ঞান (general science) নামে একশ্রেণীভুক্ত করা যায়।

(৯) অবসর বিনোদন—

মানবজীবনে কাজের যেমন প্রয়োজন আছে, বিশ্রামেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। অবসর কাজের বিপরীত নয়, কাজের পরিপূরক। ভাল ভাবে কাজ করতে যেমন শিখতে হয়, তেমনি ভাল ভাবে অবসর বিনোদন করতে জানাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা ভবিষ্যতে যেন সুরুচিসঙ্গতভাবে অবসর বিনোদন করার শিক্ষা বিদ্যালয় থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের কর্মবহুল জীবনচক্রে আবর্তিত হতে হতে মানুষের জীবন তার সমস্ত মাধুর্য হারিয়ে ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তাই কর্মজীবনের মধ্যে যখন অবসর আসে তখন কর্মহীনতার শূন্যতা জীবনকে লক্ষ্যহীন করে তোলে। এরই হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে চাই সুসঙ্গত অবসর যাপনের সার্থক শিক্ষা, খেলাধুলা, গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন বা ঐ জাতীয় কোন ললিতকলার চর্চা, বাগান তৈরী ইত্যাদি কোন একটা আনন্দময় কাজের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা খেয়াল (hobby) অবসর সময়ে ছুটির আনন্দ এনে দিতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এদের স্থান থাকা একান্ত আবশ্যক, যাতে বাল্যকাল থেকেই মানুষ তার রুচি অনুসারে কোন একটা সুন্দর খেয়াল (hobby) অভ্যাস করে নিতে পারে।

(১০) মনস্তত্ত্বনির্ভর—

অবশেষ কথা এবং চরম কথা হল পাঠ্যক্রম নিছক যুক্তিতত্ত্বের (logic) উপর ভিত্তি করে না গড়ে মনস্তত্ত্বের (Psychology) উপর নির্ভর করে গড়তে হবে। শিশুমন ও কিশোর মনকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গড়ে উঠেছে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান। সুতরাং পাঠ্যক্রমের মূলনীতিগুলি যদি সেই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে পাঠ্যক্রম রচনাটা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(১১) বৃত্তি পরিচিতি—

সাধারণ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে অবশ্য বৃত্তিশিক্ষার কোন নিগূঢ় সম্পর্ক নেই তবু পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিল্প সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

একে ঠিক বৃত্তিশিক্ষা বলব না। ছাত্রের নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু পরিচয় থাকলে ভবিষ্যতে বৃত্তি নির্বাচন করবার হয়ত সুবিধা হতে পারে।

পরিশেষে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জেমস্ এবং ল্যাং পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মূলনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে অল্প একটি কথায় পাঠ্যক্রমের যে একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সেইটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করেই প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁরা বলেন মানুষকে যুগপৎ সংস্কৃতিপরায়ণ ও সামাজিক-দায়িত্বশীল নাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে যে সব বিষয়, অবস্থা, পরিবেশ ও কর্ম-কৌশলের প্রয়োজন, তারি সার্থক নির্বাচন হচ্ছে পাঠ্যক্রম। এই ছোট্ট সংজ্ঞাটির মধ্যেই পাঠ্যক্রমের মূলনীতিটি বলা হয়ে গেল।

[The fundamental principle of an educational curriculum is the selection of meterials along with the planning of situation, activities, and sequences, so that from the learner's reactions to these organised experiences will accrue significant information, useful habits, and such emotionalised outcomes as are considered essential to personal culture and social participation. —James and Lang.]

———

পরীক্ষা

(Examination)

পরীক্ষা কেন ?

বিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষাদান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে তাদের বয়স রুচি সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু এই শিক্ষাদান কার্য কতটা সফল হল, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত শিক্ষা কি পরিমাণ গ্রহণ করতে পারল তারও একটা পরিমাপ করা প্রয়োজন। এই পরিমাপ কার্যই হল পরীক্ষাগ্রহণ। এই হিসাবে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ এই দুটি কার্যই অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। প্রথম কার্যটির সফলতা-বিফলতার বিচার হবে দ্বিতীয় কার্যটির দ্বারা। এই বিচারের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে দেখতে পারি—

প্রথমতঃ **বিদ্যালয়ের দিক**। বিদ্যালয় তার শিক্ষাদান কার্যে কি পরিমাণ সার্থক হল, কোন ছাত্রটির শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু, কে কোন বিষয়ে কতটা পেছিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিদ্যালয় তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবে না। পরীক্ষার মানদণ্ডে বিচার করে তবেই বিদ্যালয় তার সামগ্রিক উন্নতি-অবনতির হিসাব করতে পারবে। এই হিসাবে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়তঃ **ছাত্রের দিক**। ছাত্রের পাঠোন্নতির পরিচয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জানা যেমন প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছাত্রের নিজের জানার। ছাত্র পড়াশুনা করে, নানাবিধ জ্ঞানের কথা আহরণ করে, কিন্তু সেই পড়াশুনা কতটুকু তার কাজে লাগছে, সেই জ্ঞান কতটুকু তার আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে, তার খবর পাওয়া যাবে একমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে।

তৃতীয়তঃ **অভিভাবকের দিক**। অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানর জন্য বিদ্যালয়ে দিয়েছেন, বিদ্যালয় সেই কাজ কতটা করতে পারছে এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণে কতটা উপকৃত হচ্ছে তারও পরিচয় মিলবে পরীক্ষার ফলে।

চতুর্থতঃ **সরকার বা কর্তৃপক্ষের দিক**।—সরকার তাঁর প্রজাবৃন্দের শিক্ষোন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, কিন্তু সেই অর্থব্যয় কতটা সার্থক হচ্ছে তার খবর কর্তৃপক্ষের জানা দরকার। পরীক্ষার ফলের সাহায্যেই সেই খবর পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ **সমাজের দিক**। বিদ্যালয় একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজের একটা গুরুদায়িত্ব পালনের ভার বিদ্যালয়ের উপর। সেই দায়িত্ব কি পরিমাণে পালিত হচ্ছে, সেকথা জানবার অধিকার আছে সমাজের। বলাই বাহুল্য পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যেই সমাজ সেই কথাটি জানতে পারে।

পরীক্ষায় প্রথার ঐতিহাসিক পটভূমি—

যতদিন থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু শিক্ষা দেবার প্রথা শুরু হয়েছে পরীক্ষাপ্রথাও ততদিন থেকেই চলে আসছে, মনে করা যেতে পারে। তিন চার হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে ব্যাপকভাবে পরীক্ষাপ্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তারো আগে কোথায় কি ছিল তার কোন ইতিহাস নেই। প্রাচীন ভারতে গ্রীসে রোমে বা অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র-গুলিতে গুরু-শিষ্যের আলাপ-আলোচনার, উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে অধীত বিদ্যার যাচাই হত। মধ্যযুগে ইয়োরোপে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই পরীক্ষা সাধারণতঃ গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করে বা মৌখিক ভাবে গ্রহণ করা হত। এখনকার মত লিখিত পরীক্ষার প্রথা খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে এই প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় এবং তারপর থেকেই সমগ্র দেশে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। আমাদের দেশে গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এই প্রথা সম্ভবতঃ শুরু হয়েছিল। সেই থেকে আজ অবধি একই ভাবে চলে আসছে এই প্রথা। স্কুল কলেজে প্রশ্নের লিখিত উত্তরের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে নিম্নশ্রেণীতে লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে প্রায় সবদেশেই।

পরীক্ষা গ্রহণের সার্থকতা—

পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তার সার্থকতা কী? পরীক্ষার দ্বারা আমরা কি জানতে পারি, কতটুকু জানতে পারি এ সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পরীক্ষা প্রথার সবচেয়ে প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের কতটুকু জ্ঞান শিক্ষার্থীর আয়ত্তে এসেছে পরীক্ষার দ্বারা তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। স্কেল ফেলে যেমন বিভিন্ন জিনিসের ওজন বা দৈর্ঘ্য মাপা যায়, পরীক্ষা প্রথার স্কেলেও তেমনি অর্জিত জ্ঞানের মাপ ঠিক করা হয়। একই শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যেও একটা তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় পরীক্ষার সাহায্যে।

পরীক্ষা প্রথার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা যাচাই করা। এক বৎসর পঠন-পাঠনার পরে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করবার সময়ে ছাত্রের মানসিক সামর্থ্যের পরিমাপ করা প্রয়োজন। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে কিনা তা বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখে যাচাই করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনান্তে কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ততা কি পরিমাণ অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করবার জন্য আমাদের দেশে ম্যাট্রিক্যুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা। ম্যাট্রিক্যুলেশন বা এণ্ট্রান্স কথাটার অর্থই হল প্রবেশিকা, অর্থাৎ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের প্রবেশপত্র। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সেখানে কেবলমাত্র অতীত উন্নতির পরিমাপ নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিচার। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় পরীক্ষা শিক্ষার নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে প্রবেশের মুখে অযোগ্যপ্রার্থী ছাঁটাই করতে কাজে লাগে।

পরীক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্য দেশের কাজে যোগ্যতর কর্মী নির্বাচনে সহায়তা করা। দেশের কার্য পরিচালনায় সরকারী বা বেসরকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানে যখন কর্মী নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন একমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই নিরপেক্ষভাবে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ্য প্রার্থীদের গুণানুসারে তালিকা প্রণয়ন করাও হয়ে থাকে।

পরীক্ষার চতুর্থ উদ্দেশ্য শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার। ছাত্রের যোগ্যতা বিচারের কথা ত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা কেবল যে ছাত্রের যোগ্যতাই নিরূপিত হয় তাই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষকের যোগ্যতাও নিরূপিত হয়ে থাকে।

শিক্ষক কি ভাবে শিক্ষাদানের কর্তব্য পালন করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে ছাত্রদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ দ্বারা। সুতরাং ছাত্রের পরীক্ষার সুফল শিক্ষকের শিক্ষকতার কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই হিসাবে ইংলণ্ডের

প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে এককালে ছাত্রের পরীক্ষার ফলদৃষ্টে শিক্ষকদের বেতন দেবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশে টোলে অদ্যাবধি এই জাতীয় প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। তাছাড়া অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা না থাকলেও বিদ্যালয়ের যোগ্যতা নিরূপিত হয় পরীক্ষার ফলের নিরিখ ধরেই। এবং সেই নিরিখ অনুযায়ী বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন লাভ করে। পর পর কয়েক বছর কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়ে গেলে সরকার সেই বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারেন।

পরীক্ষার পঞ্চম উদ্দেশ্য ছাত্রের রুচি ও প্রবণতা বিচার। বিদ্যালয়ে বহু বিষয়ের পঠন-পাঠনা হয়—কার কোনটা ভাল লাগবে, জ্ঞানের কোন পথে গেলে কোন শিক্ষার্থী উন্নতি করতে পারবে, এই সমস্ত বিষয়ের পথপ্রদর্শক হচ্ছে পরীক্ষার ফল। যে ছেলে অঙ্ক বা বিজ্ঞান বিষয়ে ভাল করতে পারে না, অথচ সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষার ভাল ফল দেখায়, সেই ছেলেকে জোর করে ইঞ্জিনিয়ার করতে চাইলে ভুল হবে। এই দিক দিয়ে পরীক্ষা প্রথা শুধু অতীত জ্ঞানের খবরই রাখে না, ভবিষ্যৎ জ্ঞানেরও পথ দেখায়—

ষষ্ঠ উদ্দেশ্য হিসাবে বলা যায় পরীক্ষার মাধ্যমে অধীত বিদ্যার পরিচয় ছাড়াও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুততা, চিন্তাশীলতা, সংযম প্রভৃতি গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তম উদ্দেশ্য অধীত বিদ্যা বার বার অনুশীলন দ্বারা মার্জনা করা। সাধারণতঃ দেখা যায় ছেলেরা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠনার সময়ে তেমন আগ্রহশীল নয়। পরীক্ষার সময়েই তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়ে, পুরানো পাঠের জোর অনুশীলন চলে।

অষ্টম উদ্দেশ্য পাঠ্যগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে পঠন-পাঠনা করবার উৎসাহ দান। পরীক্ষা ভাল করবার জন্য সাধারণতঃ উৎসাহী ছেলেমেয়েরা নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করতে উৎসাহিত হয়।

পরীক্ষার কুফল ও তার প্রতিকার—

এতক্ষণ ধরে পরীক্ষা গ্রহণের যে সব বিভিন্ন প্রকার সুফলের কথা আলোচনা করা হল, কার্যক্ষেত্রে আমাদের দেশে কিন্তু তার কোনই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। বরং অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রায় বানচাল হয়ে যাবার অবস্থা ঘটেছে। আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটি আজ পরীক্ষা-প্রথা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং সেই পরীক্ষা-প্রথাটি আবার প্রশ্নপত্র

বাছাই করে মুখস্থ করবার অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা-সংস্কারকেরা যত পরিকল্পনাই করুন পরীক্ষাপ্রথার প্রভাবে পড়ে তা সবই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আজ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যতগুলি কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা ব্যবস্থার অবাঞ্ছিত প্রভাব দেখে শঙ্কিত হচ্ছেন। এবং বারবার তার সংশোধনের কথা বলে গিয়েছেন—তবু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি।

স্যাডলার কমিশন বলেছেন—'বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই হল চাকরি সংগ্রহের প্রধান উপকরণ। তাই এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির ছাড়পত্র সংগ্রহ। সুতরাং শিক্ষাসংস্কারের জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হল পরীক্ষা সংস্কারের।

পরীক্ষার কুফল দেখে কোন কোন সংস্কারক পরীক্ষা প্রথাটাই একেবারে উঠিয়ে দেবার কথা বলেছেন। কেউ কেউ বহিস্থ পরীক্ষার পরিবর্তে অন্তস্থ পরীক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন। মোটকথা বর্তমান পরীক্ষা প্রথার আমূল সংস্কারের কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন— রাধাকৃষ্ণ-কমিশন বলেছেন—শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র সংস্কার করতে হয় তাহলে সেটি হবে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার। পরীক্ষাপ্রথা একেবারে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলেও অবিলম্বে তার যথোচিত সংস্কার প্রয়োজন।

[...If we are to suggest one single reform in university education it should be that of examinations......dissatisfaction with examinations has been so keen that eminent educationists and important educational organizations have been advocated the abolition of examinations. We do not share that extreme view and feel that examinations rightly designed and intelligently used can be a useful factor in the educational procees. If examinations are necessary, a thorough reform of these is still more necessary. —The report of the Univ. Edu. Com. (1948-49)].

মুদালিয়ার কমিশনও পরীক্ষার গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করবার কথা সুপারিশ করেছেন। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির ত্রুটি হিসাবে উল্লেখ করা যায়—

(১) সারা বছর ধরে যে জ্ঞান অর্জন করা গেল বৎসরের শেষে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তার বিচার করবার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না।

পাঠ গ্রহণের পরিবেশ ও পরীক্ষাদানের পরিবেশ একেবারেই বিভিন্ন, সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষার্থীর মন কখনই স্বাভাবিক ভাবে উত্তরদানে উন্মুখ থাকতে পারে না।

(২) শেষ পরীক্ষার ঘণ্টা তিনেক প্রচেষ্টার উপর সারা বৎসরের মূল্যায়ন হয় বলে পরীক্ষা-কক্ষে নানবিধ অসাধু উপায়ের উদ্ভব ঘটে। যেমন তেমন করে গোটা তিন-চার প্রশ্নের উত্তর ব্যবস্থা করতে পারলেই যেখানে অনিবার্য সফলতা, সেখানে জ্ঞানার্জনের অবিচ্ছিন্ন সাধনা একান্ত বাহুল্য বলে মনে করা স্বাভাবিক। পরীক্ষার দিন কয়েক আগে প্রশ্ন বাছাই করে রাত জেগে নোট মুখস্থ করে নকল করে যেন-তেন-প্রকারে পরীক্ষার বেড়াটা টপকে যাবার সাধনায় মেতে ওঠে ছেলেরা।

(৩) সবচেয়ে দুঃখের কথা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারাটা একান্ত ভাবেই পরীক্ষা-শাসিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচার হয় আজকাল পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট সংগ্রহের দ্বারা। তাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে পুরাতন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রভাবে। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ওয়েষ্ট সাহেব তাই দুঃখ করে বলেছিলেন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন পেনিলোপির জাল। একদিক দিয়ে শিক্ষা-সংস্কারকেরা তা গড়ে তুলতে চাচ্ছেন, অন্য দিক দিয়ে পরীক্ষকেরা তা দিচ্ছেন ভেঙ্গে। (Education is like the webs of Penelope—what teachers do, the examiners undo.) সুতরাং শিক্ষা-সংস্কারের মূল কথাটাই হল পরীক্ষা-সংস্কার। তা নইলে কোন সংস্কারই কার্যকরী হবে না। এ বিষয়ে শ্রীহুমায়ুন কবিরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"—আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার মর্যাদা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়েছে। ছাত্র উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করেছে কিনা, তার বিভিন্ন বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশ হয়েছে কিনা তা জানবার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষাই ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ......ফলে ছাত্রছাত্রীরা সারা বৎসর লেখাপড়ায় অবহেলা করে

এবং পরীক্ষার ঠিক আগে কয়েক সপ্তাহ দিনরাত খেটে পরীক্ষা-সাগর পাড়ি দিতে চায়। পরীক্ষায় যে-সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার বাইরে জ্ঞান জগতের দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতে চায় না। ফলে কোন বিষয় ঠিক ভাবে আয়ত্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।……

মোটকথা, ছাত্রের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি অবনতির কোন সন্ধান না নিয়ে গুটিকতক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের ক্ষমতাই যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হয়, তা হলে কোন প্রকারে পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রশ্নকটির সঠিক উত্তরের ব্যবস্থা করার দিকেই পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ হবে বেশী। তার ফলেই আসবে 'না-বুঝে মুখস্থ করার' বদঅভ্যাস—বাছাই করে পড়ার বদঅভ্যাস, এমন কি পরীক্ষা ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনের বদঅভ্যাস।

পরীক্ষায় যা আসবে না, জানার দিক দিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই ছাত্রদের কাছে। শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় ঢেলে দিয়ে আসতে পারলেই বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে সে পাবে সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ সার্থক ভাবেই বলেছেন—"পরীক্ষার ঘরে যে ছেলে চাদরের মধ্যে লুকাইয়া বই লইয়া যায় সে পায় শাস্তি, আর যে ছেলে তারচেয়ে খারাপ, মগজের মধ্যে লুকাইয়া বই লইয়া যায়, সে পায় পুরস্কার—"

মোটকথা পরীক্ষা-শাসিত পড়ায় পরীক্ষার জন্যই পড়া, পড়ার জন্য পরীক্ষা নয়। (Work is to meet the examination and not examination to test the work—Wren)—এই দোষ দূর করবার জন্য রেন সাহেব প্রস্তাব করেছেন প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে নিজস্ব কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকলে সম্পূর্ণ উত্তর করা যাবে না। পরীক্ষার হলে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের অনুমতি দিলে এবং তা থেকে নিজস্ব মন্তব্য দেবার কথা জিজ্ঞাসা করলে নির্বোধ মুখস্থের স্থান থাকবে না।

কুইক্ সাহেব ত প্রস্তাব করেছেন অঙ্ক অনুবাদ রচনা এই সব স্বাধীন চিন্তার বিষয়গুলি প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা হোক আর ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি ঘটনামূলক বিষয়গুলি শেষ-পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করাই ভাল।

মুদালিয়ার কমিশনও কতকগুলি বিষয় পড়ার জন্য সুপারিশ করেছেন কিন্তু পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে বারণ করেছেন।

পরীক্ষার প্রকার ভেদ—

এতক্ষণ ধরে পরীক্ষাপ্রথার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা এবং সেই সঙ্গে

পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা গেল। আগেই বলেছি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গই হল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা কার্যটি আমাদের দেশে কিভাবে পরিচালিত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করলে তবেই পরীক্ষা পদ্ধতির সার্থকতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

পরীক্ষা সাধারণতঃ পরিচালিত হয়ে থাকে দুইভাবে—(১) **লিখিত ভাবে** ও (২) **মৌখিক ভাবে**

আজকাল অধিকাংশ পরীক্ষাই লিখিত ভাবে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে বসে যে সব উত্তর দিয়ে থাকে, পরীক্ষক অবসর সময়ে তা পড়ে তা থেকে যোগ্যতা নিরূপণ করেন।

মৌখিক পরীক্ষার বিচার সাথে সাথে। সাধারণতঃ শিশু শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কারণ তখনও তারা ভাল করে লিখতে শেখেনি বা লেখা প্রশ্ন পড়ে মানে বুঝতে শেখেনি। বড়দের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাতেও মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন আছে। কারণ লিখিত উত্তরের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানাবলির পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যেই। তাই প্রতিযোগিতামূলক চাকরির ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার (viva voce) মূল্য এত বেশী। তারপর পরীক্ষা পরিচালনার দিক থেকেও একে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা (ক) **অন্তস্থ** (internal) **পরীক্ষা,** (খ) **বহিস্থ** (external) **পরীক্ষা**।

(ক) বিদ্যালয় যখন নিজস্ব পরিচালনায় পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে তার ছাত্রদের উন্নতি অবনতির পরিমাপ করে তখন সেই পরীক্ষাকে অন্তস্থ পরীক্ষা বলা হয়। বার্ষিক ক্রমোন্নতির বিচার সাধারণতঃ অন্তস্থ পরীক্ষার সাহায্যেই গৃহীত হয়ে থাকে। তাছাড়া সাপ্তাহিক মাসিক ত্রৈমাসিক পরীক্ষার দ্বারাতেও বিদ্যালয় তার ছাত্রদের ক্রমোন্নতির ধারা সম্বন্ধে অবহিত থাকে।

(খ) বহিস্থ পরীক্ষা পরিচালিত হয় বিদ্যালয়ের বাইরের কোন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক। একই প্রশ্নপত্রের দ্বারা একই মাপ অনুযায়ী বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উন্নতির পরিমাপ করাই হল বহিস্থ পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

অন্তস্থ পরীক্ষার দ্বারা বিদ্যালয় তার নিজের ছেলেমেয়েদের মান নির্ণয় করে। এই মান বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পক্ষে বিভিন্ন হতে বাধ্য—সুতরাং এর দ্বারা দেশের সমগ্র পরীক্ষার্থীর তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয় না। এই

জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, জেলা স্কুল বোর্ড বা ঐ জাতীয় সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা দ্বারা বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একটা তুলনামূলক বিচার চলে। এবং কোন একটা নির্দিষ্ট মান অনুসারে সকল ছাত্রের পাঠোন্নতির পরিমাপ করা চলে। এই পরীক্ষায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যোগ দিতে পারে বলে একে সার্বিক পরীক্ষাও (Public examination) বলা হয়।

বহিস্থ পরীক্ষারই আর একটি প্রকার ভেদ হল **প্রতিযোগিতামূলক (Competetive) পরীক্ষা**। নির্দিষ্ট চাকুরিতে লোক নিয়োগের জন্য সাধারণতঃ প্রতিযোগিতা মূলকপরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।—এই জাতীয় পরীক্ষায় কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হওয়াই বড় কথা নয়, প্রতিযোগিতার নির্বাচিত হওয়াই হল উদ্দেশ্য।

সরকার থেকে নানা রকম বৃত্তিমূলক কাজে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় বুদ্ধিমান ছেলেদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়—এবং জ্ঞানচর্চারও প্রসার ঘটে।

প্রশ্নপত্রের মাননির্ণয়

পরীক্ষার মূল কথাই হল প্রশ্নপত্র নির্মাণ।

কোন কিছু পরিমাপ করতে গেলে প্রথমেই দরকার একটা নির্দিষ্ট মাপক। মাপকাঠি কতই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য হয়, মাপকের গণনা ততই নির্ভুল হবার সম্ভাবনা। পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র হচ্ছে সেই মাপক দণ্ড, যার সাহায্যে আমরা অর্জিত বিদ্যায় পরিমাপ করি। সুতরাং প্রশ্নপত্রকে নির্ভুল মাপক হিসাবে তৈরী করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability)—যে মাপকাঠি দিয়ে মাপা হচ্ছে সেটা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। একটা নির্দিষ্ট কাপড়ের টুকরো গজ-কাঠি দিয়া মাপতে গেলে যদি দেখা যায় একবার সেটা তিন গজ হচ্ছে, আর একবার হচ্ছে দুই গজ তাহলে বুঝতে হবে গজ-কাঠিটা নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য নয়। পরীক্ষার একই খাতা একজনের কাছে ৫০ আর একজনের কাছে ৪০ পেলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-রূপ মাপকাঠিটাকে আদৌ নির্ভরযোগ্য বলা চলবে না।

(২) **সত্যতা** (Validity)—যে জিনিসটা মাপতে চাচ্ছি সেটি ছাড়া অন্যকিছু মেপে বসলে মাপটা সত্য মাপ হল না। চাল মাপতে গিয়ে সেই সঙ্গে

চালের বস্তার ওজনটাও যদি ধরেনি তাহলে চালের সত্য মাপ পেলামনা। ইতিহাস-জ্ঞানের পরীক্ষা করতে গিয়ে ভাষার বাহাদুরি, বর্ণনার কৌশল, হস্তাক্ষর ইত্যাদির দ্বারা যদি ইতিহাস-জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রভাবিত হয় তাহলে তার সত্য বিচার হল না।

(৩) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity)—মাপকাঠিটা এমন হওয়া দরকার যাতে রাম শ্যাম যদু যে যখনই মাপুক মাপটা যেন এক থাকে। রামের কাছে যেটা তিন সের শ্যামের কাছে সেটা দুই সের হলে মাপকাঠিটা ভুল আছে বুঝতে হবে। রামবাবু বড় ভাল লোক, যে খাতায় তিনি ৬০ নম্বর দিলেন কড়ালোক শ্যামবাবু তাতেই ৩০ নম্বরের বেশী দিতে চাইলেন না। পরীক্ষার মাঝে ব্যক্তিগত মনমেজাজ মর্জির প্রভাব পড়লে সত্যকার মূল্যায়ন ঠিক হবে না।

আদর্শ মাপকাঠির এই সব গুণগুলির কথা স্মরণ রেখে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি যে ভাবে চলেছে তার আলোচনা করা যেতে পারে। পরীক্ষা-পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

যথা—(১) পুরাতন পদ্ধতি (old type) বা ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (subjective type) রচনাধর্মী পদ্ধতি (essay type)

(২) নূতন পদ্ধতি (new type) বা বহুমুখী পদ্ধতি (objective type)

(৩) প্রয়োগসিদ্ধ বা আদর্শীকৃত মানের পদ্ধতি (standardised type)

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ও তার সমালোচনা—

(১) এদের মধ্যে পুরাতন বা রচনাধর্মী পদ্ধতিই আজকাল বহুল প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নের যে সব উত্তর চাওয়া হয় তা রীতিমত রচনার সঙ্গে লিখতে হয়। পরীক্ষক পরে সেই রচনা পাঠ করে তা থেকে পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমানের এই রচনা-নির্ভর পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যটাই একেবারে ব্যর্থ হচ্ছে বলে সকল শিক্ষাবিদ একমত। কারণ এই জাতীয় পরীক্ষার বিচার আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পরীক্ষাপদ্ধতি দুটো অংশে বিভক্ত—প্রথমতঃ পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র রচনা ও দ্বিতীয়তঃ উত্তরপত্র পরীক্ষা। এই দুটি অংশেই প্রচুর ত্রুটি, প্রচুর গলদ রয়েছে। আদর্শ মাপকাঠির যে তিনটি অপরিহার্য গুণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দেখা যাবে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে তার কোনটাই নেই।

প্রথমেই বলি **প্রশ্নপত্র** রচনার কথা।

(১) প্রথমতঃ রচনাধর্মী পরীক্ষার একএকটি প্রশ্নের উত্তরে অনেকখানি করে লিখতে হয় বলে অধীত বিষয়ের অতি সামান্য অংশই পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা যায়। .০০ নম্বরের জন্য হয়ত দুই-তিনটি পাঠ্যপুস্তক থাকে এবং তা থেকে পাঁচ-ছয়টি মাত্র প্রশ্ন দেওয়া চলে। যে ছেলেটি খুব অল্প পড়েছে অথচ ভাগ্যক্রমে তার পড়ার মধ্যে থেকে বেশী প্রশ্ন পেয়ে গেল সেই ভাল ছেলে বলে গণ্য হল। আর যে ছেলেটি অনেক পড়েও ঠিক প্রশ্নটি লাগাতে পারল না সে ফেল করে বসল। সুতরাং পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ লটারি খেলার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাই এই জাতীয় পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের নির্বাচন পরীক্ষার্থীদের একটা প্রধান করণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের এই দুর্বলতার ও পরীক্ষার এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে দেশে শত শত নোট, প্রশ্নোত্তরিকা, সিয়োর সাকসেস্ জাতীয় বাজে বইয়ে বাজার ছেয়ে গেল। পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কার না করলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি সংস্কার পছন্দ অপছন্দের ছাপ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নপত্রের উপর পড়ে। সুতরাং কে প্রশ্ন করেছেন জানলেই কি ধরণের প্রশ্ন হবে সে সম্বন্ধে বেশ আন্দাজ করা যায়। এই সুবিধে অন্তস্থ পরীক্ষায় যতটা আছে, বহিস্থ পরীক্ষায় ততটা নেই। তাই অনেক অন্তস্থ পরীক্ষার ভাল ছেলে বহিস্থ পরীক্ষায় তেমন সুবিধা করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রশ্নপত্র রচয়িতার যদি পরীক্ষার্থীদের মান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকে তবে প্রশ্নপত্র প্রায়ই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন বা পাঠ্যবহির্ভূত বলে পরীক্ষার্থীরা হৈ চৈ লাগায়।

চতুর্থতঃ, পরীক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট কিন্তু প্রশ্নপত্র রচনার সময়ে সেদিকে বিশেষভাবে অবহিত না থাকলে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না! যে অতিদ্রুত লিখতে পারে সে অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তর লেখে, বেশী নম্বর পায়। সুতরাং এই জাতীয় পরীক্ষার জ্ঞানের পরিমাপ যতটুকু হয় তার চেয়ে ঢের বেশী হয় দ্রুততার পরিমাপ।

পঞ্চমতঃ, বহিস্থ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-নির্মাতা সাধারণতঃ এমন সব ব্যক্তি হন যাঁদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কোনই সংযোগ নেই। তাদের পাঠ্য ও পঠনের মান সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তাই ছাপান পাঠ্যসূচী বা পূর্ববর্তী বৎসরের প্রশ্ন দেখে তাঁরা প্রশ্নপত্র রচনা করতে বাধ্য হন। ফলে

প্রশ্নপত্র হয়ত অযথা কঠিন বা অযথা সহজ হয়ে পড়ে। কখন কখন পাঠ্য-বহির্ভূতও হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

ষষ্ঠতঃ, প্রশ্নকর্তা কি চান, অনেক সময়ে প্রশ্নের ভাষা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। প্রশ্নপত্রের ভাষা প্রায়ই অস্পষ্ট ও জটিল হওয়ায় ছাত্রদের বিভ্রান্তি ঘটে।

এইবার **উত্তর-পত্র পরীক্ষার ত্রুটি** সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি—

(১) এই জাতীয় পরীক্ষার মূল্যায়ন পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস সংস্কার এবং মন মেজাজ মর্জির উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল বলে তার যথার্থ্য আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। একই উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মর্যাদা পায় কারণ প্রত্যেকের বিচারের মান আলাদা, এমন কি একই পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্য নির্দেশিত হতে দেখা যায়। স্যাণ্ডিফোর্ড রসিকতা করে বলেছেন—এই নম্বর ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় [It (pass mark) alters from hour to hour, and does not mean the same thing before lunch as after lunch.]

এ বিষয়ে বহুদিন ধরে বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফল সব সময়েই দেখা গিয়েছে বড় কৌতুকপ্রদ।

এজওয়ার্থ একবার একটি ল্যাটিন গদ্য রচনা ২৮জন পরীক্ষককে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। তাতে নম্বরের পার্থক্য ৪৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত হয়েছিল। স্টার্চ একবার একটি জ্যামিতি সমস্যার উত্তর নিয়ে ১৪৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরীক্ষা কার্য বিচার করেছিলেন, তাতে শতকরা ২০ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত তফাৎ হয়েছিল। অর্থাৎ যে উত্তরে একজন পরীক্ষক ৯০ নম্বর দিলেন অপর জন তাতেই দিলেন ২০। জ্যামিতির মত এমন গাণিতিক সত্যের বিষয় নিয়েও যখন এত পার্থক্য তখন সাহিত্যাদি বিষয়ে যে পার্থক্য আরো মারাত্মক হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

তাছাড়া ব্যালার্ড, উড্, হার্টগ্ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয় আরো গবেষণা চালিয়ে প্রচুর চমকপ্রদ ফল পেয়েছে। একই উত্তর বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম নম্বর ত পেয়েইছে, এমন কি একজনের কাছেই বিভিন্ন সময়ে নম্বরের যে পার্থক্য ঘটেছে তাও বড় কম কৌতুকপ্রদ নয়। ব্যালার্ড দেখেছেন একটি উত্তর কোন পরীক্ষকের কাছে যে নম্বর পেল, কয়েক বৎসর বাদে সেই পরীক্ষকের কাছেই তা অত্যন্ত কম হয়ে গেল। দেখা যায়, কোন কারণে

পরীক্ষকের মেজাজ যদি বেশ খুশি থাকে তাহলে অল্পেই খুশি হয়ে তিনি অনেক নম্বর দিয়ে দিলেন। আবার অন্য কারণে মেজাজ বিগড়ালে সেদিন ভাল লিখেও বেশী নম্বর তোলা যায় না।

সুতরাং এই জাতীয় পরীক্ষায় আদর্শ মাপকের নির্ভরশীলতা (reliability) ও নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) কোনটাই নেই।

২। খারাপ হস্তাক্ষর, বানানভুল, বা ভাষা গঠনের ভুল অনেক সময়ে পরীক্ষকের বিষয়জ্ঞান পরিমাপে গোলমাল ঘটায়। ইতিহাসের প্রশ্নে ছাত্রের ইতিহাসঘটিত জ্ঞান পরিমাপ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরোক্ত দোষ ত্রুটির জন্য পরীক্ষকের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুতরাং ইতিহাস পরীক্ষার যে মূল্যায়ন হয় তা কেবল মাত্র ইতিহাস-জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নয়। সুতরাং মাপকের সত্যতা (validity) গুণটিও নেই।

নূতন পদ্ধতি বা বস্তুমুখী পরীক্ষা পদ্ধতি ও তার সমালোচনা

রচনাধর্মী পরীক্ষার এই সব দোষ-ত্রুটিগুলি যথাসাধ্য দূর করবার জন্য নূতন একপ্রকার পরীক্ষা-পদ্ধতি (New type test) বা বস্তুমুখী (objective) পরীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নে কোন রচনাধর্মী উত্তর লিখতে হয় না। অল্প কয়েকটি দীর্ঘ বর্ণনাশ্রয়ী প্রশ্নের পরিবর্তে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন দেওয়া থাকে। প্রশ্নগুলির উত্তরে 'সত্যমিথ্যা' 'হাঁ। না' বা টিক (v) কাটা (×) চিহ্ন দিয়ে বা শূন্যস্থান পূরণ করে প্রার্থিত উত্তরটি দিতে হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং তার মূল্য নির্দিষ্ট করা থাকে। এককথার উত্তর হবে এবং উত্তরটি হয় ঠিক হবে, নয় ভুল হবে, মাঝামাঝি কিছু হবে না। নম্বরও হবে পূর্ণ অথবা শূন্য। তাই পরীক্ষকের খেয়াল খুশি বা ভাল লাগা মন্দ লাগার উপর মূল্যায়নের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে না, সুতরাং পরীক্ষাটা হবে একেবারেই পরীক্ষক-নিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিক (objective)।

তবে এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময়ে পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হতে হবে। মনে করা যাক ইতিহাসের প্রশ্নপত্র রচনা করা হচ্ছে, সেখানে ইতিহাস-ঘটিত জ্ঞানকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যথা, (ক) ইতিহাসের ঘটনাবলির জ্ঞান, (খ) বিভিন্ন ঘটনাবলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বা পারস্পর্যের জ্ঞান, (গ) ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের সম্বন্ধ-সূচক জ্ঞান, (ঘ) ঘটনাগুলির কার্যকারণ

সম্বন্ধে জ্ঞান, (ঙ) ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান ও (চ) ঐতিহাসিক ঘটনার উপাদান ও ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়ের জ্ঞান।……এই সব বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করলে ইতিহাস-ঘটিত সকল প্রকার জ্ঞানেরই পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

নূতন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা একটি সৃজনাত্মক কাজ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশ্নকর্তা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে নূতন নূতন ধরণের প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পুস্তক, পাঠ্যসূচী ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে একথা ত বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন নানা ধরণের হয়। যথা—(i) সত্যাসত্য বিচার (True false test), (ii) শূন্যস্থান পূরণ (Completion test), (iii) সামঞ্জস্য সন্ধান (similerity test), (iv) সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন (multiple choice test) ইত্যাদি।

এই জাতীয় প্রশ্নের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি—

(ক) **সত্যমিথ্যা বিচার—**

এই জাতীয় প্রশ্নে কতকগুলি তথ্যমূলক বাক্য দেওয়া থাকে, তাদের মধ্যে যেটি সত্য, সেটাতে টিক চিহ্ন (✓) আর যেটি মিথ্যা সেটাতে কাটা চিহ্ন (×) দেবার নির্দেশ থাকে—

যথা i) গ্রীষ্মকালে আমরা পশমের জামা ব্যবহার করি—

(ii) আমরা যত উপরে উঠি ততই ঠাণ্ডাবোধ করি—

(খ) **শূন্যস্থান পূরণ—**

এই জাতীয় প্রশ্নে বাক্যের কোন একটি বা দুটি শব্দ উহ্য থাকে। যথাযোগ্য শব্দটি বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করতে হয়। বাক্যের মধ্যে এমন সব শব্দ বসাতে দিতে হয় যার দ্বারা ছাত্রদের বিষয়বস্তু-ঘটিত জ্ঞানের পরীক্ষা হয়।

(i) ফুটন্ত জলের তাপ — ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

(ii) হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া রাজধানী — স্থানান্তরিত করেন।

(গ) **সামঞ্জস্যের সন্ধান—**

অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দের মধ্যে একটি বিজাতীয় শব্দ বসিয়ে সেটিকে চিহ্নিত করে দিতে বলা হয়—

(i) গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরি, দামোদর, হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র

(ii) ম্যাগেলান, মন্টেজুমা, কোর্টেজ, পিজারো—

(ঘ) **সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন—**

প্রত্যেকটি প্রশ্নের অনেকগুলি করে উত্তর লিখে দেওয়া থাকে। তার মধ্যে থেকে যে উত্তরটি ঠিক সেটিতে টিক চিহ্নিত (✓) করতে হয়—

যথা—প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি হলে কি করা উচিত?

(i) সেই বাড়িতে দেখতে যাওয়া উচিত।

(ii) থানায় খবর দেওয়া উচিত।

(iii) নিজের বাড়িতে তালাবন্ধ করে সাবধানে থাকা উচিত।

(iv) দমকলে খবর দেওয়া উচিত।

(ঙ) **ঠিক করে সাজান—**

এই ধরণের প্রশ্নে কতকগুলি প্রশ্ন ও তার উত্তর এলোমেলো ভাবে দেওয়া থাকে। সেগুলিকে ঠিক করে সাজিয়ে দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়

পি. সি. রায়—শ্রেষ্ঠ যাদুকর

পি. সি. সরকার—শ্রেষ্ঠ কবি

গোষ্ঠ পাল—শ্রেষ্ঠ নট

শিশির ভাদুড়ী—শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক

নূতন পরীক্ষার সুবিধা—

(১) প্রশ্নগুলির উত্তর একেবারে সুনির্দিষ্ট। তাই তার নম্বরও হবে সুনির্দিষ্ট—হয় পূর্ণ নয়ত শূন্য। সেইজন্য পরীক্ষক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই নম্বর দিতে পারবেন—ব্যক্তিগত রুচি বা মেজাজের দ্বারা মূল্যায়ন প্রভাবিত হবে না। সুতরাং মাপকের নির্ভরযোগ্যতা এবং নৈর্ব্যক্তিক গুণ পুরামাত্রায় বজায় থাকে।

(২) এক-আধ কথায় উত্তর দিতে হয় বলে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। সেইজন্য সমগ্র পাঠ্য জুড়েই বহুসংখ্যক প্রশ্ন ছড়িয়ে দিতে পারা যায়। এই ধরণের প্রশ্ন আগে থেকে অনুমান করা যায় না বলে না-বুঝে মুখস্থ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

(৩) যে বিষয়ের জ্ঞানটি মাপা হচ্ছে সেই বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছু (যথা—হস্তাক্ষর, বর্ণাশুদ্ধি, ভাষা চাতুর্য ইত্যাদি) পরীক্ষকের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। এটি হল মাপকের সত্যতা গুণ।

(৪) উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সঠিক জ্ঞানের পরিচয়টি জানা যায়। ভাষার ধোঁয়ায় আসলবস্তুকে আচ্ছন্ন করে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই।

(৫) নম্বর দেওয়া এমন সহজ যে, যে কোন ব্যক্তি তা পারবে এবং তাতে নম্বরের কোনই পার্থক্য হবে না।

(৬) প্রশ্নগুলি সোজা থেকে কঠিন—এই পর্যায়ে সাজান থাকে। তার ফলে সকল ছেলেই কিছু না কিছু উত্তর দিতে পারে।

উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার—

নূতন অভীক্ষায় এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এতে অসুবিধাও রয়েছে যথেষ্ট এবং পুরাতন পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি সুবিধা আছে, যা নূতন পরীক্ষায় নেই। যথা—

(১) নূতন পরীক্ষায় একমাত্র ঘটনামূলক জ্ঞানের (factual knowledge) পরীক্ষা করা চলে। রসানুভূতির কোন পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। রচনাধর্মী পরীক্ষায় সাহিত্যাদি রসানুভূতিমূলক বিষয়ের মূল্যায়ন আরো ভালভাবে করা যায়।

(২) নূতন অভীক্ষায় বিভিন্ন চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করে যুক্তি অনুসারে পর পর সাজানর ক্ষমতার কোন বিচার হয় না। অথচ জ্ঞানার্জনে এর মূল্য অপরিসীম। এর ফলে কল্পনাশক্তি, রচনাশক্তি, যুক্তিস্থাপনার শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রচনাধর্মী পরীক্ষায় সেটি পুরামাত্রায় পাওয়া যায়।

(৩) প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে ছাত্রের যত কিছু জানা আছে তা জানাবার সুযোগ নেই এ' পরীক্ষায়। অথচ রচনাধর্মী পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে তা জানাবার সুযোগ আছে।

(৪) নূতন পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা, যে এই পদ্ধতিতে অনেকখানি আন্দাজ বা অনুমানের সুযোগ দেয়। না বুঝে যেখানে সেখানে আন্দাজমত দাগ দিয়ে গেলেও দেখা যাবে কিছুসংখ্যক সঠিক উত্তরে দাগ পড়ে গিয়েছে। পরীক্ষক মোটেই বুঝতে পারেন না, কোনখানে জ্ঞানের শেষ এবং অনুমানের আরম্ভ। [The examiner can not say where the knowledge stops and guessing begins— P. Sandiford]

প্রয়োগ বা আদর্শীকৃত পরিমাপ (Standardised Tests)

এছাড়া আছে প্রয়োগসিদ্ধ বা আদর্শীকৃত পরিমাপ। এতক্ষণ ধরে যে সব

ধরণের পরীক্ষার কথা বলা হল, সেগুলিকে যথাসাধ্য ত্রুটিশূন্য করবার জন্য প্রশ্নপত্র রচনায় নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), সত্যতা (Validity) এবং নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) গুণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র এই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটলেই যে পরিমাপকে বিদ্যাবত্তার নির্ভুল পরিমাপ ঘটবে সে কথাও বলা যাচ্ছে না।

—মনে করা যাক্ নবম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য অষ্টম বা সপ্তম শ্রেণীর উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা করা গেল। অধিকাংশ ছেলেরই সেখানে ৮০ উপর নম্বর পাবার কথা। আবার, প্রশ্নপত্রের মান যদি দশম শ্রেণীর উপযুক্ত করে চড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অধিকাংশই ছেলেই ফেল করবে সেখানে। একই শ্রেণীর বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র বিভিন্ন মানের, তাই পরীক্ষার ফল দেখে ছেলেদের বিদ্যার কোন তুলনামূলক বিচার করা চলে না। ওজনের একসেরি বাটখারাটা যদি কোথাও ৬০ তোলার, কোথাও ৮০ তোলার হয় তাহলে দেশনিরপেক্ষ-কোন কিছুর ওজন নির্ধারণ করা যায় কি ?

সুতরাং পরিমাপকের একটা আদর্শমান (Standard) নির্ণয় করা দরকার।—কাজটা অবশ্য সহজ নয়। নানাবিধ জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করে নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে এ'কাজ করতে হয়। সংক্ষেপে তার মূল পদ্ধতিটি উল্লেখ করি—

বুদ্ধির পরীক্ষায় যেমন বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত আদর্শমানের প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়ে থাকে, বিদ্যার পরীক্ষাতেও তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর, বা বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। তারপর সেগুলিকে আদর্শীকৃত মাপের (Standardised) মধ্যে আনবার জন্যে বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রদের উপর প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে প্রশ্নগুলি বহুসংখ্যক ছাত্রের উপর পরীক্ষা করে যত বেশী প্রয়োগসিদ্ধ করা যায়, ততই সেগুলি হয় আদর্শের নিকটবর্তী বা গড় সংখ্যার প্রতিনিধিমূলক (Satisfaction to norms)। অবশ্য এই ভাবে প্রয়োগসিদ্ধ করবার পথে আরো অনেক জটিলতা আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হল না।

এই ভাবে বিশেষ শ্রেণীর প্রশ্নগুচ্ছে যারা অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে তাদের নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীর অনুপযুক্ত মনে করা যেতে পারে, কারণ এই প্রশ্নগুচ্ছই হচ্ছে ঐ শ্রেণীর বহু পরীক্ষার প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শ পরিমাপক।

এছাড়া প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর সহজাতবুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞানের একটা তুলনামূলক বিচার করাও চলে। যেমন মনে করা যাক, কোন ছেলে ইতিহাসে মাত্র ৩৫ নম্বর পেয়েছে। এইটুকুমাত্র জেনে আমরা মনে করতে পারি যে ছেলেটি ইতিহাসে মোটেই ভাল নম্বর পায়নি ; কোন প্রকারে পাশ করেছে মাত্র। কিন্তু সেই শ্রেণীতে ঐ প্রশ্নের প্রয়োগসিদ্ধ গড় বার করে যদি দেখা যায় যে সেই সংখ্যামান মাত্র ২৫ তাহলে ছাত্রটিকে ইতিহাসে আর মন্দ ছেলে বলা চলবে না। বরং তুলনামূলক ভাবে বেশ ভাল ছেলে বলেই মনে করতে হবে তাকে।

বলাই বাহুল্য, এই ধরণের প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরিমাপক নির্মাণের কাজ আজও আমাদের দেশে আরম্ভ হয়নি।

পরীক্ষা প্রথার সংস্কার—উভয় মতের সমন্বয়

নূতন পরীক্ষার এই সব সুবিধা-অসুবিধার সমালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রেমণ্ট একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন—

তিনি বলেন—এ'জাতীয় পরীক্ষার **সুবিধার কথা** হল—

(i) উত্তরগুলি হবে সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট এবং একেবারে নির্ভুল বা ভুল। পরীক্ষকের মতামতের উপর তা মোটেই নির্ভরশীল নয়।

(ii) প্রশ্নপত্র রচনা করতে সময় কিছু বেশী লাগবে বটে, কিন্তু উত্তর-পরীক্ষার দ্রুততায় তার ক্ষতিপূরণ হবে।

(iii) রচনাপদ্ধতিতে যে কয়টি প্রশ্ন দেওয়া যায় নূতন অভীক্ষায় তার বহুগুণ প্রশ্ন দেওয়া যায় বলে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপকতার পরিচয় জানা সম্ভব হয়।

(iv) পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মেজাজ বা রুচি দ্বারা প্রভাবিত নয়।

(v) লিখতে সময় কম লাগার ফলে চিন্তা করবার সময় বেশী পাওয়া যায়।

(vi) ভাষা বা রচনাবলির কৌশলে অর্জিত জ্ঞানের ক্ষীণতাকে গোপন করা সম্ভব হয় না।

আর **অসুবিধার কথা** হল—

(i) বিষয়ঘটিত স্থূল ও খণ্ডিত জ্ঞানের উপরই অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়।

(ii) জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোন সাঙ্গীকরণের সুযোগ নেই।

(iii) জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও সেই জ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষমতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

(iv) উত্তরদানে অনুমান বা আন্দাজের ব্যবহার ভালভাবেই করা যায়।

সুতরাং দুই প্রকার পরীক্ষার মধ্যেই কিছু কিছু গলদ আছে আর কিছু কিছু সুবিধাও আছে। তাই পরীক্ষাকে যথাসম্ভব নির্দোষ করতে হলে দুই জাতের পরীক্ষারই সাহায্য নিতে হয়। রেমণ্টের মতে আদর্শ পরীক্ষা মাত্রেরই দুটো উদ্দেশ্য থাকা চাই—যথা—(ক) পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ এবং (খ) নূতনতর জ্ঞানার্জনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার। নূতন পরীক্ষায় প্রথম উদ্দেশ্যটি কথঞ্চিৎ সাধিত হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আদৌ সাধিত হয় না। আবার, রচনামূলক পরীক্ষায় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয়েও প্রথমটির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

তাই অনেক শিক্ষাবিদের মতে প্রশ্নপত্রে দুই জাতীয় প্রশ্নেরই ব্যবস্থা থাকলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য কিছু সফল হতে পারে। দুই পদ্ধতির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে, তাই পদ্ধতিদ্বয়ের সার্থক সমন্বয়ে পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্নপত্র নির্মিত হতে পারে।

[...that the advantages of the new type test for outweigh its limitations. These limitations may be overcome, in part, by the retention of the essay type for such purposes as it can adequately fulfil. The conspicuous weakness of the latter in regard to the reliability of its scores should cause teachers to pay more attention to this aspect of the subject. Otherwise the virtues it possesses will continue to be swamped by the vices of its unrelia bility.—P. Sandiford]

মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাব

মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টেও এই দুই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে—

(১) প্রাচীন রচনাধর্মী পরীক্ষার অনেক দোষ সত্ত্বেও এমন একটা নিজস্ব গুণ আছে যা নূতন পদ্ধতিতে নেই, আবার জ্ঞানের বিচারে বস্তুমুখী নূতন অভীক্ষার মূল্যও অনস্বীকার্য। তাই প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে

ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুমুখী পরীক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। [In order to reduce the element of subjectivity of essay-type tests, objective tests of attainments should be widely introduced side by side.]

(২) উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নির্ধারণে গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহার একেবারেই অর্থহীন। শতকরা হিসাবে যে নম্বর দেওয়া হয় আপাতদৃষ্টিতে তা অত্যন্ত সূক্ষ্মবিচারের পরিচায়ক কিন্তু বাস্তবে এতটা সূক্ষ্মবিচার ত করা সম্ভব হয় না। যে ছেলে ২৯ নম্বর পেয়েছে এবং যে ছেলে ৩০ নম্বর পেয়েছে বাস্তবিক পক্ষে তাদের উত্তরপত্রের মানের কোনই পার্থক্য নেই। অথচ একজন ফেল করবে এবং অপরজন পাশ করবে। সুতরাং শতকরা হিসাবের গাণিতিক সূক্ষ্মতা এখানে একেবারেই নিরর্থক।

উত্তরের মান নির্ণয়ের জন্য তাই সংখ্যাবাচক মূল্য না দিয়ে A B C D ইত্যাদি চিহ্নবাচক মূল্য দেওয়া ভাল। যেমন A=খুব ভাল, B=ভাল, C=মোটামুটি ভাল, D=মন্দ, E=খুবই মন্দ। পরীক্ষার্থীদের শতকরা গাণিতিক হিসাবে বিভক্ত না করে ভাল মন্দ মাঝারি জাতীয় ছোট ছোট দলে (Category) ভাল করলে ভাগটা যথাসম্ভব সহজসাধ্য ও বাস্তবানুসারী হয়। প্রয়োজন হলে এই দলগত বিভাগকে শতকরা গাণিতিক বিভাগেও রূপান্তরিত করে নেওয়া যায়।

অন্তস্থ ও বহিস্থ পরীক্ষার সমস্যা

শিক্ষাব্যবস্থার উপরে বহিস্থ পরীক্ষার ভয়াবহ প্রভাবের কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কারকের মুখে। এরই ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বোধ মুখস্থের রাজত্ব, এরই ফলে সম্ভাব্য প্রশ্ন নির্বাচনের উপরেই শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার, এবং এরই ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক চরম বিপর্যয়। অটো জেসপার্সন বহিস্থ পরীক্ষা-ভীতি-ব্যাকুল ছাত্রগণের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন—

পরীক্ষায় ঠিক পূর্বে সমস্ত ইস্কুলটাই যেন বাৎসরিক পরীক্ষা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইস্কুলে তখন সর্ববিভাগে কেবল পুরাতন পাঠেরই অনুশীলন, মনে হয় ছাত্রেরা যেন সাময়িক ভাবে মানসিক রোমন্থনকারী জীবে পরিণত হয়েছে।

["Just before the examination, the whole school is seized with its yearly attack of the examination catarrh. In all

departments it is considered necessary to recapitulate for examination; for a couple of months the pupils transferred into mental ruminants."—Otto Jesperson]

(৩) মুদালিয়ার কমিশন বলেন যে, বহিস্থ পরীক্ষা যতদূর সম্ভব কম করা ভাল, এবং অন্তস্থ পরীক্ষা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করবার পর ছাত্রের পাঠোন্নতি বিচার করবার সময়ে একবার মাত্র বহিস্থ পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এর আগে আর কোন বহিস্থ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কোন বহিস্থ পরীক্ষা হবে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমহাশয় স্কুলের রেকর্ড দেখে তার শিক্ষাদান শেষে সার্টিফিকেট দিবেন।

[There should be only one public examination at the completion of the Secondary School Course.]

(৪) ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় নিতে হলে এবং তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ নির্ধারণ করে নিতে হলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড রাখতে হবে। সেই রেকর্ড হতেই জানা যাবে ছাত্র সারা বছর কি কাজ করেছে এবং কিভাবে ক্রমশ উন্নতি করছে।

(৫) পরীক্ষান্তে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে বিভিন্ন বিষয়ে বহিস্থ পরীক্ষার ফল এবং সেই সঙ্গে অন্তস্থ পরীক্ষার ফল এবং দৈনন্দিন স্কুল রেকর্ডের ফল উল্লেখ করা থাকবে।

(৬) শেষ পরীক্ষায় কম্পার্টমেণ্টাল প্রথা চালু করা প্রয়োজন। একটি বা দুইটি বিষয়ে যদি কেউ অকৃতকার্য হয় তবে পরবর্তী বৎসরে তার পরীক্ষা দেওয়া চলবে কিন্তু সেক্ষেত্রে স্কুল-রেকর্ড গণ্য হবে না। কিন্তু এই সুযোগ তিনবারের বেশী দেওয়া হবে না। এইভাবে মুদালিয়ার কমিশন পরীক্ষা-সংস্কারের যে সব পরিকল্পনা দিয়েছেন সেগুলোর ফলাফল বেশ কিছুদিন ধরে বিচার করলে তবেই তার যোগ্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে বলে কমিশন মনে করেছেন।

খেলা

(Play)

সকল দেশে সকল কালের ছেলেরাই খেলা করতে ভালবাসে—তারা খেলতে চায়, খেলার আনন্দে মেতে ওঠে। এর কোন ব্যতিক্রম বড় একটা কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ? কেন সকলে খেলাধুলার নামে নিরর্থক পরিশ্রমে মেতে ওঠে? খেলার এই অন্তর্নিহিত আকর্ষণী শক্তির মূল উৎসটা কোথায়? বিভিন্ন দার্শনিক ও মনোবিদ এই উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন নানাভাবে।

খেলার তত্ত্ব—(Theory of Play)

(১) বহুকাল আগে বিখ্যাত জার্মানকবি শিলার বলেছিলেন খেলা হচ্ছে **বাড়তি শক্তির** ক্ষয়। পরবর্তীকালে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারও এই মতের সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন বড়রা জীবনসংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে আহার আচ্ছাদন সংগ্রহের প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, ছোটদের তা করতে হয় না, অথচ অনায়াসলভ্য খাদ্যাদি থেকে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে, এবং সেই সঞ্চিত শক্তির ব্যয়েরও কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। তাই অকারণ দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলার মাধ্যমে সেই সঞ্চিত বাড়তি শক্তি ক্ষয় করে ছেলেরা। [···According to their view, play is always the expression of a surplus nervous energy. The young creature, being tended and fed by its parents, does not expend its energy upon the quest of food, in earning its daily bread, and therefore, has a surplus store of energy which overflows along the most open nervous channels producing purposeless movements of the kind that are most frequent in real life—Mcdougall.]

এই তত্ত্বের মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্যতা আছে, কিন্তু সমস্ত খেলাকেই এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। দোলনায় শুয়ে ছোট্ট শিশু যে অনবরত হাত পা নেড়ে খেলা করে, সেখানে বাড়তি শক্তির ব্যয় হিসাবে তাকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সব খেলাই ত এই রকম এলোমেলো ক্রিয়া নয়। তার কতরকম পদ্ধতি, কত প্রকার উদ্দেশ্য—নিছক শক্তিক্ষয়ের তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা মেলে না।

তাছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর যখন ক্লান্ত, একটুও বাড়তি শক্তি নেই তখনও ত খেলার কথায় নেচে ওঠে ছেলেরা। সুতরাং সব খেলাকেই বাড়তি শক্তির-ক্ষয় বলা চলে না। নান্ সাহেব একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই তত্ত্বের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। ষ্টীমইঞ্জিন যেমন বাড়তি বাষ্পের চাপ সেপটি ভ্যালব দিয়ে ছেড়ে দেয় ছেলেরাও কি তেমনি বাড়তি শক্তিকে খেলার অজুহাতে ছেড়ে দেয়, তাহলে ছেলেরা খেলাধুলা করে যেমন শারীরিক শক্তি অর্জন করে, ষ্টীমইঞ্জিনও তেমনি বাড়তি বাষ্প ছাড়ার ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না কেন? সুতরাং এই তত্ত্বটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

২। খেলার তত্ত্বের আর একটি মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কার্লগ্রুজ (যদিও মেলেব্রান্স এই মতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বহুপূর্বে)। পশু এবং মানব শিশুর খেলা নিয়ে কার্লগ্রুজ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। আমরা লক্ষ্য করব, জীবজগতে কীট পতঙ্গ সরীসৃপাদি নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে খেলাধুলার কোন পাঠ নেই, কিন্তু উন্নততর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাচ্চাদের জীবনে খেলার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তার কারণ কি?—

দেখা যায়, জীবজগতে যে যত নিম্নস্তরে আছে, সে ততই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) দাস। জীবন সংগ্রামে তার একমাত্র অস্ত্র হল অমার্জিত প্রবৃত্তিগুলির তাড়না। জীব যত উন্নতস্তরে উঠেছে, সহজাত প্রবৃত্তির বেগ তার তত কমেছে। জীবনসংগ্রামের অস্ত্র তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, শাণিত করতে হয়েছে, ভাবী সংগ্রামবহুল জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। খেলার মধ্যে দিয়েই তাদের এই **ভাবী জীবনের প্রস্তুতির মহড়া**।

ভবিষ্যতে যে জটিল সংগ্রাম-জীবন আসছে, বাল্যকালেই যেন তার মহড়া চলে খেলার ছলে। বেড়ালের বাচ্চারা উলের বল লোফালুফি করে ইঁদুর ধরা অভ্যাস করে; কুকুর বাচ্চারা পরস্পর কামড়াকামড়ি খেলা করে ভাবী জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে।

মেয়েরা গৃহিণীপণার মহড়া দেয়, ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ হুটোপুটি করে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে। তাই এই তত্ত্বের নাম দেওয়া যায় **প্রস্তুতিকরণ-তত্ত্ব** (Anticipatory theory)। এককথায় খেলার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাবীজীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, অনাগত জীবনসংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। এই হিসাবে কার্লগ্রুজের মত শিলার স্পেন্সারের মতের

বিপরীত বলা যায়। অর্থাৎ খেলা বাড়তি শক্তির ক্ষয় নয়, শক্তির সঞ্চয়। [Groos therefore reverses the Schiller-Spencer dictum, and says, it is not that young animals play because they are young, and have surplus nervous energy ; we must believe rather that the higher animals have this period of youthful immaturity in order that they may play.—Mcdougall.]

৩। গ্রুজের বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ষ্ট্যানলি হল। তিনি বলেন গ্রুজের এই প্রস্তুতিবাদ-তত্ত্ব একান্তই আংশিক, পল্লবগ্রাহী ও বিকৃত (very partial, superficial and perverse)। হলের মতে খেলা ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য নয়, অতীতের ভুলে-যাওয়া স্মৃতির পুনরাবৃত্তির জন্য, তাই এই তত্ত্বের নাম **পুনরাবৃত্তি-তত্ত্ব**। গুহাবাসী অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে চাপা রয়ে গিয়েছে। অতীতজীবনের সেই সব চিন্তাভাবনাহীন সুখস্মৃতির প্রতি আকর্ষণ জীবের স্বাভাবিক। বলাই বাহুল্য, এই আকর্ষণ সজ্ঞান মনের স্তরে নয়, নির্জ্ঞানস্তরে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেই অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি ত সম্ভব নয় তাই খেলার মাধ্যমে তার পুনরাবৃত্তি করে আমরা তৃপ্তি পাই, হারানো স্বর্গরাজ্য যেন নতুন করে ফিরে পাই।

[The heart of youth goes out into play as into nothing else, as if in it man remembered a lost paradise.—Stanly Hall.]

মারামারি খেলা, প্রতিযোগিতা খেলা, লুকোচুরি খেলা, শিকার খেলা, সবই মানবসভ্যতার গোড়ার দিকের পাতায় লেখা আছে। অতীতজীবনের ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম ত আজ নেই, তাই আজকের ভাবনাহীন নিশ্চিন্তজীবনে সেই অতীতের স্মৃতি যে অনুভূতি জাগায় তা সুখকর। খেলার ছলে আমরা সেই সুখকর অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করি।

ষ্ট্যানলি হলের এই মত যে কার্লগ্রুজের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত তা ত দেখাই যাচ্ছে। একজনের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, অপর জনের অতীতের দিকে। গ্রুজের মতকে যেমন বলি প্রস্তুতিবাদ (anticipatory), হলের মতকেও তেমনি বলতে হয় পুনরাবৃত্তিবাদ (recapitulary)। এ মতেও অবশ্য কিছুটা সত্যতা আছে তবে আংশিক, পল্লবগ্রাহী ও বিকৃত (partial,

superficial, perverse) বলবার সুযোগ যে এতেও একেবারে না আছে এখন নয়।

৪। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগাল খেলাকে অবশ্য কোনরকম সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি তবে তাঁর মতে খেলার মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির **সামাজিক উদ্‌গমন** (Sublimation) ঘটে।—যেমন প্রতিযোগিতামূলক খেলাকে যোধন প্রবৃত্তির উদ্‌গতি বলা যায়। তেমনি আত্মবিস্তার, আত্মসংকোচন, কৌতূহল, নির্মাণেচ্ছা, দলগঠন প্রভৃতি বহু প্রবৃত্তির সার্থক উদ্‌গতি ঘটে খেলার মাধ্যমে। ম্যাকডুগালের মতে খেলার মূল প্রেরণা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বের স্পৃহা। খেলার মূল কথাই হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Rivalry theory)। যোধন প্রবৃত্তির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোধনের মত প্রতিপক্ষের মৃত্যু কামনা নেই।

৫। ক্রীড়াতত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য মত হচ্ছে **বিরেচনবাদ** (Catharsis)। বিরেচন শব্দটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের। জোলাপ দিয়ে ভিতরের ময়লা বার করে দেওয়াই হচ্ছে বিরেচনের কাজ। মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েড এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। আসল বস্তুটি যেখানে নাগালের বাইরে, সেখানে অন্য একটা কিছু উপলক্ষ্য করে আসলবস্তু ভোগের পরোক্ষ চেষ্টা। এ যেন বাস্তব পদার্থের পরিবর্তে অনুকল্পের ব্যবস্থা। মনের মধ্যে এখন অনেক নিরুদ্ধ ইচ্ছা বেরিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে যার কোন বাস্তব পূরণ সম্ভব নয়, সেগুলি তখন খেলার ছদ্মবেশে বেরিয়ে এসে তৃপ্তি খোঁজে।

কার্লগ্রুজের ও ষ্ট্যানলি হলের আপাতবিরোধী মত দুইটিরও সার্থক সমন্বয় করা যায় এই বিরেচন-বাদ তত্ত্বে।

অন্তর্নিহিত অবদমিত ইচ্ছাটি যদি ভাবীজীবনের প্রস্তুতির জন্যই হয়, খেলার মধ্যে দিয়েই হয় তার বিরেচন। খুকুমণি তার কাঠের ছেলেকে মাটির ভাত খাইয়ে ভাবী মাতৃত্বের বিরেচন ঘটায়। কাঠ আর মাটি সেখানে ভাবী বাস্তবের অনুকল্প।

আবার পুনরাবৃত্তিবাদ মতে ইচ্ছাটা যদি ফেলে-আসা জীবনের কোন সুখকর ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে চায় সেখানেও আসলের পরিবর্তে খেলা অনুকল্পের সাহায্যে মনের পরোক্ষ ভোগ ঘটে। গুহাবাসী জীবনের শিকারের

উল্লাস খেংরা কাঠির ধনুক দিয়ে ফড়িং শিকারের মাধ্যমে বেরিয়ে এসে তৃপ্তি খোঁজে।

এই জাতীয় কাল্পনিক তৃপ্তির নাম হল বিরেচন (Catharsis)। ফ্রয়েড-পন্থীরা বলেন মানুষের অবচেতন মনে কতরকম অসামাজিক ইচ্ছা মাথা তুলবার জন্য দিনরাত ছটফট করছে। সেগুলি সব সময়েই নির্দোষ সামাজিক ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে, খেলার মধ্য দিয়েই শিশু তার অবচেতন মনের **অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ** করে নিতে চায়। যে ছেলের পিঠে খাবার খুব লোভ অথচ খেতে পায় না, খেলার ছলে সে অজস্র মাটির পিঠে বিতরণ করে। পিঠে-গাছে অসংখ্য পিঠে ফলায়। [The child who actually is allowed less cake than he would like may provide (in his play) an unlimited supply of make-believe cake—" —Gates & Jersild]

আচরণবাদী উডওয়ার্থ খেলাকে একেবারে **বাহ্যিক উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া** হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বাইরের একটা চামড়ার বল শিশুর মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করল তারি প্রতিক্রিয়া হল বল খেলা। এটা যেন একেবারেই পেশী, তন্তু, স্নায়ু ও গ্ল্যাণ্ডের রসক্ষরণের ব্যাপার—এছাড়া আর কিছুই নয়।

৬। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের **ক্ষমতালিপ্সাবাদ** তত্ত্বে কোন কোন খেলার ব্যাখ্যাটি ভালভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর মতে, খেলার মূল প্রেরণাটা অসামাজিক ইচ্ছা-পূরণ প্রচেষ্টা নয়, ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। ছোট শিশুরা বড় হতে চায়, বড়দের অনুকরণ করতে চায়, বড়দের মত ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। বাস্তবে ত সেটা সম্ভব নয়, তাই খেলার কল্পনা-জগতে তার পরিতৃপ্তি ঘটে। [Some psycho-analysts have tried to see a sexual Symbolism in children's play. This, I am convinced is utter moonshine. The main instinctive urge of childhood is but the desire to become adult or perhaps more correctly, the will to power. —Bertrand Russell]

কল্পনাবিলাসবাদের (make-believe play) মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায় এই ক্ষমতালিপ্সাবাদের। অসহায় দুর্বল শিশু সেখানে কল্পনা করে "আমি যখন বাবার মত হব", কল্পনা করে সে হবে কানাই মাষ্টার, বেত হাতে

ছাত্রদের যথেচ্ছ পিঠিয়ে যাবে, ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে মাকে উদ্ধার করবে, এ সবই ক্ষমতালিপ্সাবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে।

খেলি কেন?

মোট কথা খেলার তত্ত্ব হিসাবে এতক্ষন যেসব মতবাদের কথা উল্লেখ করা হল তাদের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যত বিভেদই থাক, একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত,—সে হচ্ছে আনন্দানুভূতি। খেলার প্রতি শিশুদের যে অনুরাগ তার মূল কথাই হল আনন্দের প্রতি অনুরাগ। আনন্দ থেকেই ত জীব সকলের উৎপত্তি। তাই আনন্দের প্রতি জীব মাত্রেরই সহজাত আকর্ষণ। আনন্দোন্মুখতা জীবের স্বধর্ম। খেলার দিকে তাই শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ।

দৌড়াদৌড়ি করে ধুলোকাদা মেখে খেলা নিয়ে মশগুল থাকে ছেলেরা। ক্ষুধাতৃষ্ণা শারীরিক পরিশ্রম কোন দিকেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এই আনন্দ তারা পায় কোথা থেকে? ছেলেদের খেলা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে খেলার আনন্দ খেলার উপকরণ বা খেলনার পারিপাট্যের উপর নির্ভর করে না, একান্তভাবেই তা শিশু-অন্তরের মধুচক্র থেকে আহরিত। চকচকে রঙ্গীন দামী খেলনা আর মাটির ডেলা পাথরের নুড়ি সবই সমমূল্য শিশুর কাছে।

তাছাড়া খেলা কি শুধু ছেলেরাই ভালবাসে? বড়রাও ত খেলার নামে মেতে ওঠে। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যাবেলা তাসের আড্ডায় বা খেলার মাঠে যেতে তার কোন আলস্য দেখা যায় না। কাজের নামে আমরা ব্যাজার হই, অথচ তাদের চেয়ে বহুগুণ পরিশ্রম সাপেক্ষ খেলার নামে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই কেন?

তাহলে খেলার স্বরূপ কী? কাজের সঙ্গে খেলার মৌল পার্থক্যটা কোথায়?

খেলা ও কাজ (Play and Work)

প্রথমেই একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করব যে কাজ মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু খেলার কোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নেই, আনন্দলাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং খেলা মানেই হল আনন্দ লাভ। আরো সংক্ষেপে বলা যায়, যে কর্মের ক্রিয়াটাই প্রধান সেই হল খেলা, আর যে কর্মের মধ্যে ক্রিয়ার অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে সে হল কাজ।

[In play, the value and significance of the activity are

found in the activity itself, whereas in work, the value and significance of the activity are found in an end beyond the activity."—Drever.]

তাছাড়া কাজের মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতার ভাব আছে। একটা দায়িত্বের চাপ আছে—খেলার মধ্যে সেটি নেই। কাজের থেকে হয়ত খেলার পরিশ্রম অনেক বেশী। বুদ্ধি বিবেচনাও ব্যবহার করতে হয় অনেক বেশী, তবু তার পিছনে একটা মানসিক কর্তৃত্ববোধ আছে যে আমার একাজের আমিই মালিক,—এ কাজ করা না-করা আমার ইচ্ছাধীন। তাই অধ্যাপক গালিক খেলার একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন যে কাজ আমরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারি সেই হল খেলা—[Play is what we do, when we are free to do what we will.—Prof. Gullick]

সত্যিকারের খেলা বলে যাকে আমরা মনে করি, তার মধ্যেও যদি কর্তৃত্ববোধ অন্তর্হিত হয়ে সেখানে বাধ্যবাধকতার ভাব এসে পড়ে তবে খেলা তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে তার আকর্ষণ। খেলা হয়ে পড়ে কাজের অধম।

মনে করা যাক্, একটি ছেলে বাঁশী বাজায় মনের আনন্দে। কাজ পালিয়ে নিরালায় বসে সে বাঁশী বাজায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজালেও তার ক্লান্তি আসে না। কিন্তু সে বাঁশুরিয়াই যদি কোন থিয়েটার বায়স্কোপে নিয়মিত ভাবে নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট সুরে বাঁশী বাজাবার চাকরি পায় তখন তার এই বাঁশী বাজাবার আকর্ষণটা সব নষ্ট হয়ে যাবে। এটা তখন বিরক্তিকর কঠোর কর্তব্যের আহ্বান হয়ে দাঁড়াবে।

ডঃ হ্যারিস তাঁর Psychological Foundation of Education গ্রন্থে এই কথাটি নতুনভাবে বলেছেন। তিনি বলেন যে কাজটা আমরা আত্মকেন্দ্রিকভাবে ব্যক্তিগত সুখের লোভে করি সেইটেই হল খেলা আর সমাজকল্যাণে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলি যে কাজে, সেই হল কাজ। একটা আত্মকেন্দ্রিক কাজ আর একটা সমাজকেন্দ্রিক কাজ। [In work individual surrenders himself to the services of a universal want or necessity of society. Man gives up his particular, special likes and desires in work. He sacrifices ease and momentary convenience of rational ends. He adopts the social order.

But in play he gives full rein to the individual whim or caprice. In play, his activity is wholly turned towards his own immediate gratification. After work, in which he sacrifices his private particular inclinations for society and for rational ends,—comes play, in which he returns to his individuality and relaxes this tension of work. He regains his feeling of self in play, because in play, immediate inclination alone guides his activity, and thus the particular self in the impelling principle, and also the immediate object of it.]

অধ্যাপক হর্ণি এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে সুন্দর করে বলেছেন। তাঁর মতে খেলা আর কাজের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল অর্থনৈতিক। কাজের পিছনে রয়েছে কিছু অর্থপ্রাপ্তির স্বর্ণমরীচিকা আর খেলার পিছনে কেবল মাত্র আনন্দের দ্যুতি। মনস্তত্ত্ব হিসাবে খেলাটা কাজের তুলনায় একটু স্বল্পকালস্থায়ী এবং আনন্দাশ্রয়ী। সুতরাং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে খেলা আর কাজের মধ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য নেই। অবশ্য সব খেলাই তা বলে কাজ হিসাবে গণ্য হবে না, অথচ সব কাজই খেলার মনোভাব নিয়ে নতুন করে দেখলে তাকে একটি শিল্পকর্ম রূপে উন্নত করে দেওয়া যায়।

["Economically, play does not aim at earning a living and work does. Psychologically, the differences are these : in play the activity is likely to be shorter than work and leads on to further activity enjoyed on its own account, while in work the activity is likely to be longer than in play and leads on not only to further activity but to some material tangible result or accomplishment.—H. H. Horne.]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেলাটা কেবলমাত্র অর্থহীন অঙ্গবিক্ষেপ নয়— কাজের ভূমিকাস্বরূপ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি-কৌশল। খেলার মাধ্যমেই শিশু নিয়মনিষ্ঠ, কল্পনাপ্রবণ, কৌশলী, সমস্যা-সমাধান-কর্মী ও চিন্তাশীল নাগরিকে পরিণত হয়। [Play is the preparatory school for what has to be done later in the form of work. It

teaches reverences for law, exercises the imagination, gives opportunities for frequent change in which every child delights, and creates little difficulties to be mastered. Indeed, play and games without difficulties would not be appreciated.—Bray]

—শিক্ষাবিদ বেটস্ শিশুর খেলাকে আলো বাতাস এবং খাদ্যের মতই অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেছেন। [Play is as necessary to the child as food, as vital as sunshine, as indispensible as air. —G. H. Betts.]

মোটকথা—খেলা আর কাজ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আদৌ বিষয়ঘটিত নয় বিষয়ীঘটিত, বস্তুমুখী (objective) নয়, ভাবমুখী (objective)। অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে সেটি বড় কথা নয় ; বড় কথা, কোন ভাবে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে। ক্রিয়াটি যদি আত্মকেন্দ্রিক রূপে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং কেবলমাত্র আনন্দলাভের প্রেরণায় পরিচালিত হয় তবে ক্রিয়াটি যত শ্রমসাধ্যই হোক, সেটি খেলার পর্যায়ে পড়বে।

অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্ব ও আনন্দ এই দুটোই হল খেলার মূলকথা তাই খেলার দিকে মানুষ মাত্রেরই সহজাত আকর্ষণ এবং কাজের দিকে বিকর্ষণ। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান কাজটা যতদিন পর্যন্ত বেত্রানুশাসন জর্জরিত শিশুদের উপরে শিক্ষক অভিভাবকের চাপিয়ে দেওয়া কাজ হয়ে থাকবে ততদিন সে শিশুহৃদয়কে কখনই আকর্ষণ করতে পারবে না। শিক্ষা কাজটাই শিশুদের কাছে একটা বিরক্তিকর ব্যাপারে পর্যবসিত হবে।

এর বিপরীতক্রমে কোন কাজকে আনন্দের অনুসঙ্গ করে উপস্থাপন করতে পারলে তা আনন্দময় করে তোলা যায়।

খেলায় মানসিক ও শারীরিক গুণের বিকাশ

তাছাড়া খেলার মধ্য দিয়ে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক গুণের বিকাশ-লাভ ঘটে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যথা—

(১) খেলা মনের একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া—শিশুরা খেলা করে একান্ত-ভাবেই স্বাধীন ইচ্ছায়। বাইরের কোন অনুজ্ঞা বা আদেশ-নির্দেশের প্রভাব নেই খেলার মধ্যে।

(২) খেলা শিশুমনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ—খেলার মধ্যে দিয়েই

শিশুহৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ পায়।

(৩) খেলা মাত্রই শিশুর সৃজনমূলক কাজ। বড়দের দৃষ্টিতে খেলা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক শিশুর সৃষ্টিধর্মী মন খেলাকে অবলম্বন করেই নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মাতে।

(৪) খেলা শিশুমনের শৃঙ্খলা সাধনের সহায়ক। প্রত্যেক খেলারই একটা নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। খেলার ছলে শিশু অজ্ঞাতসারে সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে আগ্রহশীল হয়।

এই নিয়ম-শৃঙ্খলা কোন বাইরের চাপে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত আগ্রহের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে তারা এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে।

(৫) খেলা স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর সমগ্র মনকে আকর্ষণ করে, তার ফলে অখণ্ড মনোযোগ, দলের প্রতি আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার সার্থক অনুশীলন হয়।

(৬) খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শেখে। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে একযোগে কোন কাজ করবার শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করে শিশুরা। তার ফলে শিশুমনের আত্মকেন্দ্রিক ভাব ক্রমশ দূর হয়ে যায় এবং দলকেন্দ্রিক ভাবে সামাজিকতা গুণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে।

(৭) খেলার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিজেদের আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে শেখে শিশুরা।

(৮) খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুরা একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এমন অনেক জটিল কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে যেগুলি পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে লাগে। এই সত্যটি কার্লগ্রুজ তাঁর প্রস্তুতিবাদ তত্ত্বে বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন।

(৯) খেলা শিশুমনের অনেক অসামাজিক প্রবৃত্তিকে সামাজিক পথে উদ্গতি ঘটাতে সাহায্য করে। ম্যাকডুগাল এই হিসাবে খেলাকে মানবের চরিত্রগঠনে এত মূল্যবান বলে মনে করেছেন।

(১০) খেলা শিশুমনের অনেক নিরুদ্ধ আবেগকে তৃপ্ত করে। ষ্ট্যানলি হল তাঁর পুনরাবৃত্তিবাদে এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

(১১) খেলাকে উপলক্ষ্য করে শিশুমনের অনেক অবদমিত নিরুদ্ধ বাসনা

তৃপ্তি লাভ করে, অনেক জট পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সত্যটি বিরেচনবাদ তত্ত্বে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) খেলার ছলে শিশুদের দৈহিক শক্তির চর্চা হয়। তাদের শরীর তখন সবে গড়ে উঠছে—শরীরচর্চা এ সময়ে তাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন—কিন্তু এই চর্চা অপরের আদেশ-নির্দেশে করতে বাধ্য হলে তার ফল ভাল হয় না। খেলার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে দিয়ে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তা ঘটে থাকে।

(১৩) খেলায় শিশুদের মানসিক শক্তির চর্চাও হয় অজ্ঞাতসারে। খেলার মধ্যে শিশুরা মাঝে মাঝে এমন একএকটা জটিল সমস্যায় পতিত হয় যে তার সমাধান করতে তাদের বেশ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে হয়।

(১৪) খেলার মধ্যে দিয়ে হয় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। ডিউই বলেন সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেবল মানসিক শক্তির চর্চায় হয় না কেবল শারীরিক শক্তির চর্চাতেও হয় না। শরীর ও মনের যুগপৎ চর্চাটি সম্ভব হয় কেবল বুদ্ধিনির্ভর সক্রিয়তার মাধ্যমে। খেলা হচ্ছে একমাত্র সেই স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধিনির্ভর আনন্দদায়িনী ক্রিয়া ; তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলার তুল্য আর কিছু নেই। ডিউইর মতে এইজন্য খেলা হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন-প্রক্রিয়া (life process)।

শিক্ষায় ক্রীড়াচ্ছল (Playway in Education)

এইভাবে খেলাকে উপলক্ষ্য করে শিশুর এতগুলি গুণের বিকাশ সাধন হয় বলেই বর্তমানের শিক্ষাবিদেরা আজ শিশুশিক্ষায় খেলার এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করেছেন।

এককালে খেলাকে দেখা হত কাজের বিপরীত হিসাবে, পড়াশুনার হানিকর হিসাবে। খেলার দিকে ঝোঁক হলে তার পড়াশুনা কিছু হয় না—এই ছিল সাধারণ মত। ক্রমশ মত বদলাতে লাগল। বলা হল, খেলার প্রয়োজন আছে বৈকি—নিরেট পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে একআধটু খেলাধূলার হাল্কা হাওয়ায় প্রয়োজন ছেলেদের মানসিক স্বাস্থ্যের খাতিরে। খেলাধূলা বাদ দিয়ে কেবল পড়াশুনা কাজকর্ম নিয়ে থাকলে ছেলের উন্নতি হবে না, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে না, ছেলে বোকা হয়ে যাবে—(all work and no play make Jack a dull boy) এই হল পরবর্তী শিক্ষাবিদদের ধারণা।

ধারণাটা এইখানেই থেমে থাকেনি। শিশুশিক্ষায় খেলার গুরুত্ব ক্রমশ

আরো অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। বর্তমানের শিক্ষাবিদদের মধ্যে খেলা শুধু কাজের ফাঁকে অবসর বিনোদনের জন্য নয় খেলাটাই কাজ, অর্থাৎ খেলা হচ্ছে শিক্ষারই একটা পদ্ধতি। পড়াশুনাটাকে আজকাল আর শুধু কর্তব্য পালন হিসাবে ছেলেদের সম্মুখে উপস্থাপিত না করে খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দময় করে তুলবার নানাপ্রকার পরিকল্পনা আজ শিক্ষাবিদেরা করছেন। শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল্ সর্বপ্রথম খেলাকে শিক্ষা দেবার প্রধান উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন বলা যায়। তাঁর মতে শিশুদের কোন খেলাই ব্যর্থ নয়, সবই কাজের অঙ্গ। আর যে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত নয় সে কাজের কোন আকর্ষণই নেই ছেলেদের কাছে। তাই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলার স্থান এত উচ্চে। খেলায় কাজে কোন পার্থক্যই রাখা হয়নি সেখানে। খেলাকে সার্থকভাবে কাজের বাহন করেছেন মাডাম মন্তেস্বরী। খেলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাই এখানে শিশুদের শিক্ষার পথে নিয়ে চলে। মন্তেস্বরী-শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব হচ্ছে পড়াশুনার ব্যাপারে শিশুদের যথাসম্ভব আত্মনির্ভর করে তোলা এবং শেখার জিনিষগুলি খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা। আধুনিক সকল শিক্ষাবিদই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রীড়ানুসঙ্গ স্থাপন করে ভাল ফল পেয়েছেন। প্রজেক্ট পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি (heuristic) ডাল্টন পদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলির মূল কথাই হল ক্রীড়ানুসঙ্গ।

এবিষয়ে ক্যাল্ডওয়েল কুকের নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। শিক্ষায় ক্রীড়াচ্ছলের (Playway in education) কথা বলে তিনি প্রথমে শিশু-শিক্ষার জগতে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পড়াশুনার বিরক্তিকর পরিবেশকে সহনীয় করে তুলবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি খেলাধুলার ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রথমে অনেকে ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু ক্যাল্ডওয়েলের মতে খেলাধুলাটাই হচ্ছে পদ্ধতি, অন্য পদ্ধতির ক্লান্তিহারী মাত্র নয়।

[......that the play methods ...... are not a relaxation or a diversion from real study, but only an active way of learning.—Caldwell Cook]

নীরস বিষয়বস্তু খেলার মাধ্যমে যে কতখানি মনোহারী হয়ে উঠতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত দেই—

ইংরেজী শব্দের অর্থ ও বানান মুখস্থ করা ছাত্রদের কাছে যে কতখানি

বিরক্তিকর তা ত বলাই বাহুল্য। বিদেশী ভাষার জটিল শব্দে, ততোধিক জটিল বানান আয়ত্তে আনা সত্যই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ওয়ার্ডমেকিং খেলায় মেতে নতুন নতুন শব্দ তৈরী করবার উৎসাহে আমি ছাত্রদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অভিধান মুখস্থ করতে দেখেছি।

এখানে খেলার আনন্দ পড়ার বিরক্তিকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—

Work while you work
and play while you play

বর্তমান মনোবিদের মতে কথাটা ঠিক নয়—তার স্থানে বলা যেতে পারে

Work while you play
and play while you work—

অর্থাৎ কাজের মধ্যেই খেলা এবং খেলার মধ্যেই কাজ। সার্থক শিক্ষাবিদদের হাতে খেলা ও কাজের সীমারেখা ক্রমশই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানের এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগের কথা বার বার বলা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা, খেলা আর পড়াকে মিলিয়ে দেওয়া। এই মতের প্রধান উদ্গাতা স্যর জন আডামস্ ফ্রয়েবল, মন্তেস্বরী, জন ডিউই, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বর্তমান যুগের শিক্ষাগুরুবৃন্দ। এঁদের হাতে শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি নূতন রূপ গ্রহণ করেছে, শিশুকেন্দ্রিকতায় ক্রম-বিকাশ ঘটেছে। এঁদের প্রবর্তিত নবশিক্ষাধারার মূল কথা হল ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা। শিক্ষার মধ্যেও শিশুরা খেলার মত আনন্দের আস্বাদ পাবে, অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করবে, আত্মবিস্তারের সুযোগ পাবে, তবেই সে শিক্ষা হবে সার্থক।

খেলায় কল্পনা-বিলাসবাদ (Make-believe Play)

বিভিন্নপ্রকার খেলার তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে শিশুদের কল্পনা-বিলাসবাদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। শিশুদের জগৎ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তাদের নিয়ম-কানুন। বড়দের মনে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বেড়া দেওয়া আছে। কল্পনার ঘোড়াকে ছুটাতে গেলেও আমরা সব সময়ে সতর্ক থাকি ঘোড়ার পা যেন বাস্তবের কঠিন রাস্তা ছেড়ে না ওঠে। কিন্তু শিশুদের মন সেদিক দিয়ে স্বাধীন, বাস্তবের দাসত্ব করতে তখনও তারা অভ্যস্ত হয়নি। তাই তাদের কল্পনার পক্ষীরাজ ছুটে চলে ভাবজগতের হাল্কা হাওয়ায় পাখা

মেলে। বাস্তবের মাটি কোথায় দূরে প'ড়ে থাকে, চোখেও দেখা যায় না। ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে বেড়া ছিলনা উঁচু।
মনটা ডিঙিয়ে যেত এপার থেকে ওপারে
সহজেই—"

শিশুমনে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে কোন বেড়া থাকে না। শিশুর কল্পনা অবাধ। একটা ছোট ভাঙ্গা খাটের পায়াকে কাপড় জড়িয়ে তাকে ছেলে মনে করতে তার বাধে না। চেয়ারের ভাঙ্গা হাতলটাকে ঘোড়া কল্পনা করে তার গায়ে অনবরত বেত্রাঘাত করতে করতে সারা বাড়ী দৌড়ে বেড়িয়ে অশ্বারোহণের আনন্দ পায় সে পুরামাত্রায়। সামান্য একটু বাস্তবের খোলার মধ্যে পোরা থাকে তার কল্পনার আতসবাজি।

পথ দিয়ে চলেছে বাসনওয়ালা ঢং ঢং করতে করতে, শিশুর কল্পনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল—সেও কল্পনা করে চলল সে হবে বাসনওয়ালা—রাস্তা দিয়ে এমনি করে ঘণ্টা বাজিয়ে সে চলবে···চলবে, শুধু চলবে···। ঘণ্টা বাজিয়ে চলার মজা তাকে অভিভূত করে দেয়। কখন বা কানাই মাষ্টার সেজে বলবে—"আমি আজ কানাই মাষ্টার, পোড়ো আমার বিড়াল ছানাটি—" কখনও শিশু কল্পনা করে সে বীরপুরুষ। সেকালের নাইটদের মত তার মনোভাব—

"মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙ্গা ঘোড়ার পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে—"

এমনি কত কল্পনা শিশুর। কত লড়াই, কত রক্তপাত···হেলায় সে সব সেরে খোকা আবার মায়ের কোলে এসে বসছে মায়ের খোকা হয়ে—

মাঝে মাঝে হয়ত শিশুর মনে এই অতিবাস্তব পৃথিবীর মূর্খতা দেখে হাসি পায়। কেন তারা এসব বিশ্বাস করে না? কেন তারা ছাতের উপর উঠে একটা বাঁশের খোঁচায় চাঁদটা পেড়ে ফেলে না?

শিশু ভাবে—

"কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয়না, আহা—।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে
শুনত যারা অবাক হত সবে।—"

শিশু যাতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, তাতে কেন অন্য কেউ অবাক হয়ে যায় না। ·· এই হচ্ছে শিশুর কল্পনা-বিলাস।

শিশুর এই কল্পনা-বিলাস মনোবৃত্তি নিয়ে মনোবিদেরা বহু আলোচনা করেছেন। পাগলেরও কল্পনা-বিলাস আছে কিন্তু তা শিশুর কল্পনা-বিলাস থেকে স্বতন্ত্র। পাগলের কল্পনা-বিলাস বাস্তবের রূঢ় আঘাতে আহত মনের পলায়নী মনোবৃত্তি মাত্র। আর শিশুর কল্পনা তার আত্মবিস্তারের সহায়ক।

ডঃ মন্তেস্বরী অবশ্য শিশুদের এই কল্পনা-বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে এতে শিশু কর্মভীরু বাস্তববিমুখ কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়বে। কিন্তু শিশুমনের প্রসারতার জন্য এই জাতীয় কল্পনা-বিলাসের যে একেবারেই প্রয়োজন নেই, সে কথাই বা বলা যায় কেমন করে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন কর্মভীরুদের অলস স্বপ্নবিলাস নিন্দনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে যে কল্পনা নতুন নতুন কাজের প্রেরণা যোগায় সেও জীবনাদর্শ রচনার প্রধান উপাদান। শিশুমনের কল্পনা-বিলাস নষ্ট করে দিলে তাকে রূঢ় বাস্তবের ক্রীতদাস করে তোলা হবে, ধূলির ধরণীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তার নষ্ট হয়ে যাবে।

[Dreams are only to be condemned when they are a lazy substitute for an effort to change reality ; when they are incentive, they are fulfiling a vital purpose in the incarnation of human ideals. To kill fancy in childhood, is to make a slave to what exists, a creature tethered to earth and therefore unable to create heaven—" —Bertrand Russel]

সুশাসন ও শৃঙ্খলা

(Discipline)

পার্বত্য নদীর বন্যাধারার বাঁধনহারা মূর্তি ভয়াবহ। তার উন্মত্ত প্লাবনে ভেসে যায় গ্রামের পরে গ্রাম। অথচ সেই বন্যাধারাকে যদি নিয়ন্ত্রিত করে নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে বহান যায় তবে তাকে কল্যাণবর্ষী শক্তির উৎস বলে মনে করি। মানুষের শক্তিও যদি অনিন্ত্রিতভাবে স্বেচ্ছাচারধর্মী হয়ে ওঠে, তবে তা তার নিজের এবং সমাজের উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর হবে।—অথচ তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করতে পারলে সমাজের পক্ষে হয় কল্যাণকর।

মানুষ যেদিন থেকে সমাজ বেঁধে বাস করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আচার আচরণকে 'বহুজনহিতায়' অর্থাৎ সমাজের সুবিধানুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করবার প্রয়োজন অনুভব করেছে।

বিদ্যালয় ত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখান থেকেই তার আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবার শিক্ষা শুরু হয়। সুতরাং শৃঙ্খলাবোধের প্রথম অনুশীলন স্থান হল বিদ্যালয়। আমাদের চরিত্রগঠন থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই শৃঙ্খলাবোধের আবশ্যকতা।—অর্থাৎ শৃঙ্খলাই হল জীবনের ছন্দ, বিশৃঙ্খল ছন্দহীন জীবন সমাজের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তার নিজের পক্ষেও তা তেমনি হানিকর।

এই শৃঙ্খলার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন—কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনায় মানুষের স্বভাব, চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাই হল শৃঙ্খলা—তা সে নিয়ন্ত্রণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হোক, বা বাইরের চাপেই হোক।

[It is a regulation imposed or sponteneous of conduct of thought and of feeling, with the aim of furthering some purpose…]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শৃঙ্খলাবোধের উদ্দীপনাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভিতর থেকেও আসতে পারে আবার অপরের শাসনের চাপে বাইরে থেকেও আসতে পারে।

দেশকাল ভেদে এই শৃঙ্খলাবোধের অনুশীলন কোথায় কবে এবং কি ভাবে শুরু হয়েছে তা আলোচনার যোগ্য।

শৃঙ্খলাবোধের ঐতিহাসিক পটভূমি

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অত্যন্ত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্বপ্রকার বিলাসব্যসন-বিবর্জিত সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ছিল ছাত্রদের অবশ্যকরণীয়। তার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে নানাপ্রকার কঠিন শাস্তি পেতে হত। সুতরাং এই জাতীয় শৃঙ্খলাকে হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত বলা যাবে না, কারণ বাইরের শাসনেই তার উদ্ভব। তবু প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমিক নিয়মানুবর্তিতার পটভূমিতে তপোবনের গুরুগৃহে যে ছাত্রজীবন গড়ে উঠত তাতে শৃঙ্খলা কখনই শৃঙ্খল হয়ে উঠত না। মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযমের রজ্জুতে বেঁধে রাখবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—...“ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়। যেখানে সাধনা চলেছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে, তাই লাভ করবার স্থান।—”

প্রাচীন গ্রীসেও ছাত্রজীবনের কঠোরতা বড় কম ছিল না। স্পার্টানদের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাবিধান ছিল অত্যন্ত কঠোর। স্পার্টান বালকেরা রাষ্ট্রের স্বার্থেই ছিল উৎসর্গীকৃত। তাই তাদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কঠোরতম আইন-শৃঙ্খলার বাঁধনে বেঁধে বাল্যকাল থেকেই তাদের সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলা হত।

আবার এথেন্সের গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষাও ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই বালকদের শৃঙ্খলা বিধানের মধ্যে, সেখানে অনেকখানি স্বাধীনতার অবসর ছিল। বালকদের ব্যক্তিগত কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার উপরই শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যযুগে সারা ইয়োরোপ জুড়ে শৃঙ্খলাচর্চা ছিল একান্ত বাধ্যতামূলক এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাপেক্ষ। অবশ্য তাদের এই প্রকার কৃচ্ছ্রতাসাধনের পিছনে একটি দার্শনিক যুক্তিও ছিল। বাইবেলে বলেছে আদি পিতামাতা আদম-ইভের

আদি-পাপ থেকেই মনুষ্যজাতির উদ্ভব—সুতরাং পাপপ্রবণতা প্রত্যেকটি জাতকের সহজাত। কঠোর শাসনের দ্বারাই তাদের সৎপথে রাখা যায়, নইলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা নেমে আসবে অসৎ পথে।

হিন্দুদর্শনে এই জাতীয় আদি পাপের কথা বলা না হলেও কোন কোন মতে বলা হয়েছে—মায়া-কবলিত জীব স্বাভাবিক ভাবেই ভগবৎবিমুখী। সাধনার দ্বারা মায়াপাশ ছেদনপূর্বক জীবকে ভগবৎমুখী হতে হয়, সুতরাং মানবশিশুকে সৎপথে রাখবার জন্য সাধনার দরকার, বাইরের শাসনও দরকার। মোটকথা—বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাই শৃঙ্খলা ও শাসন একার্থবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শৃঙ্খলা বনাম শাসন

বিদ্যালয় বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে একটা ছবি—বেত্রপাণি রক্তচক্ষু মাষ্টারমশাই বসে বসে হুঙ্কার দিচ্ছেন আর সামনে কয়েকসার ভীত সন্ত্রস্ত নিরীহ মানবক প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। শুধু কি বেত? ইস্কুলের পিনাল কোডে বিভিন্ন অপরাধের বিচিত্র ধরণের শাস্তির বরাদ্দ করা আছে…শিক্ষকমশাই গৌরব করে বলেন—আমাকে দেখে ছেলেরা যমের মত ডরায়—কারো টুঁ শব্দ করার জো নেই। ডিসিপলিন কি আর সবাই রাখতে পারে?

সত্যি, গৌরবের কথাই বটে। এতগুলি নবোদ্গত-পল্লব কচি কিশলয়ের উপর শাস্তির শিলাবৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা কি সকলের থাকে? শিশুদের মানুষ করবার কঠিন দায়িত্ব কি সোজা কথা? বজ্জাত ঘোড়াকে একটু রাশ আলগা দিলে আর রক্ষা নেই, ফাঁক পেলেই তারা বিপথে ছুটবে…শিক্ষকমশাই তাদের সদাজাগ্রত রক্তচক্ষু মেলে সামলে রাখছেন।

শিক্ষকদলের উপর এই পুলিশি কর্তব্যের ভার শুধু যে আজ আমাদের দেশেই বর্তমান তা নয়, কিছুকাল আগেও পৃথিবীর সর্বত্রই দণ্ডপাণি শিক্ষকের প্রবল প্রতাপ ছিল। রাষ্ট্রতন্ত্রের মত শিক্ষাতন্ত্রেও ল' এণ্ড অর্ডার (Law and Order) রক্ষা করে চলবার প্রধান উপকরণ ছিল বিদ্যালয়ের পিনালকোড। মোট কথা, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা, অর্থাৎ শাসনতাড়িত শৃঙ্খলাই বিদ্যালয়ে একমাত্র অনুশীলনীয় বলে বহুকাল ধরে চলে আসছিল।

কিন্তু বর্তমানের শিক্ষাবিদেরা এই জাতীয় শাসনতাড়িত শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা বলেই স্বীকার করতে চান না। অর্থাৎ এইভাবে জোর করে বাইরে থেকে

চাপিয়ে দেওয়া যে শৃঙ্খলা বা ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখার ফলে যে শান্তি, তার কোন মূল্যই নেই আজকালকার শিক্ষাবিদদের কাছে।

তাঁরা বলেন সত্যকার শৃঙ্খলাবোধ আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা থেকে। অর্থাৎ শৃঙ্খলা মেনে চলবার ইচ্ছাটা ছাত্রদের মনে যখন আপনা থেকেই জাগ্রত হবে তখনই সেটা হবে সত্যকার শৃঙ্খলা।

শৃঙ্খলার প্রকার ভেদ

এই হিসাবে শৃঙ্খলাকে মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়— **নেতিবাচক শৃঙ্খলা** (Negative discipline) ও **ইতিবাচক শৃঙ্খলা** Positive discipline)। নেচিবাচক শৃঙ্খলাবোধের উৎপত্তি ভয় থেকে। সর্বপ্রকার অন্যায় থেকে সে প্রতিনিবৃত্ত রাখতে পারে মাত্র, ন্যায় কর্মে পরিচালনা করতে পারে না। কিন্তু ইতিবাচক শৃঙ্খলাবোধ সৎকর্মের দিকে আকৃষ্ট করায়।

এই ইতিবাচক শৃঙ্খলাবোধ আপনা থেকেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে ছাত্র শুধু অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাই নয়, সৎকর্মেও আগ্রহান্বিত হয়। বলাই বাহুল্য এই শৃঙ্খলাবোধ শাসনতাড়িত আজ্ঞানুবর্তিতা নয়, নিষেধাত্মকও নয়।

আগেই বলেছি, মধ্যযুগে শৃঙ্খলা ও শাসন একার্থবাচক বলেই মনে করা হত। সেকালের শিক্ষকমশাইরা চাইতেন ছাত্রেরা ক্লাশে কাঠের পুতুলের মত বসে থাকবে—একটি কথা নয়, একটু নড়াচড়া নয়। শিক্ষকের প্রতি অপরিসীম বাধ্যতাই হল শৃঙ্খলার মূল কথা। শিক্ষকমশায়ের নির্দেশ—শুধু 'এটা করো', 'ওটা করো না'। ক্লাশে এই জাতীয় জবরদস্তি-শান্তিকে মাদাম মন্তেশ্বরী বলেছেন মৃতের শান্তি (a set of butterflies transfixed with pins to their seats)।

শিশুদের মধ্যে সৃজনধর্মী মন আছে—সব সময়েই সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়; খেলাধুলা গান নৃত্য এবং নতুন কিছু করার আনন্দ তাকে কর্মচঞ্চল করে তোলে। শৃঙ্খলার নামে তার সৃজনধর্মী মনের ধ্বংস সাধন করার চেয়ে অন্যায় আর নেই। ভুল করবে ভেবে কোন কিছুই যদি তাকে করতে না দেওয়া হয় তাহলে ভাল কাজই বা সে করবে কি করে— রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—"দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি। সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।" ভুলের মধ্যে দিয়েই ত সত্যের আবির্ভাব ঘটবে একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রকৃত শৃঙ্খলাই হল স্বতঃস্ফূর্ত। শিশুর নিজের ইচ্ছাতেই তার উৎপত্তি। আসল কথা হল—শৃঙ্খলা মানাবার বস্তু নয়। নিজের প্রয়োজনেই তা মেনে চলবার বস্তু। শাসন গর্জন ভয়-ভীতির দ্বারা তাড়িত না হয়েও আপনার ইচ্ছাতে ছাত্র যখন বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চায় তখনই প্রকৃত শৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছে বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে এই ইতিবাচক শৃঙ্খলার চর্চা কিভাবে করা যায় তাই হল সমস্যা।

অধ্যাপক নান্ সাহেব এই শৃঙ্খলা অনুশীলনের কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমে জাগে আন্তরিক ইচ্ছা, তারপর নিজের অক্ষমতার উপলব্ধি, তারপর মনোযোগ, তা থেকে পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা এবং শেষে তা থেকে সাফল্যের উৎপত্তি। এই ভাবে প্রকৃত শৃঙ্খলার উৎপত্তি ঘটে শিশুমনে।

[First there must be something that one genuinely desires to do, and one must be conscious either of one's inability or of some one else's superior ability to do it. Next, the perception of inferiority must awaken the negative-self-feeling with its impulse to fix attention upon the points in which one's own performance falls short or the model's excels. Lastly, comes the repetition of effort, controlled now by a better concept of the proper procedure, and accompanied, if successful, by an overflow of positive self-feeling which tends to make the improved scheme permanent.]

শৃঙ্খলারক্ষার ইচ্ছাটি শিশুমনে জাগ্রত হলেই তা থেকে শিশু নিজের অক্ষমতা দুর্বলতার প্রতি সচেতন হয় এবং সেই প্রসঙ্গে তার আদর্শের সক্ষমতার প্রতি হয় শ্রদ্ধাশীল। সেই দিকে মনোযোগী হতে চেষ্টা করে। এই ভাবে অক্ষমতার দিকে মনোযোগী হলে স্বভাবতঃই বারে বারে তার আদর্শ অনুসরণের চেষ্টায় উদ্যোগী হবে এবং তার ফলে সাফল্য লাভ ঘটবে। অর্থাৎ শৃঙ্খলাপালনের গোড়ার কথাই হল অক্ষমতার অনুভূতি বা হীনমন্যতার ভাব (Negative self-feeling)। তা থেকেই ক্রমশ উদ্ভব ঘটবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের (Positive self-feeling) অনুভূতি।

শৃঙ্খলাবোধের ক্রমবিকাশকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা—

(১) শারীরিক শাসননির্ভর (Phlebotomy)

(২) অবদমননির্ভর (Repressionistic)

(৩) প্রভাবনির্ভর (Impressionistic) এবং

(৪) স্বতঃস্ফূর্তিনির্ভর (Expressionistic)

এই চারটির মধ্যে প্রথম দুটিকে নেতিবাচক (negative) শৃঙ্খলা এবং শেষ দুটিকে ইতিবাচক (positive) শৃঙ্খলা বলতে পারি। সংক্ষেপে এই চার শ্রেণীর শৃঙ্খলাবোধের আলোচনা করেই আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

(১) শারীরিক শাসননির্ভর—

শারীরিক শাসননির্ভর শৃঙ্খলার কথা ইতিপূর্বে বিশেষভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এই মতে শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায় হল বেত অর্থাৎ শারীরিক শাস্তি প্রদান। বেতের ব্যবহারে কার্পণ্য করলে ছেলে গোল্লায় যাবে (spare the rod and spoil the child), এই ছিল সাবেক কালের শৃঙ্খলার মূলনীতি। রহস্য করে তাঁরা বলতেন, 'ছেলের কানদুটো তার পিঠের উপর থাকে। পিঠের উপর ঘা কতক না দিলে তাদের কানে কিছু ঢোকে না'—(a boy's ear is on his back, he does not listen if his back is not touched.)

এই জাতীয় বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলাবোধের ব্যর্থতা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

(২) অবদমননির্ভর—

অনেক সময় বেতের ভয় দেখিয়ে শিশুমনকে শাসন করা যায় না। তাই তাদের সদা-চঞ্চল মনকে সব সময়েই বিষয়ান্তরে ব্যস্ত রেখে সুশাসন বজায় রাখবার চেষ্টাও করেছেন অনেকে। কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। তাই কর্মহীন শিশুমন সব সময়ে শয়তানি বুদ্ধির আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেরা সব সময়েই কাজ চায়। হাতে কাজ না থাকলেই একটা কিছু হাঙ্গামা বাধাতে লেগে যাবে তারা। তাই বিদ্যালয়ে এমন একটা কর্মসূচী তৈরী করতে হবে যাতে আজে বাজে চিন্তা করবার একটুও সময় না পায় তারা। ছাত্ররা কি ভাবে অবসর যাপন করবে তা নিয়েও অনেক শিক্ষাবিদ প্রচুর গবেষণা করছেন।—নানা কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে

তা থেকে তাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সময় বা সুযোগ থাকবে না। দুষ্টপ্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্‌গতি ঘটবে। অবদমিত হবে তাদের দুর্বাসনা।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে এই পন্থাও শৃঙ্খলাবিধানের আদর্শ পন্থা নয়।

(৩) প্রভাবনির্ভর—

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার অন্যতম কার্যকরী পন্থা হল শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব। বীরপূজা বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক চিত্তধর্ম। সুতরাং এই সময়ে অনুকরণ (imitation), অভিভাবন (suggestion) ও অনুবেদন (sympathy) এইগুলির সাহায্যে শিক্ষকগণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সহজেই শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বিধান করতে পারবেন। এই হিসাবে ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়মানুবর্তী করবার চেষ্টা হয়েছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুল রাগবির স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ডঃ আর্নল্ডকে এই মতবাদের পথিকৃৎ বলা যায়।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে, চারিত্রিক সৌন্দর্য না থাকলে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা করে চলা যায় না। জ্ঞানেগুণে চরিত্রমাধুর্যে নিয়মানুবর্তিতায় আদর্শচরিত্র শিক্ষকের প্রভাব অজ্ঞাতসারেই শিশুচরিত্রকে প্রভাবান্বিত করবে। ছাত্রগণ সব সময়েই বোঝে শিক্ষক কত জ্ঞানী কত মহানুভব কত দরদী। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রও নিজেকে তার তুলনায় কতটা অকিঞ্চিৎকর, এটা বুঝতে শিখবে। শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যে ছাত্র যেন তাঁর কাছে এলেই হীনমন্যভাব অনুভব করে। শিক্ষকের শাসন নয়, ভালবাসাই হবে শৃঙ্খলারক্ষার মূলকথা (Discipline must be based on and controlled by love,—Pestalozzi)।

মোটকথা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার কাজে বাইরের থেকে তর্জন-গর্জন শাসনের ভীতির দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না। আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ছেলেরা আপন থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে এবং নিয়মানুগ হয়ে চলবার চেষ্টা করে।

(৪) স্বতঃস্ফূর্তিনির্ভর—

কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রের প্রকৃত আত্ম-বিকাশের সহায়ক না হয়ে পরিপন্থীই হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি শিশু তার নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মেছে এবং এই স্বাতন্ত্র্যই আনবে বৈচিত্র্য।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মূল্য আছে, প্রত্যেকটি শিশু বেড়ে উঠবে তার স্বাধীন সত্তায়। কোন আদর্শবাদের অজুহাতেই তাদের সকলকে একছাঁচে ঢালা চলবে না।

সেইজন্য শৃঙ্খলারক্ষার খাতিরেও তাঁরা ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট আদর্শবাদের আওতায় রাখতে চান না—তা সে আদর্শ যত বড়ই হোক। শিশু বেড়ে উঠবে সম্পূর্ণ তার নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে। সুতরাং তাঁদের মতে যতক্ষণ না ছাত্র তাদের আচার-আচরণে অপরের কাজে কোন বিঘ্ন উৎপাদন না করছে, অনিষ্ট না করছে, বা বিদ্যালয়ের কর্ম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি না করছে, ততক্ষণ তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণ নেই ; এমনকি শিক্ষকের প্রভাব বিস্তারেরও কোন আবশ্যকতা নেই। মাদাম মন্তেস্বরী এই মতের প্রধান সমর্থক।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার মূল কথা হল প্রত্যেকটি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান, শুধু তাই নয় ছাত্রের ব্যক্তিত্বের প্রতি যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন।

মানুষ ফুটে উঠতে যাচ্ছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, বাইরের প্রভাবে বা আওতায় তার সেই বৈশিষ্ট্য বিকাশের সম্ভাবনা পঙ্গু হয়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিত্বের অবহেলা তার আত্মবিকাশের পরিপন্থী। তাই সমস্ত কাজে তাকে স্বাধীনতা দিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে তার মনে জাগিয়ে তুলতে হবে দায়িত্ববোধ, ফুটিয়ে তুলতে হবে তার ব্যক্তিত্ব, জাগ্রত করতে হবে আত্মসম্মানবোধ।

শৃঙ্খলারক্ষার গোড়ার কথাই হল দায়িত্বজ্ঞান। ছেলেদের বিশ্বাস করে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের এই দায়িত্বজ্ঞান যদি জাগ্রত করে তোলা যায়, তাহলে শৃঙ্খলারক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে।

এই ভাবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ছেলেরা শিখবে শৃঙ্খলার মূল্য।

শাস্তি ও পুরস্কার

(Punishment and Reward)

শাস্তির প্রয়োজনীয়তা—

শৃঙ্খলারক্ষার উপায় স্বরূপে শাস্তি প্রদানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যতরকম মতই থাক, কোন প্রকার শাস্তির প্রয়োজনীয়তা যে একেবারেই নেই এমন কথা বলা চলে না। মানুষের মধ্যে এমন অনেক দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে তার কিছু কিছু সংশোধন করা সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ সংশোধন করা যায় না। বর্তমান মনোবিদেরা বলেন মানব-শিশু স্বভাবতই শয়তান নয়, আবার অপাপবিদ্ধ দেবশিশুও নয়। সুতরাং তাদের গুণের অংশ যেমন উৎসাহ দিয়ে বর্ধিত করতে হবে তেমনি দোষের অংশের পরিমার্জনার জন্য শাস্তিপ্রদানের প্রয়োজনীয়তাও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

এককালে যেমন শৃঙ্খলারক্ষা বা পড়াশুনায় মনোযোগ আকর্ষণের একমাত্র উপায় ছিল বেত্র আস্ফালন, তেমনি আজকাল আবার গুরুতর অন্যায়ের জন্যও শাস্তি না দেওয়ার উপদেশ। মনে হয়, মধ্যবর্তিনী সত্যের এই দুটি প্রান্তসীমা।

মোটকথা, শাস্তি দেওয়া মোটেই চলবে না—এমন কথা নয়, এমন কি দৈহিক শাস্তিও দিতে হবে প্রয়োজন হলে। 'প্রয়োজন হলে'—কথাটাই বড় কথা। শিক্ষক যখন বুঝবেন এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, তখনই এর সংযত প্রয়োগ সুফল আনবে।

শিক্ষাবিদ রেন্ শিক্ষকের বেত্রকে চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ছুরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর অপপ্রয়োগ যেমন ক্ষতিকর তেমনি সময়বিশেষে অপ্রয়োগও কম ক্ষতিকর নয়।

[Punishment is an evil thing and a thing to be avoided. So is the surgeon's knife. Both are necessary however—]

এখন সমস্যা, শাস্তি কি উদ্দেশ্যে দিতে হবে এবং কতটুকু দিতে হবে। উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা একে দু'দিক থেকে দেখতে পারি—**সংশোধক ও নিবারক।**

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে শাস্তি দেওয়া হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর দোষত্রুটি সংশোধন এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষা।

এই উদ্দেশ্যে শাস্তিটা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে—যাতে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী সচেতন হয় এবং অনুতপ্ত হয়। তবেই ভবিষ্যতে সে আর অনুরূপ অপরাধ না করার দিকে মনোযোগী হবে।

এছাড়া যখন একজনকে দেখে পাঁচজন শিখবে, এই উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় তখন তাকে নিবারণমূলক শাস্তি বলতে পারি। কোন ছাত্র যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে, তবে তার কঠিন শাস্তি দিয়ে শুধু অপরাধীকেই মাত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে সমস্ত ছাত্রদলকেই তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাবধান করে দেবার চেষ্টা করা যায়। গুরুতর অপরাধের জন্যই অবশ্য এই জাতীয় শাস্তির প্রয়োজন হয় এবং শাস্তির মাত্রাও হয় গুরুতর। এছাড়া শাস্তিকে আরো কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। ক্ষতিপূরক (Retributive) শাস্তি

কোন ছাত্রের ব্যবহারে যদি অন্য কোন ছাত্রের বা বিদ্যালয়ের কিছু ক্ষতি হয় তবে সেই ছাত্রকে দিয়েই তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই হল ক্ষতিপূরক শাস্তি। যেমন, কোন ছেলে যদি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে বা অন্য কোন সহপাঠীর বই খাতা জামা কাপড় নষ্ট করে দেয় তবে তার জরিমানা থেকে সেইগুলি পূরণ করা যায়।

২। শৃঙ্খলারক্ষার (Disciplinery) শাস্তি

বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা কেউ ভঙ্গ করলে সেই নিয়মের মর্যাদা রক্ষার খাতিরেই তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তা নইলে বিদ্যালয়ের শাসনের কোন মূল্যই থাকবে না, শৃঙ্খলা যাবে নষ্ট হয়ে।

মোটকথা হল, শাস্তিদানের উদ্দেশ্য প্রতিহিংসানিবৃত্তি নয়, শিক্ষা দান। শিক্ষাদানই হল আসল লক্ষ্য, অন্য উপায়ে যখন তা সম্ভব হল না তখনই শাস্তিদানকে উপলক্ষ্য করা হল।

[The end and object of all punishment is education and training. The sufferer is taught by pain, and others are taught by his examples.)

শাস্তিপ্রদানের ব্যর্থতা—

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে শাস্তিপ্রদান করবার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি উল্লেখ করা

হল সেগুলি যে নিরঙ্কুশ কল্যাণকর এমন কথা বলা যায় না। দোষত্রুটি সংশোধন করা অথবা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষা করার উদ্দেশ্যে শাস্তিদেওয়ার মূল কথা হচ্ছে—যে অন্যায় করেছে শাস্তি দিয়ে যেন তার প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। মানুষের চরিত্র সংশোধনে এই দুটো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। এই দুটোরই মূল কথা হল ভয় দেখিয়ে সৎপথে রাখবার চেষ্টা—কিন্তু তা কখনও হয় না। ভয় একটা শক্তিশালী প্রক্ষোভ, তা মানুষের মনের সমতা নষ্ট করে দেয়, চরিত্র বিকাশের সহজ সরল পথ রুদ্ধ করে দেয়, স্বাভাবিক সৃজনীপ্রতিভা ধ্বংস করে দেয়।

তাছাড়া ভয় দেখিয়ে প্রথম প্রথম হয়ত কিছু ফল পাওয়া যায় কিন্তু বারবার ঐ পন্থা অবলম্বন করলে ফল উল্টো হবার সম্ভাবনা। আরো, যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—যে অন্যায়কারীর সংশোধন করা ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঁচ জনকেও সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেওয়া—এটাও সব সময়ে হয় না। কারণ, বন্ধুকে শাস্তি পেতে দেখলে অন্য বন্ধুদের মনে সহানুভূতি জাগতে পারে, গণমানসে প্রতিহিংসা জাগতে পারে। সুতরাং পুরানো দিনের বেত্রানুশাসন ছেলেদের চরিত্রগঠনে অথবা শৃঙ্খলারক্ষণে একেবারেই ব্যর্থ।

শাস্তি দেবেন কে এবং কখন?

তথাপি মাঝে মাঝে শেষ অবলম্বন হিসাবে এই পন্থা গ্রহণ করতেই হয়।—'শেষ অবলম্বন' কথাটা লক্ষণীয়।

শিক্ষক যখন বুঝবেন এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই, কেবল মাত্র তখনই তিনি এই পথ অবলম্বন করবেন। শাস্তি দেবার সময়ে ছাত্রের মনে যেন কখনও এ ধারণা না হয়, যে অন্যায় করে তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। শাস্তি পাবার সে যোগ্য, এ বোধটি যেন তার জাগ্রত হয়। শাস্তির পিছনে শাস্তিদাতায় যেন কোন প্রকার ক্রোধ বা হিংসার ভাব না থাকে। শাস্তির আঘাত দাতা ও গ্রহীতার মনে যখন সমভাবে বাজবে তখনই হবে সুবিচার, তখনই সে শাস্তির সুফল দেখা যাবে।—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি—

"—দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

দণ্ড যেন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী হয়। লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলে ছাত্রের মনে শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট হয়ে যায়। সব সময়ে মনে রাখতে হবে ছেলেদের শাস্তি দেওয়া মানেই শিক্ষকের পরাজয় স্বীকার। শিক্ষক আর কোন পথ না পেয়ে তবেই চরম পথে পা বাড়িয়েছেন,—এটা যেন তিনি স্বীকার করে নিলেন। সুতরাং সেটা যত কম হয় ততই ভাল।

আর এক কথা,—দণ্ডদান বিষয়ে শিক্ষক যেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হন। এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছাত্রের মনে জাগলেও ক্লাশের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে। কখনই ভুললে চলবে না যে শাস্তির একটি মাত্র উদ্দেশ্য সংশোধন, প্রতিহিংসা নিবৃত্তি নয়।

শেষকথা, শাস্তি দেবার অধিকারী কে ? বিদ্যালয়ের বিধানে অবশ্য একমাত্র প্রধান শিক্ষককেই দৈহিক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু নৈতিক অধিকারটি অর্জন করতে হয় শিক্ষককে। কেবলমাত্র পদাধিকার বলে বা বয়সের গুরুত্বে এই অধিকার জন্মায় না। এ অধিকার জন্মায় ভালবাসায় ও স্নেহে। পুনরায় কবিগুরুর কথা উল্লেখ করে বলি—

"শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো—"

সুতরাং শাসন করার অধিকার অর্জন করতে হয় স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে, সোহাগ দিয়ে।

বলাই বাহুল্য, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ছাত্রদের শাসন করার চেষ্টা অপেক্ষা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শাসন করার পথটা অনেকখানি সহজ। তাই অনেক অলস শিক্ষক এই সহজপথের পথিক।

[It is lazy and short way of government.—Locke]

কিন্তু সহজ সস্তাপথে শিশুর চরিত্র গঠন হয় না, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলা যায় না।

পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা—

শাস্তি দিয়ে আমরা যেমন অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করি তেমনি আবার পুরস্কার দিয়ে ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করি। সুতরাং বিদ্যালয় পরিচালনায় তিরস্কার ও পুরস্কার দুটোই অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, শাস্তি ও পুরস্কার এই দুটোর উদ্দেশ্য বিপরীতমুখী, শাস্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি কাজটি সময় সময় অপরিহার্য বলে

মনে হলেও তা একান্তই অপ্রীতিকর এবং আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। পুরস্কার সম্বন্ধেও একথা সত্য। কোন কোন শিক্ষাবিদ পুরস্কারদান প্রথাকে শাস্তিদান প্রথার মতই ক্ষতিকর বলে মনে করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় রাখার পক্ষে শাস্তিদানের মত পুরস্কারদান প্রথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

পুরস্কারদানের উপকারিতা—

ভাল কাজে পুরস্কার দিলে সাধারণতঃ ভাল কাজ করবার দিকে একটা উৎসাহ আসে। পুরস্কারকে অবলম্বন করে শ্রেণীকক্ষে বেশ একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়. তার ফলে শ্রেণীর পাঠোন্নতি ঘটে।

তাছাড়া থর্ন ডাইকের শিক্ষাসূত্রের (Laws of learning) পরীক্ষার দেখা গিয়েছে যে উদ্দীপনার সঙ্গে আনন্দমধুর অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে সেই উদ্দীপনাটিই মনে স্থায়ী রূপ নেয়। সুতরাং শিক্ষার্থীর যে আচরণটি আমরা স্থায়ী করতে চাই তার সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দমধুর অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করে দিলে কাজটা সহজ হতে পারে।

পুরস্কারদানের অপকারিতা—

তবে অনেকের মতে, এই উপকারিতাটি অবিমিশ্র নয়। ভাল কাজ পুরস্কারের লোভে করতে শিখলে ভাল কাজের প্রতি যে অহৈতুক একটা আকর্ষণ থাকার কথা, তা থাকে না। ভাল কাজ করবার প্রেরণা যেখানে সত্যের আকর্ষণে নয়, লোভের আকর্ষণে—সেটা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ—পুরস্কারলাভের প্রতিযোগিতা অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হয়, এবং তাতে বিদ্যালয়ের সুস্থ সামাজিক আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রের মনে অকারণ ঈর্ষা, হিংসা, আত্মম্ভরিতা জাগতে পারে। এইজন্যই প্রতিযোগিতায় পুরস্কারযোগ্য হবার জন্য অনেকে অসদুপায় অবলম্বন পর্যন্ত করে থাকে।

তৃতীয়তঃ—শ্রেণীতে এই জাতীয় পুরস্কার-প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকটি ছেলেমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার পাওয়া তাদের ক্ষমতার বাইরে মনে করে প্রতিযোগিতায় উদাসীন থাকে। সুতরাং পুরস্কারদান প্রথা বিদ্যালয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

চতুর্থতঃ—পুরস্কার দেওয়া হয় ফল দেখে—প্রচেষ্টা দেখে নয়। যদি দেখা

যায় কোন ছেলে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে উন্নতি করতে এবং ক্রমশ উন্নতিও করছে, তবু সে শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভের মত সুফল দেখাতে পারছে না বলে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। সুতরাং পুরস্কারদান প্রথা সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে না, সুফল প্রদর্শনকে করে মাত্র। —যদিও সুফল সব সময়ে সৎপ্রচেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি নয়।

পঞ্চমতঃ—অনেক সময় সচ্চরিত্রতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন কোন গুণে বালককে সচ্চরিত্র বলে মনে করা হয় তা বোঝা মুস্কিল। সাধারণতঃ সে সব বালকবালিকা একান্ত নিরীহ নিস্তেজ, কারো সাতে-পাঁচে নেই তাদেরকেই সচ্চরিত্রতার (good conduct prize) পুরস্কার দেওয়া হয়। অথচ বালক-বয়সে এইগুলি গুণ নয়, দোষ। তাছাড়া সারা শ্রেণীর মধ্যে ২।১ জনকে সচ্চরিত্র বলে চিহ্নিত করে দিলে বাকিগুলো অসচ্চরিত্র নীতিহীন বলে ইঙ্গিত করা হয় না কি ?

যাই হোক, প্রচলিত পুরস্কারদান প্রথার মধ্যে কিছু কিছু ভাল দিকও অবশ্য আছে, আগেই তার উল্লেখ করেছি। সুতরাং প্রথাটিকে একেবারেই উঠিয়ে না দিয়ে তাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সংস্কার করে নেওয়া চলতে পারে।

পুরস্কারদান প্রথার সংস্কার—

পুরস্কার সাধারণতঃ দেওয়া হয় (১) পাঠোন্নতির জন্য, (২) সচ্চরিত্রতার জন্য, (৩) বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিবার জন্য, (৪) খেলাধুলার জন্য…… ইত্যাদি—

(১) পাঠোন্নতির পুরস্কার কোন একটি বিশেষ পরীক্ষার ফলের উপর না রেখে সারা বছরের কাজ বিবেচনা করে দেবার ব্যবস্থা করলে ছাত্র সারা বৎসরই তার উন্নতির মান বজায় রাখবার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফল ভাল করার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ে অতিরিক্ত খাটুনি, প্রশ্ন বাছাই করে পড়া, এমনকি অসদুপায় অবলম্বনের দুরভিসন্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।

[Rewards for progress must be the rewards of merit and not of accident—P. Wren]

(২) পুরস্কারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। কেবলমাত্র ১ম ২য় ৩য় স্থান দখলকারীদের পুরস্কৃত না করে, যারা বৎসরের কাজে পূর্বাপেক্ষা উন্নতি দেখিয়েছে, তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করা ভাল।

(৩) সচ্চরিত্রতার ত্রুটির কথা আগেই বলেছি। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে ভাল

ব্যবহার করবে, চরিত্রবান হবে, নিয়মনিষ্ঠ হবে, এইটেই ত স্বাভাবিক এবং না হওয়াই অন্যায়। সেক্ষেত্রে সচ্চরিত্র, নিয়মানুগ হবার জন্য পুরস্কার দেওয়া কারো কারো মতে ঘুষ দেবারই নামান্তর।

[It is in this particular that prizes come nearest to bribes and have the greatest chance of doing more moral harm than good by breeding hypocrisy and low motives—Wren.]

সুতরাং এই পুরস্কার সমর্থনযোগ্য নয়। তবে কোন ছাত্র যদি বিশেষ কোন মহানুভবতার কাজ, সাহসের কাজ বা পরোপকারের কাজ করে তবে তাকে পুরস্কৃত করে তার এই সাধু প্রবৃত্তিটিকে উৎসাহিত করা ভাল।

(৩) বিদ্যালয়ের নিয়মিত উপস্থিতিও অনেকে পুরস্কারযোগ্য বলে মনে করেন না। কারণ বিদ্যালয়ের পরিবেশই ছাত্রদের আকর্ষণ করবার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে হাজির করার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়।

তবে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার মধ্যে যে একবৎসরের আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে সেটাকে পুরস্কৃত করা মন্দ নয়। বিদ্যালয়ে পড়তে আসার ঢিলেমি থেকে সর্ববিষয়ে ঢিলেমির প্রমাণ পাওয়া যায়। সব শিক্ষার মূল কথাই হল নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্যজ্ঞান। নিয়মিত হাজিরায় আমরা স্বভাবের এই মূল্যবান গুণগুলির পরিচয় পাই। তাই এই বিষয়ে পুরস্কার-প্রদান সমর্থন করা যেতে পারে।

(৪) খেলাধুলা—

এ বিষয়ে যোগ্যতার পুরস্কার বিশেষভাবে কাম্য। বিদ্যালয় শুধুমাত্র মানসিক শক্তি অর্জনের স্থান নয়, শারীরিক শক্তি অর্জনেরও স্থান—এই বিষয়ে পুরস্কার দিলে শারীরিক চর্চার মানমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

পুরস্কারের প্রকার ভেদ

(১) পুস্তকাদি—

কাদের পুরস্কার দেওয়া ভাল, এবিষয়েও যেমন বিচার করতে হয়, কি পুরস্কার দেওয়া ভাল এ বিষয়েও বিচার করবার দরকার। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কতকগুলি রঙ্গচঙ্গে গল্পের বই আর কিছু মোটাসোটা অভিধান দেওয়া হয়ে থাকে। কোন্ ছেলেকে কোন্ বই দেওয়া হচ্ছে এবং কেন দেওয়া হচ্ছে এ বিষয় আমরা বড় বেশী চিন্তা করি না।

(ক) প্রথমতঃ পুরস্কারযোগ্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের প্রয়োজনমত বই কেনা ভাল।

(খ) যে ছাত্রটি যে বিষয়ে উন্নতি করে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, সেই বিষয়েই আরো উচ্চতর বই পুরস্কার দেওয়া ভাল।

(২) **শ্রেণীতে সম্মানজনক স্থান—**

প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষকের দুই পাশে খানকয়েক বেঞ্চি সম্মানজনক আসন হিসাবে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকদিন পড়াশুনার বা নৈতিক ব্যাপারে প্রশংসাযোগ্য বিবেচিত হলে ছাত্রকে সেই বেঞ্চিতে বসবার অধিকার দেওয়া যায়, এবং উন্নতির মান বজায় রাখতে না পারলে সম্মানজনক স্থানটি হারাতে হবে। —এই নিয়মে ছাত্রদের মধ্যে বেশ একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে, এবং কার্যের সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়ায় মনের উপর এর প্রভাবও হয় বেশী।

(৩) **অভিজ্ঞান পত্র—**

পুস্তকাদি না দিয়ে তার পরিবর্তে অভিজ্ঞান পত্র বা (certificate of honour) সম্মানপত্র দেওয়ার প্রথা ভাল। এখানে মূল্য বস্তুগত নয়, মর্যাদাগত; অর্থাৎ জনসাধারণের সমক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃক তার স্বীকৃতি। বলাই বাহুল্য জনসাধারণের কাছে বিদ্যালয়ের সম্মান যত বেশী, সেই বিদ্যালয়ের চিহ্নিত অভিজ্ঞানের মূল্যও তত বেশী। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকদের একটি করে সপ্তপর্ণির পাতা উপহার দেবার প্রথা সৃষ্টি করেছিলেন কবিগুরু। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ বা বস্তু থেকে ঐ পাতাটির মূল্য অনেক বেশী সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

(৪) **বস্তু উপহার**

অনেক সময়ে পুস্তকের পরিবর্তে নানাপ্রকারের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। পাঠোন্নতির পুরস্কার ছাড়া খেলাধুলা বা সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে নানাবিধ দ্রব্যাদি পুরস্কার দেবার রেওয়াজ আছে। এ প্রথা মন্দ নয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে দ্রব্যগুলি যাকে দেওয়া হচ্ছে সে যেন সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেদের নানারকম রঙ্গিন পুতুল, খেলনা, ব্যাটবল, রঙের বাক্স, নানারকম ঘরোয়া খেলার সরঞ্জাম (indoor games) ইত্যাদি দেওয়া মন্দ নয়।